আবদুল্লাহ

কাজী ইমদাদুল হক

আবদুল্লাহ্

কাজী ইম্‌দাদুল হক

সম্পাদনায়

ডঃ কামরুল আহসান

প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান

বাংলা বিভাগ

রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

ফরিদপুর

প্রকাশনায়

আফসার ব্রাদার্স

৩৮/৪, বাংলাবাজার (দোতলা)

ঢাকা ১১০০

ভূমিকা

কথা সাহিত্যের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য শাখা উপন্যাস। এ হচ্ছে আধুনিককালের এক অনন্য সৃষ্টি। উপন্যাসের বিষয়বস্তু জীবনের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। প্রকৃতপক্ষে, কল্পনা ও বাস্তব—এ দুয়ের সংঘাতে এবং সংমিশ্রণে যে জীবন তাই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। একজন ঔপন্যাসিক ঘটনার সংঘাত ও সংস্থানকে এবং সংঘাতময় জীবনবৃত্তকে মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাসে রূপায়িত করে থাকেন। এ জীবনবৃত্তে কখনো মিলনের আনন্দ থাকে, কখনো বা থাকে বিরহের নীলবেদনার ছাপচিত্র। মোটকথা, জীবনকে গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে চিত্রায়িত করাই ঔপন্যাসিকের কাজ। দৈনন্দিন জীবনের চিন্তা, চাঞ্চল্য ও প্রবহমানতা যৌক্তিক পরম্পরায় ঘটনার ক্রমনির্ধারণের শৃঙ্খলায় উঠে আসে উপন্যাসে।

উপন্যাসে লেখকের অভিজ্ঞতা প্রতিষ্ঠিত হয় নিজের শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে। লেখকের ব্যক্তিগত জীবনদর্শন ও জীবনানুভূতি কোন বাস্তব কাহিনীকে অবলম্বন করে যে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে পরিণত হয়, সাধারণভাবে তাই উপন্যাস নামে পরিচিত। তবে একথাও ঠিক, উপন্যাস একালে আর শুধু জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়—পুনর্সৃষ্টিও বটে। 'The world tolstoy saw is not the world we see'—এই যে উক্তি Lubbock-এর, এ থেকে উপন্যাসের ভেতরকার একটা অপ্রত্যাশিত অপূর্ব কথিত সত্যের আবিষ্কারের ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করি। এ কারণেই জীবনের অনেক কিছু অনুপস্থিত বা প্রচ্ছন্ন সত্য থাকে উপন্যাসের ভেতর। এগুলোকে তুলে ধরতে হয়। কাজেই 'A novel is not life as it is, but life as it should have been.'

জীবনের পরিচয় যেহেতু বহুমাত্রিক, সে কারণে উপন্যাসের রূপায়নও বহু বিচিত্র। এর ভেতর জীবনের অসঙ্গতির কথাও আসে। এ-ও জীবনের একটা পরিচয়। সুতরাং জীবনের সার্থকতার রূপ চিত্র নির্মাণে জীবনের সম্ভাবনার কনসেপ্টকে ধরে রাখা ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব। তাঁর কৃতিত্ব এখানেই। এ জন্যেই সাধারণ চোখে যে জীবনের কোন অর্থ বা মূল্য নেই বলে ধারণা জাগে, ঔপন্যাসিকের হাতে সে জীবনই নতুন দীপ্তিতে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে।

১.১ উপন্যাসের ভেতর চারটি উপাদান থাকা জরুরি। এগুলো হচ্ছে—(ক) কাহিনী বা আখ্যান ভাগ, (খ) চরিত্র চিত্রণ, (গ) পরিবেশ কল্পনা, ও (ঘ) বাণীভঙ্গি।

উপন্যাস বিবৃতি প্রধান শিল্প। Plot ও Character-এর ভেতর দিয়ে লেখকের জীবনানুভূতি ও জীবনদর্শন এখানে সুনির্দিষ্ট একটা বক্তব্যের আকার নেয়। আর এ বক্তব্য ধর্মিতার ফলে উপন্যাসে theme-এর উপস্থিতি সব সময়ই থাকে। উপন্যাসে থাকে পাঁচটি বিশেষ অবস্থা।

ক. প্রস্তাবনা।

খ. আখ্যানভাগে সমস্যার উপস্থাপনা।

গ. কাহিনীর মধ্যে জটিলতার প্রবেশ।

ঘ. চরম সংকট মুহূর্ত।

ঙ. সংকট বিমোচন বা উপসংহার।

উপন্যাসের কাঠামো হচ্ছে Plot. বস্তুতপক্ষে এ কাঠামোর মধ্যেই চরিত্রের উপরি ও ভেতর অঙ্গে রক্তমাংস লাগে। কীভাবে লাগে, কতটা লাগে তার পরিমাণ ও প্রকারের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে চরিত্রের চলন বা স্বভাব। এ দিকটা বিবেচনা করলে উপন্যাসে দু'ধরণের চরিত্র থাকে।

১. আবর্তিত চরিত্র (Round character)

২. সম্প্রসারিত চরিত্র (Flat character)

আবর্তিত চরিত্রের রূপ যেখানে ঘটনার সংঘাতে আবর্তিত হয়ে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে, সেখানে ঘটনার সংঘাত ও আবর্তনের ভেতর সম্প্রসারিত চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয় না। আবর্তিত চরিত্র প্রায়শই অন্তর্মুখী বা introvert এবং সম্প্রসারিত চরিত্র সদা উন্মোচিত বা extrovert.

পরিশেষে বলতে হয় উপন্যাসের message-এর কথা। আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসা ও দহন-যন্ত্রণায় মানুষের যে অবস্থা তাকে নানাভাবে প্রত্যক্ষ করার ফলে উপন্যাসে লেখকের একটা দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়ে যায়। উপন্যাসে message-এর প্রসঙ্গটা আসে সেখান থেকেই। উপন্যাসের এ হচ্ছে অপরিহার্য অঙ্গ।

১.২ উপন্যাস নানা রকমের হতে পারে। বিষয়ের দিক থেকে যেমন, প্রকরণের দিক থেকেও তেমনি। কখনো এ শ্রেণী বিভাজনটা হয় কাঠামো নির্ভর। আবার কখনো বা রস-পরিণতির দিক থেকেও। এ দিকগুলো বিশ্লেষণ করে অনেকেই উপন্যাসের এভাবে শ্রেণীবিভাগ করেন—

ক. ঐতিহাসিক উপন্যাস
খ. সামাজিক উপন্যাস
গ. কাব্যধর্মী উপন্যাস
ঘ. ডিটেকটিভ উপন্যাস

অনেকে আবার ভাগ করেন এ রকম ঃ-

১. কাহিনী উপন্যাস
২. পত্রোপন্যাস
৩. লোমহর্ষক উপন্যাস
৪. হাস্যরসাত্মক উপন্যাস
৫. বীরত্বব্যঞ্জক উপন্যাস
৬. আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস

তবে এ বিভাজনের শেষ সীমা-চৌহদ্দি বলতে কিছু নেই। সাহিত্য-সমালোচক শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জবানীতে সে কথাই বলতে চেয়েছেন এ রকম ঃ "আধুনিক উপন্যাস সমস্ত বিশ্বব্যাপী জ্ঞানবিজ্ঞানের অপরীক্ষিত সত্য, মানস ও জিজ্ঞাসা কৌতুহলের বাহন হইয়া উঠিয়াছে। হৃদয়ের প্রত্যেক সমস্যাই আজকাল অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবেশের সহিত অচ্ছেদ্য বলিয়া অনুভূত হইতেছে—পটভূমিকায় অনির্দেশ্য বিশালতায় ইহার আকৃতি প্রকৃতির বিশেষ রূপ অস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।" বহু মাত্রিক এরূপ জীবনের বিচিত্র ভঙ্গিম আলেখ্য হচ্ছে আধুনিক উপন্যাস।

দুই

কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' সমাজ চিত্র সমৃদ্ধ উপন্যাস। প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক আবদুল কাদির উপন্যাসটি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ "বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের যে অবস্থা ছিল, তার একটি নিখুঁত চিত্র 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। অধুনা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রথার প্রবর্তন হচ্ছে ; ফলে আগেকার আশরাফ আতরাফ ভেদ, পর্দা প্রথা, পীর ভক্তি, সুদ সমস্যা, ইংরেজী শিক্ষার নিন্দাবাদ, এ-সবের উৎকর্ষতা কালক্রমে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু সেদিনের সমাজ জীবন ও ব্যক্তি মানসে এ সকল সমস্যা যে বিরোধ ও বাধার সৃষ্টি করেছিল, 'আবদুল্লাহ' তার এক মনোরম আলেখ্য।"

মূলত, 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসটি এ পটভূমিতেই গড়ে উঠেছে। কোন কোন সমালোচক অবশ্য উপন্যাসটিতে উপন্যাসের শিল্প উপাদানের অভাব আবিষ্কার করেছেন ; কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তৎকালীন সামাজিক পটভূমিতে কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' যে একটি উৎকৃষ্ট সমাজচিত্র এবং সে হিসেবে তাঁর যে একটা বিশেষ মূল্য আছে সেকথা অনস্বীকার্য।

'আবদুল্লাহ' উপন্যাস রচনার পেছনে লেখকের একটা সুস্থির পরিকল্পনা ছিল বলে আমরা জানতে পারি। ইমদাদুল হক সাহেবের পরিকল্পনা ছিল, "উপন্যাসখানি ৪০ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ করবেন। তার প্রথম ৩০ পরিচ্ছেদ ১৩২৭ বৈশাখ থেকে ১৩২৮ পৌষ সংখ্যা পর্যন্ত 'মোসলেম ভারতে' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। ৩১শ ও ৩২শ পরিচ্ছেদ দু'টিও তিনি লিখেছিলেন; কিন্তু অতঃপর 'মোসলেম ভারত' বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তা আর পত্রস্থ হয়নি। তাঁর নিজের হাতে লেখা সে দু'টি পরিচ্ছেদের মূল পাণ্ডুলিপি তাঁর পুরাতন কাগজ পত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে।"

কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' তাঁর রোগভোগ কালের রচনা। এ সম্পর্কে কাজী আবদুল অদুদ সাহেব মন্তব্য করেছেন—"১৯১৮ সালে কঠিন অস্ত্রোপচার-এর পর কাজী ইমদাদুল হক সাহেবকে দীর্ঘদিন হাসপাতাল বাস স্বীকার করতে হয়। তাঁর 'আবদুল্লাহ' সেই হাসপাতাল বাসকালে রচিত।"

কাজী ইমদাদুল হকের মৃত্যুর পর 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত ৩০ পরিচ্ছেদের পরবর্তী ১১টি পরিচ্ছেদ ইমদাদুল হকের 'খষড়া' অবলম্বন করে মরহুম কাজী আনোয়ারুল কাদির সাহেব রচনা করেন।

কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ উপন্যাসে লেখকের তীক্ষ্ণ সমাজ চেতনা, সমাজ মানসের প্রতিফলন বিশেষভাবে দেখা যায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন এ ভাবে—

"আবদুল্লাহ বইখানি পড়ে আমি খুশী হয়েছি—বিশেষ কারণ, এই বই থেকে মুসলমানদের ঘরের কথা জানা গেল। এদেশের সামাজিক আবহাওয়া ঘটিত একটা কথা এই বই আমাকে ভাবিয়েছে। দেখলুম যে ঘোরতর বুদ্ধির অন্ধতা হিন্দুর আচারে হিন্দুকে পদে পদে বাধাগ্রস্ত করেছে, সেই অন্ধতাই ধুতি চাদর ত্যাগ ক'রে লুঙ্গি ও ফেজ প'রে মুসলমানের ঘরে মোল্লার অন্ন জোগাচ্ছে। একি মাটির গুণ? এই রোগ বিষে ভরা বর্বরতার হাওয়া এদেশে আর কতদিন চলবে? আমরা দুই পক্ষ থেকে কি বিনাশের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পরস্পর পরস্পরকে আঘাত ও অপমান করে চলব? লেখকের লেখনীর উদারতায় বইখানিকে বিশেষ মূল্য দিয়েছে।"

সমাজ জীবনের পটভূমিতেই 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের দ্বন্দ্ব বা মূল বিরোধ গড়ে উঠেছে। একদিকে সংরক্ষণশীল শক্তি সমাজের কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, জীর্ণতা ইত্যাদিকে আঁকড়ে ধরেছে আর অন্যদিকে প্রগতিবাদী শক্তি নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যদিয়ে তাকে অস্বীকার করতে প্রয়াস পেয়েছে। সমাজের এহেন অবস্থা থেকেই উপন্যাসের চরিত্রগুলোর জন্ম, লালন ও বিকাশ ঘটেছে। "ইমদাদুল হকের চিত্রাঙ্কন ক্ষমতা প্রশংসনীয়। কিন্তু তার অঙ্কিত এই আলখ্যে ব্যক্তি চরিত্র অপেক্ষা সমাজ মানসের প্রতিফলন হয়েছে বেশী।" আর এ কারণেই ব্যক্তি চরিত্রের মহিমা কীর্তনের চাইতে লেখক চরিত্রগুলোকে প্রতীক এবং 'টাইপ' চরিত্র হিসেবে অঙ্কন করেছেন বলা যায়।

'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের মূল বিরোধ, লেখকের সমাজ চেতনা, চরিত্র চিত্রন পরিকল্পনা ইত্যাদির স্বচ্ছ ধারণা সমালোচক আবদুল কাদির সাহেবের উক্তিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। "......সৈয়দ সাহেব ও মীর সাহেব দুই বিপরীত ধর্মী চরিত্র ; সৈয়দ সাহেবের বংশাভিমান, আড়ম্বরপ্রিয়তা, আচার নিষ্ঠা ও আত্ম-পরায়ণতা পাঠকের মনে সহানুভূতি জাগায়, কিন্তু সম্ভ্রম জাগায়

না। পক্ষান্তরে মীর সাহেবের বাস্তব বুদ্ধি, মানবিক বোধ ও সংস্কার প্রয়াস আধুনিক মনের সমর্থনলাভ করে। নায়ক আবদুল্লাহ শেষে এই মীর সাহেবের আদর্শের ধারক হলো—স্ত্রী সালেহার মৃত্যুর পর মীর সাহেবের আশ্রিতা মালেকাকে করলো দ্বিতীয় বিবাহ। সৈয়দ সাহেব সংরক্ষণশীলতার এবং মীর সাহেব প্রগতিমুখিতার প্রতীক। এ দু'য়ের সংঘাতে যে স্ফুলিঙ্গ উঠেছে তাতে সংস্কারমুক্ত আধুনিক মনের অধিকারী আবদুল্লাহ চরিত্র হয়েছে ভাস্বর।"

উপন্যাসের মূল বিরোধ, সমাজ সচেতনতার উৎস এবং পরিবেশজাত চরিত্র চিত্রনের মূলবিন্দু হিসেবে সমালোচকের উপরোক্ত মন্তব্যকে ধরে নিলে অন্যান্য অপ্রধান চরিত্রগুলোকে সামাজিক পটভূমিকায় অনুষঙ্গ চরিত্র হিসেবেই মনে হয়।

সমাজ চিত্র বিধৃত 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসটির মূল কেন্দ্রীয় চরিত্র আবদুল্লাহ। চরিত্রটি অঙ্কনের পটভূমিকায় এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাতেও দেখা যায় তৎকালীন সমাজ জীবনের চিত্র রূপায়নই ছিল লেখকের কাঙ্ক্ষিত। সাহিত্য সমালোচক প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন—"ইমদাদুল হকেরই মানসচিত্র এই আবদুল্লাহ। সংযতবাক অচঞ্চলচিত্ত আদর্শনিষ্ঠ আবদুল্লাহ। এই চিত্রকে প্রাধান্য দিয়ে ইমদাদুল হক মুসলিম সমাজে আধুনিক জীবনের বিকাশের পথ করেছেন প্রশস্ত। এ জন্যই তিনি বাঙলা সাহিত্যে লাভ করবেন সম্মানের আসন।"

তিন

একথা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আবদুল্লাহ' সমাজ চিত্র সমৃদ্ধ উপন্যাস। প্রকৃতপক্ষে, সমাজ জীবনের পটভূমিকাতেই উপন্যাসটির দ্বন্দ্ব বা মূল বিরোধ গড়ে উঠেছে। এ সম্পর্কে যথার্থ ধারণা দিয়েছেন সাহিত্য সমালোচক আবদুল কাদির। তাঁর ভাষ্যমতে, "সৈয়দ সাহেব ও মীর সাহেব দুই বিপরীত চরিত্র ; সৈয়দ সাহেবের বংশাভিমান, আড়ম্বরপ্রিয়তা, আচারনিষ্ঠা ও আত্মপরায়ণতা পাঠকের মনে সহানুভূতি জাগায়, কিন্তু সম্ভ্রম জাগায় না। পক্ষান্তরে মীর সাহেবের বাস্তব বুদ্ধি, মানবিক বোধ ও সংস্কার প্রয়াস আধুনিক মনের সমর্থন লাভ করে। নায়ক আবদুল্লাহ শেষে এই মীর সাহেবের আদর্শের ধারক হলো—স্ত্রী সালেহার মৃত্যুর পর মীর সাহেবের আশ্রিতা মালেকাকে করলো দ্বিতীয় বিবাহ। সৈয়দ সাহেব সংরক্ষণশীলতার এবং মীর সাহেব প্রগতিমুখিতার প্রতীক। এ দু'য়ের সংঘাতে যে স্ফুলিঙ্গ উঠেছে তাতে সংস্কারমুক্ত আধুনিক মনের অধিকারী আবদুল্লাহ চরিত্র হয়েছে ভাস্বর।"

'আবদুল্লাহ' উপন্যাসটির মূল কেন্দ্রীয় ও নায়ক চরিত্র আবদুল্লাহ। লেখক এ চরিত্রটিকে তৈরি করতে গিয়ে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের খানিকটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। লেখকের মনে সেকালের সমাজ জীবনের একটা চিত্র আঁকার বাসনা যে কাজ করেছে, তাও সেখানে বোঝা যায়। এ সব কিছু মিলিয়ে মোটকথা দাঁড়ায় এ রকম ঃ "ইমদাদুল হকেরই মানসচিত্র এই আবদুল্লাহ—সংযতবাক অচঞ্চলচিত্ত আদর্শনিষ্ঠ আবদুল্লাহ। এই চিত্রকে প্রাধান্য দিয়ে ইমদাদুল হক মুসলিম সমাজে আধুনিক জীবনের বিকাশের পথ করেছেন প্রশস্ত। এ জন্যই তিনি বাঙলা সাহিত্যে লাভ করবেন সম্মানের আসন।"

লেখকের অন্যান্য অপ্রধান চরিত্রগুলোকে সামাজিক পটভূমিকায় অনুষঙ্গ চরিত্র বলা যেতে পারে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস, আবদুল কাদের, মীর সাহেব, সালেহা, হালিমা, ডাক্তার, দেবনাথ সরকার, হরনাথ বাবু প্রমুখ। এছাড়া পূর্বাঞ্চল নিবাসী মৌলভী সাহেব, বরিহাটি স্কুলের হেডমাস্টার, ছুঁৎবাইগ্রস্ত ব্রাহ্মণ, ভক্তিগদগদ কাসেম গোলদার ইত্যাদি চরিত্রগুলো আমাদের অতি পরিচিত এবং চেনা সমাজ পরিমণ্ডলের মানুষ।

মোটকথা, সমাজের সে কালের সংঘাতময় একটা আবর্তনের ভেতর 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের সব চরিত্র জন্মলাভ করেছে এবং লালিত ও বিকশিত হয়েছে। এ আবর্তনের একদিকে আমরা পর্যবেক্ষণ করি সংরক্ষণশীল একটা শক্তিকে। এঁরা আঁকড়ে ধরেছে সমাজের কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, জীর্ণতা ইত্যাদিকে। অন্যদিকে আছে প্রগতিবাদী আর একটা শক্তি। নিরন্তর সংগ্রামের ভেতর দিয়ে ঐ শক্তি পরাভূত করতে চেয়েছে যাবতীয় রক্ষণশীলতাকে। সমাজের এই যে আবহ কাজী ইমদাদুল হক প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার সমকালে, তার ভেতর দিয়েই উঠে এসেছে উপন্যাসের চরিত্রগুলো। কাজীসাহেব কি এ মানুষগুলোর মুখ যথার্থ আঁকতে পেরেছেন? এ প্রসঙ্গে জনৈক সাহিত্য-সমালোচক মন্তব্য করেছেন— "ইমদাদুল হকের চিত্রাঙ্কন ক্ষমতা প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁর অঙ্কিত এই আলেখ্যে ব্যক্তি চরিত্র অপেক্ষা সমাজ-মানসের প্রতিফলন হয়েছে বেশী।"

চার

উপন্যাসে একটা মূল theme থাকে, থাকতেই হয়। গল্পাংশ বা কাহিনীর কাঠামো নির্মাণের অপরিহার্যতা থেকেই লেখক তার অবতারণা করেন। তাবৎ ঘটনাকে totality বা সামগ্রিকতার ভেতর আটকে রাখাই এর আসল উদ্দেশ্য। 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে এ উদ্দেশ্যটা অনেকটাই অনুপস্থিত এবং যেখানেও এসেছে সেখানেও বন্ধনটা শিথিল মনে হয়।

কাজী সাহেবের এ উপন্যাসটি নায়ক প্রধান। সালেহা আছে নায়িকা হিসেবে, কিন্তু প্রাণস্পন্দন বর্জিত। সে হচ্ছে প্রতাপশালী পিতার বিচার-বিবেকহীন মতবাদের ছায়া চিত্র মাত্র। আবদুল্লাহ আর সালেহাকে নিয়ে একান্ত একটু ভাবনার অবসর নিজেদের এবং পাঠকের যখনই হয়, তখনও তা আপনি নিঃশেষিত। ক্ষীণ একটা হৃৎস্পন্দন দু'জনার ভেতর এবং পাঠকদের মধ্যে শুরু হতে না হতেই শেষ হয়ে যায়। ফলে উপন্যাসটিতে নায়ক আবদুল্লাহ ও নায়িকা সালেহার ভেতর এমন কোন নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, যা সালেহার মৃত্যুতে পাঠক চিত্তকে স্পর্শ করে কিংবা পাঠকের সহানুভূতি জাগাতে পারে। পরিণতি যা হবার, তাই হয়েছে। মূল কাহিনী অংশের বিকাশ ঘটেনি।

নদী যেমন সমতলভূমিতে এসে শাখা-প্রশাখায় ব্যাপ্তি লাভ করে, উপন্যাসেও অনেকটা ঘটে তাই। মূল কাহিনীর সঙ্গে এখানে এসে মেশে শাখা কাহিনী, উপকাহিনী। তারপর নদীর মতোই প্রবল প্রকম্প ধারায় এগুতে থাকে রস-পরিণতির সাগর-সঙ্গমে।

'আবদুল্লাহ'-তে কি তা হয়েছে? হয়নি। এবং তা এ কারণে যে, উপন্যাসের শাখা কাহিনী বলতে যা বোঝায় আলোচ্য উপন্যাসটিতে চিত্রায়িত ঐ কাহিনীগুলো তেমন আবহ সৃষ্টি করে না। আবদুল্লাহর পিতার মৃত্যুজনিত কারণে সংসার ও লেখাপড়া পরিচালনার সমস্যা, সৈয়দ সাহেবের ধর্মান্ধতার কারণে সালেহা ও হালিমার মধ্যে যে সমস্ত মানবিক সমস্যার আভাস উপন্যাসে রয়েছে তা তেমনভাবে জটিল ব্যাপ্তির ভেতর 'illustrate' হয়নি বা চিত্ররূপে প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠেনি। এজন্যেই লক্ষ্য করা যায় যে, আবদুল্লাহ ও আবদুল কাদেরের সংস্কারমুক্ত চেতনার আভাস এবং তার সঙ্গে বিরুদ্ধ চৈতন্যের বিরোধের ইঙ্গিত উপন্যাসে রয়েছে ঠিকই; কিন্তু তার 'Resultant'-কে প্রতিষ্ঠিত করার ঐকান্তিকতা অনুপস্থিত।

উপসংহারে এসে একথা না বলে উপায় থাকে না যে, কাজী ইমদাদুল হকের এ উপন্যাসটিতে কাহিনী ঘটনার ক্রমধারায় অগ্রসর না হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে তা সামনে এগিয়েছে— totality-কে ছুঁয়ে যেতে সক্ষম হয়নি। এজন্যে সাধারণভাবে উপন্যাসে ঘটনার যে ঠাস বুনুনি থাকে, এতে তা নেই—ঘটনাগুলোকে বলা যেতে পারে বিচ্ছিন্ন সমাজ চিত্র। আখ্যানভাগে যাবতীয় ঘটনাক্রম পরিণতির প্রবাহে অগ্রসর হয়ে রস-পরিণতিতে যে ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে, 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে তা নেই। ঘটনার প্রাচুর্যে কেন্দ্রীয় চরিত্র আবদুল্লাহর জীবন কর্মময় হয়ে উঠেছে—একথা সত্যি, কিন্তু বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে ওঠেনি।

'আবদুল্লাহ' উপন্যাসটির কাহিনীর শেষ কোথায়? শেষ একটা আছে অবশ্যই, এবং তা হচ্ছে আবদুল্লাহর মহত্ত্ব এবং হরনাথ বাবুর উদারতা প্রদর্শনের পটভূমিকায়। এর ফলে আর যাই হোক, উপন্যাসের রসসৃষ্টিতে একটা উল্টো ধাক্কা এসেছে। ঐ ধাক্কাটা কিসের? না বেদনার, না আনন্দের কোন দুর্লভ মুহূর্তের। কিন্তু হতে পারতো এরকম একটা কিছু। সে সম্ভাবনা ছিলো। সালেহার মৃত্যুতে শেষ হতে পারতো উপন্যাসের কাহিনী এবং সেই সঙ্গে সৈয়দ সাহেব ও আবদুল কাদেরের মৃত্যুর প্রেক্ষিতে কাহিনীর ঐ রস-পরিণতি আরও tragic হয়ে উঠতে পারতো এবং এরকম যদি হতো, তাহলে 'আবদুল্লাহ' উপন্যাস হিসেবে আরও সম্পূর্ণ হয়ে উঠতো হয়তোবা।

কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে এ রকম ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে সন্দেহ নেই। 'শিল্পের বিচারে আদৌ উপন্যাস নামের যোগ্য' কিনা—এ প্রশ্নও 'আবদুল্লাহ' প্রসঙ্গে এখন কেউ কেউ তুলেছেন। তবে একথা তো ঠিক যে, এ উপন্যাসটি বাংলার মুসলিম সাহিত্য রসপিপাসু জনগণের এক সময় তৃষ্ণা মিটিয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এ রকম মত প্রকাশ করেছেনঃ "আবদুল্লাহ বইখানি পড়ে আমি খুশী হয়েছি—বিশেষ কারণ, এই বই থেকে মুসলমানদের ঘরের কথা জানা গেল।"

এদিকটাতে অন্তত কৃতিত্ব কাজী সাহেবের, সার্থকতা 'আবদুল্লাহ'র।

ডঃ কামরুল আহসান

প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান
বাংলা বিভাগ
রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
ফরিদপুর।

বি-এ পরীক্ষার আর কয়েক মাস মাত্র বাকী আছে, এমন সময় হঠাৎ পিতার মৃত্যু হওয়ায় আবদুল্লার পড়া-শুনা বন্ধ হইয়া গেল।

পিতা ওলিউল্লার সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। পৈতৃক সম্পত্তি যাহা ছিল, তাহা অতি সামান্য; শুধু তাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইলে সংসার চলিত না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি পৈতৃক খোন্দকারী ব্যবসায়েরও উত্তরাধিকার পাইয়াছিলেন বলিয়া নিতান্ত অন্ন-বস্ত্রের জন্য তাঁহাকে বড় একটা ভাবিতে হয় নাই।

ওলিউল্লাহ্ পীরগঞ্জের পীর-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্বে পীরগঞ্জের চতুষ্পার্শ্বে বহু গ্রামে ইহাদের মুরীদান ছিল বলিয়া পূর্বপুরুষগণ নবাবী হালে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু কালক্রমে মুরীদানের সংখ্যা কমিয়া কমিয়া এক্ষণে সামান্য কয়েক ঘর মাত্র অবশিষ্ট থাকায় ইহাদের নিদারুণ অবস্থা-বিপর্যয় ঘটিয়াছে। সে প্রতিপত্তিও আর নাই, বার্ষিক সালামীরও সে প্রতুলতা নাই; কাজেই ওলিউল্লাকে নিতান্ত দৈন্যদশায় দিন কাটাইতে হইয়াছে। তথাপি যে দুই চারি ঘর মুরীদান তিনি পাইয়াছিলেন, তাহাদের নিকট প্রাপ্য বার্ষিক সালামীর উপর নির্ভর করিয়াই তিনি একমাত্র পুত্রকে কলিকাতায় রাখিয়া লেখা-পড়া শিখাইতেছিলেন। সুতরাং তাঁহার অকালমৃত্যুতে আবদুল্লার আর খরচ চালাইবার কোন উপায় রহিল না; বরং এক্ষণে কি উপায়ে সংসার চালাইবে, সেই ভাবনায় সে আকুল হইয়া উঠিল।

আবদুল্লার বিবাহ অনেক দিন পূর্বে হইয়া গিয়াছিল। তাহার শ্বশুরালয় একবালপুরে; শ্বশুর সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস তাহার পিতার আপন খালাত' এবং মাতার আপন ফুফাত' ভাই ছিলেন। আবার সেই ঘরেই তাহার এক শ্যালক আবদুল কাদেরের সহিত আবদুল্লার একমাত্র ভগ্নী হালিমারও বিবাহ হইয়াছিল। এই বদল-বিবাহ আবার পিতামহীর জীবদ্দশায় তাঁহারই একান্ত আগ্রহে সম্পন্ন হয়।

সৈয়দ আবদুল কুদ্দুসের মাতা আবদুল্লার পিতামহীর সহোদরা ছিলেন। এই দুই ভগ্নীর মধ্যে অত্যন্ত সম্প্রীতি ছিল এবং তাঁহারা পরস্পর নাতি-নাতিনীর বিবাহ দিবার জন্য বড়ই আগ্রহান্বিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এ সম্প্রীতি সন্তানদিগের মধ্যে প্রসারিত হয় নাই; কেননা সৈয়দেরা সম্পন্ন গৃহস্থ এবং খোন্দকারেরা এক সময়ে যথেষ্ট ঐশ্বর্য সম্ভ্রমের অধিকারী থাকিলেও, আজ নিতান্ত দরিদ্র, ধরিতে গেলে একরূপ ভিক্ষোপজীবী। তাই আবদুল কুদ্দুস প্রথমে ওলিউল্লার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে নারাজ ছিলেন; কিন্তু অবশেষে মাতার সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাঁহাকে এই বদল-বিবাহে সম্মত হইতে হইয়াছিল।

বিবাহের পর হইতে হালিমা বৎসরের অধিকাংশ কালই শ্বশুরালয়ে থাকিত; কিন্তু আবদুল্লার শ্বশুর কন্যাকে অধিক দিন পীরগঞ্জে রাখিতেন না। তাই বলিয়া আবদুল্লার পিতা-মাতার মনে যে বিশেষ ক্ষোভ ছিল, এমত নহে। তাঁহারা বড় ঘরে একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিয়া এবং না-খাইয়া না-পরিয়া তাহাকে লেখা-পড়া শিখিতে দিয়া এই ভরসায় মনে মনে সুখী হইতেন যে, খোদা যদি দিন দেন, তবে পুত্র কৃতবিদ্য হইয়া যখন প্রচুর অর্থ উপার্জন করিবে, তখন বউ আনিয়া সাধ-আহ্লাদে মনের বাসনা পূর্ণ করিবেন। এখন সে বড় লোকের মেয়েকে আনিয়া কেবল খাওয়া-পরার কষ্ট দেওয়া বই ত' নয়!

কিন্তু আবদুল্লার পিতার সে সাধ আর পূর্ণ হইল না; এমনকি মৃত্যুকালেও তিনি পুত্রবধূর মুখ দেখিতে পারিলেন না। আবদুল্লাহ্ বাটী আসিয়াই পিতার কঠিন রোগের সংবাদ শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়াছিল এবং হালিমাকে ও তাহার স্ত্রীকে সত্বর পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই।

আবদুল্লার সংসারে এখন এক মাতা এবং তাহার পিতামহের বাঁদী পুত্রের বিধবা স্ত্রী করিমন ভিন্ন অন্য কোন পরিজন নাই। করিমন বাঁদী হইলেও আপনার জনের মতই এই সংসারে জীবন কাটাইয়া বুড়া হইয়াছে। সে গৃহকর্মে আবদুল্লার মাতার সাহায্য করে এবং আবশ্যক মত বাজার-বেসাতিও করিয়া আনে।

এই ক্ষুদ্র সংসারটির খরচপত্র ওলিউল্লাহ্ ব্যবসায়ের আয় হইতে কষ্টে-সৃষ্টে নির্বাহ করিতেন, আবদুল্লার সে ব্যবসায় অবলম্বনে একেবারেই প্রবৃত্তি ছিল না। সে ভাবিতেছিল, চাকুরী করিতে হইবে। যদিও সে বি-এটা পাশ করিতে পারিল না, তথাপি উপস্থিত ক্ষেত্রে সামান্য যে কোন চাকুরী তাহার পক্ষে প্রাপ্য হইতে পারে, তাহারই দ্বারা সে সংসারের অসচ্ছলতা দূর করিতে সমর্থ হইবে।

এইরূপ স্থির করিয়া আবদুল্লাহ্ তাহার মাতাকে গিয়া কহিল যে, সে আর পড়াশুনা করিবে না, কলিকাতায় গিয়া যা হোক্ একটা চাকুরীর চেষ্টা করিবে।

হঠাৎ পুত্রের এইরূপ সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া মাতার মন বড়ই দমিয়া গেল। বি-এ পাশ করিয়া বড় চাকুরী করিবে কিংবা জজের উকীল হইবে—ইহাই আবদুল্লার চিরদিনের আশা; কি গভীর দুঃখে যে সে আজ সেই চিরদিনের আশা ত্যাগ করিয়া চাকুরীর সন্ধানে বাহির হইবার প্রস্তাব করিতেছে, মাতা তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাই নিতান্ত ব্যাকুল-কাতরদৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

আবদুল্লাহ্ তাহার মাতার কাতর দৃষ্টি সহিতে পারিল না! এক্ষণে কি বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবে ঠিক করিতে না পারিয়া কহিতে লাগিল, "তা আর কি ক'রব আম্মা, এখন সংসার-খরচই চলবে কেমন ক'রে তাই ভেবে দিশে পাচ্ছিনে। যদি সুবিধে-মত একটা চাকুরী পাই তা হ'লে সংসারটাও চ'লে যাবে, ঘরে ব'সে প'ড়ে পাশ করাও যাবে..."

মাতার বুক ফাটিয়া একটা গভীর নিশ্বাস পড়িল। তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন, "যা ভাল বোঝ, কর বাবা। সবই খোদার মর্জি।"

এই বলিয়া তিনি চুপ করিলেন। আবদুল্লাহ্ মনে মনে কলিকাতায় যাইবার দিন স্থির করিয়া কথা কি করিয়া পাড়িবে, তাহাই ভাবিতেছে, এমন সময় আবার মাতা কথা কহিলেন :

"একটা কাজ ক'ল্লে হয় না, বাবা?"

আবদুল্লাহ্ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ আম্মা?"

"একবার মুরীদানে গেলে হয় না? তারা কি কিছু সাহায্য ক'রবে না তোর পড়া-শুনার জন্য?"

মাতা জানিতেন, আবদুল্লাহ্ খোন্দকারী ব্যবসায়ের উপর অত্যন্ত নারাজ; তবু যদি এই দুঃসময়ে তাহার মন একটু নরম হয়, এই মনে করিয়া তিনি একটু ভয়ে ভয়েই মুরীদানে যাইবার কথা তুলিলেন, কিন্তু তিনি যাহা ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই হইল; আবদুল্লাহ্ একটু চঞ্চল হইয়া বলিয়া উঠিল, "না, আম্মা, সে আমাকে দিয়ে হবে না!"

মাতা নীরব হইলেন। আবদুল্লাহ্ দেখিল, সে তাহার মাতার মনে বেশ একটু আঘাত দিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সে যখন নিজের বিশ্বাস ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে প্রস্তুত নহে, তখন তাহার মতের সমর্থন করিয়া মাতাকে একটু বুঝাইবার জন্য কহিতে লাগিল, "আব্বাও ও কাজটা বড় পছন্দ ক'রতেন না; তবে আর উপায় ছিল না ব'লেই তিনি নিতান্ত অনিচ্ছায় মুরীদানে যেতেন। সেই জন্যইত' আমাকে তিনি ইংরেজী প'ড়তে দিয়েছিলেন, যাতে ও ভিক্ষের ব্যবসায়টা আর আমাকে না ক'রতে হয়।"

পুত্র যখন তর্ক উঠাইল, তখন মাতাও আর ছাড়িতে চাহিলেন না। তিনি তাহার যুক্তি খণ্ডাইবার জন্য কহিলেন, "তাই বুঝি? তোকে না তিনি মদ্রাসায় দিয়েছিলেন? তারপর তুই তো নিজে ইচ্ছে ক'রে মদ্রাসা ছেড়ে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হ'লি।"

আবদুল্লাহ্ কহিল, "তা হয়েছিলাম বটে, কিন্তু তাতে কোন দিনই আব্বার অমত ছিল না। তিনি বরাবর ব'লতেন, মাদ্রাসা পাশ ক'রে বেরুলে আমাকে ইংরেজী প'ড়তে দেবেন। ইংরেজী না প'ড়লে আজ-কাল—"

মাতা বাধা দিয়া কহিলেন, "তাঁর ইচ্ছে ছিল, তুই মৌলবী হবি তারপরে একটু ইংরেজী শিখবি; তা না ফস ক'রে মাদ্রাসা ছেড়ে ইংরেজী পড়া শুরু ক'রে দিলি। এ দিকও হ'ল না, ও-দিকও হ'ল না। আজ যদি তুই মৌলবী হ'তিস, তবে আর ভাবনা ছিল কি! এখন কি আর মুরীদরা তোকে মানবে?"

আবদুল্লাহ্ অবজ্ঞাভরে কহিল, "তা নাই বা মানল; আমি ত' আর তাদের দুয়ারে ভিখ মাগতে যাচ্ছি না!"

মাতা অনুরাগ করিয়া কহিলেন, "ছি বাবা, অমন কথা ব'লতে, নেই। মুরুব্বীরা সকলেই তো ঐ কাজ ক'রে গেছেন। যারা অবুঝ, তাদের হেদায়েত করার মত সওয়াবের কাজ কি আর আছে বাবা!"

"হ্যাঁ, হেদায়েত করা সওয়াবের কাজ বটে, কিন্তু তাতে পয়সা নেওয়াটা কোন মতেই সওয়াব হ'তে পারে না। বরং তার উল্টো।"

"তারা খুশী হ'য়ে সালামী দেয়, ওতে দোষ নেই, বাবা! সব দেশে, সকল জাতেই এ রকম দস্তুর আছে,—কেন, হিন্দুদের মধ্যে কি নেই।"

"তা থাকলই বা; তাদের আছে ব'লেই যে আমাদের সেটা থাকতে হবে, এমনত' কোনো কথা নেই, আম্মা! আর এই পীর-মুরীদি ব্যবসায়টা হিন্দুদের পুরুতগিরির দেখা-দেখিই শেখা, নইলে হযরত তো নিজেই মানা ক'রে গেছেন, কেউ যেন ধর্ম সম্বন্ধে হেদায়েত ক'রে পয়সা না নেয়!"

আবদুল্লার এই বক্তৃতায় মাতা একটু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "ওই তো ইংরেজী পড়ার দোষ, কেবল বাজে তর্ক কত্তে শেখে; শরীয়ত্ মানতে চায় না। তুই যে পীরগোষ্ঠীর নাম-কাম বজায় রাখতে পারবি নে, তা আমি সেই কালেই বুঝেছিলাম। সে যাক্‌গে, যা হবার তা হ'য়ে গেছে, এখন কি ক'রবি; তাই ঠিক কর।"

আবদুল্লাহ্ একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "পরীক্ষাটা যদি পাশ কর্ত্তে পারতাম, তবে একটা ভাল চাকুরী জুটতো। এখন চেষ্টা ক'রে বড় জোর ত্রিশ কি চল্লিশ টাকা মাইনে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তার জন্যও মুরুব্বী চাই যে আম্মা! কাকে যে ধ'রব তাই ভাবছি।"

যদিও ওলিউল্লাহ্ পুত্রকে প্রথমে মাদ্রাসায় দিয়াছিলেন, তথাপি তাহাকে ইংরেজী পড়াইবার ইচ্ছা তাঁহার খুবই ছিল। ইংরেজী না শিখিলে দুরবস্থা ঘুচিবে না, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এদিকে ইংরেজী শিখিয়া লোকের 'আকিদা' খারাব হইয়া যাইতেছে, তাহাও তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন; কাজেই প্রথমে মাদ্রাসায় পড়াইয়া পুত্রের 'আকিদা, পাকা করিয়া লইয়া তাহাকে ইংরেজী পড়িতে দিবেন মনে মনে তাঁহার এইরূপ সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু 'জমাতে চাহ্রম' পড়িয়াই যখন আবদুল্লাহ্ মাদ্রাসার ইংরেজী-বিভাগে গিয়া ভর্তি হইল, তখন তিনি আর বাধা দেন নাই। তাহার পর ক্রমে এন্ট্রান্স্ ও এফ-এ পাশ করিয়া যখন সে বি-এ পড়িতে লাগিল, তখন পুত্র হয় খুব বড় দরের চাকুরী পাইবে, না হয় উকীল হইয়া জেব ভরিয়া টাকা উপায় করিয়া আনিবে, এই আশা আবদুল্লার পিতামাতার অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন যে, ইংরেজী পড়িয়া সচরাচর ছেলেরা যেমন বিগড়াইয়া যায়, আবদুল্লাহ্ তেমন বিগড়ায় নাই। সে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রোজা রাখে; পাকা মুসল্লির মত সকল বিষয়েই বেশ পরহেজ করিয়া চলে। এক্ষেত্রে ইংরেজী পড়িয়া পুত্র যদি বড় লোক হইতে পারে, তাহাতে বাধা দিবেন কেন? খোদা উহাকে যেদিকে চালাইয়াছেন, ভালর জন্যই চালাইয়াছেন।

এক্ষণে স্বামীর অকালমৃত্যুতে পুত্রের বি-এ পাশের এবং বড় লোক হওয়ার আশা ভঙ্গ হইল; তাই আবদুল্লার জননীর মন বড়ই দমিয়া গিয়াছিল। যে হাকিম হইত অথবা অন্ততঃ জেলার একজন বড় উকীল হইতে পারিত, তাহার পক্ষে এখন সামান্য চাকুরীও মিলা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে, ইহাই মনে করিয়া তাঁহার অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে তিনি কহিলেন, "বাবা একটা কাজ ক'ল্লে হয় না?"

মাতার অশ্রুনিরুদ্ধ কণ্ঠ আবদুল্লাহকে বিচলিত করিয়া তুলিল। সে যেন মাতার আদেশ তৎক্ষণাৎ পালন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ, আম্মা।"

মাতা কহিলেন, "আমাদের এখন যেমন অবস্থা, তাতে ত' আর অভিমান ক'রে থাকলে চলবে না, বাবা! তোর শ্বশুরের কাছে গিয়ে কথাটা একবার পেড়ে দেখ,—তিনি বড় লোক, ইচ্ছা ক'ল্লে অনায়াসে এই ক'টা মাস তোর পড়ার খরচটা চালিয়ে দিতে পারেন।"

এই প্রস্তাবে আবদুল্লার মন দমিয়া গেল। সে কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে না পারিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "পরের কাছে হাত পাততে ইচ্ছে করে না, আম্মা।"

মাতা আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "পর কিরে! তাঁর সঙ্গে যে তোর কেবল শ্বশুর-জামাই সম্পর্ক, এমন ত' আর নয়!"

আবদুল্লাহ্ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। মাতা আবার কহিলেন, "কি বলিস্?"

আবদুল্লাহ্ কহিল, "বল্‌ব আর কি, আম্মা; তিনি যে সাহায্য ক'রবেন,, এমন ত' আমার মনে হয় না।"

"তিনি সাহায্য করবেন না, আগে থেকেই তুই ঠিক করে রাখলি কি ক'রে? একবার ব'লেই দ্যাখ না?"

আবদুল্লাহ্ কহিল, "তিনি নিজে ছেলের সঙ্গে সেবার কেমন ব্যবহার ক'রেছিলেন, তা' কি আপনি জানেন না আম্মা? আবদুল কাদের আর আমি যখন মাদ্রাসা ছেড়ে স্কুলে ভর্তি হই, তখন আব্বাকে আমি জানিয়েছিলাম, কিন্তু সে তার বাপের কাছে গোপন রেখেছিল। সে খুবই জানত যে তার বাবা একবার জানতে পারলে আর কিছুতেই পড়ার খরচ দেবেন না; কেননা তিনি ইংরেজী শেখার উপর ভারী নারাজ। ফলে ঘ'টলও তাই; কয়েক বৎসর কথাটা গোপন ছিল, তার পর যখন আমরা ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠলাম, তখন কেমন ক'রে যেন আমার শ্বশুর সে কথা জানতে পারলেন, আর অমনি বেচারার পড়া বন্ধ ক'রে দিলেন! আর আমি ইংরেজী পড়ি ব'লে আমার উপরও তিনি সেই অবধি নারাজ হ'য়ে আছেন। হয়ত বা মনে করেন যে, আমিই কুপরামর্শ দিয়ে তাঁর ছেলেকে খারাব ক'রে ফেলেছি।

মাতা কহিলেন, "না তিনি দিনদার পরহেজগার মানুষ, তাঁর ইচ্ছে ছিল ছেলেকে আরবী পড়িয়ে মৌলবী করেন। ছেলে যখন বাপের অবাধ্য হ'ল, আবার কথাটা এদ্দিন গোপন রাখল, তখন ত' তাঁর রাগ হবারই কথা! তুই ত' আর বাপের অমতে ইংরেজী প'ড়তে যাস্‌নি, তোর উপর তিনি কেন নারাজ হ'তে যাবেন?

আবদুল্লাহ্ কহিল, "কিন্তু আমার মনে হয় আম্মা, তিনি আমাকে বড় ভাল চোখে দেখেন না। দেখুন, আব্বার ব্যারামের সময় নিজে তো কোন খবর নিলেনই না, "আবার হালিমাকে কি আপনাদের বউকে,—কাউকে পাঠালেন না..."

মাতা বাধা দিয়া কহিলেন, "সে তো তাঁর দোষ নয়, বাবা। তিনি যে তখন বাড়ী ছিলেন না। তারপর যদিই বা বাড়ী এলেন, নিজেই শয্যাগত হ'য়ে প'ড়লেন, নইলে কি আর তিনি আসতেন না?"

বড় আদরের একমাত্র মেয়ে-পুত্রবধূকে স্বামী মৃত্যুকালে দেখিতে চাহিয়াও দেখিতে পান্ নাই, এই কথা মনে করিয়া আবদুল্লাহ্-জননীর শোক আবার উথলিয়া উঠিল। তিনি ভগ্নকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "যাক্ সে সব কথা—বরাতে যা ছিল হ'য়ে গেছে, তা নিয়ে এখন মন ভার ক'রে থেকে আর কি হবে! দোষ কারুরই নয় বাবা, সবই খোদার মর্জ্জি। তুই অনর্থক অভিমান

ক'রে থাকিস নে। আর তোর শ্বশুর যে আমাদের নিতান্ত আপনার জন; তাঁর সঙ্গে আর অভিমান কি বাবা!"

আবদুল্লার শ্বশুর যে বাস্তবিকই একজন বড় লোক ছিলেন, তাহা নহে। কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ হইয়াও তাঁহার মনে বড় লোকের আন্তম্ভরিতাটুকু পুরা মাত্রায় বিরাজ করিত। তাঁর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনাবস্থার লোককেই তিনি কৃপার চক্ষে দেখিতেন। এরূপ চরিত্রের লোক পিতার খালাত' এবং মাতার ফুফাত' ভাই হইলেও তাঁহাকে "নিতান্ত আপনার জন" বলিয়া মনে করিয়া লইতে আবদুল্লার প্রবৃত্তি ছিল না। কিন্তু সে তাহার স্নেহ-পরায়ণা মাতার বড়ই অনুগত ছিল; তাঁহার নিজের ফুফাত' ভাইয়ের প্রতি সনির্বন্ধ বিরাগ দেখাইলে পাছে তাঁহার মনে কষ্ট হয়, এই ভাবিয়া সে অবশেষে কহিল, "তা আপনি যখন বলছেন আম্মা, তখন একবার তাঁর কাছে গিয়েই দেখি।"

মাতা প্রীত হইয়া কহিলেন, "হ্যাঁ বাবা তাই যা, আর দেরী করিসনে। আমি বলি কাল ভোরেই বিসমিল্লাহ্ বলে রওয়ানা হও।"

২

পরদিন রাত্রি শেষ না হইতেই আবদুল্লার মাতা শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং তাড়াতাড়ি চারিটি ভাত রাঁধিয়া যখন আবদুল্লাকে ডাকিতে গেলেন, তখনও আকাশ পরিষ্কার হয় নাই। মাতার আহ্বানে আবদুল্লাহ্ শয্যার উপর উঠিয়া চোখ কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে কহিল, "এত রাত থাক্‌তে!"

"রাত কোথায় রে? কাক-কোকিল সব ডেকে উঠল যে! নে ওঠ্, নামাযটা প'ড়ে চাট্টি খেয়ে বেরিয়ে পড়্।"

"এত ভোরে আবার খাব কি আম্মা?"

"চাট্টি ভাত রেঁধে রেখেছি বাবা—"

"আপনি বুঝি রাত্রে ঘুমোন নি, ব'সে ব'সে ভাত রেঁধেছেন?"

মাতা একটু হাসিয়া কহিলেন, "দেখ, হাবা ছেলে বলে কি শোন। চাট্টি ভাত রাঁধতে বুঝি সারা রাত জাগতে হয়? আমি ত' এই একটু আগেই উঠ্‌লাম। এতটা পথ যাবি, চাট্টি খেয়ে না গেলে পথে ক্ষিধেয় কষ্ট পাবি যে, বাবা।"

আবদুল্লাহ্ আলস্য ত্যাগ করিতে করিতে কহিল, "তা খাওয়াটা একটু বেলা উঠলেও তো হ'তে পারতো।"

বেলা উঠে গেলে রোদে কষ্ট পাবি। নে, "এখন ওঠ; আর আলিস্যি করিস্ নে।"

আবদুল্লাহ্ কহিল, "রোদে কষ্ট পাব কেন, আম্মা, আমি তো আর এক টানে পথ হাঁটব না, পথে জিরিয়ে যাব ঠিক ক'রেছি।"

"কোথায় জিরুবি?"

"কেন্ শাহ্‌পাড়ায় গোলদারদের বাড়ী? তারা লোক বড় ভাল, আমাকে খুব খাতির করে।"

মাতা মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারা যে তোমাদের মুরীদান, তাদের বাড়ী যাবি? শেষকালে যদি......"

আবদুল্লাহ্ বাধা দিয়া কহিল, "ওঃ, আমি বুঝি সেখানে খোনকারী ক'র্‌তে যাব! এমনি যাব মেহ্‌মানের মত। একবেলা একটু জিরিয়ে আবার বেলা প'ড়লে বেরিয়ে প'ড়ব!"

"যদি তারা সালামী-টালামী দেয়?"

"দিলেই অমনি নিয়ে নিলুম আর কি!"

"তারা যে তা হ'লে বড্ড বেজার হবে, বাবা!"

"তা হলে আর কি ক'রব আম্মা। যতদূর পারি তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে মানিয়ে নিতে চেষ্টা ক'রতে হবে।"

এমন সহজলভ্য উপজীবিকা যাহাদের চিরদিনের অভ্যাস, অতি সামান্য হলেও তাহাদের পক্ষে উহার আশা পরিত্যাগ করা কঠিন, তাই মাতা মনে মনে একটু ক্ষুণ্ন হইলেন। এখনও যদি আবদুল্লাহ্ একবার মুরীদানে গিয়া ঘুরিয়া আসে, তাহা হইলে তাহার পড়ার ভাবনা থাকে না। কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হইবে না; অগত্যা তিনি ভাবিলেন, থাক্, যে কাজে উহার মন যায় না সে কাজের জন্য পীড়াপীড়ি করা ভাল নহে। খোদা অবশ্যই একটা কিনারা করিয়া দিবেন।

আবদুল্লার ইচ্ছা ছিল একটু বেলা হইলে ধীরে-সুস্থে বাটী হইতে বাহির হইবে; কিন্তু মাতার পীড়াপীড়িতে ফজরের নামায বাদেই তাহাকে দুটী খাইয়া রওয়ানা হইতে হইল।

একবালপুর তাহাদের বাটী হইতে আট ক্রোশ। পিতা বাঁচিয়া থাকিতে আবদুল্লাকে কখনও এতটা পথ হাঁটিয়া যাইতে হয় নাই, গরুর গাড়ী অথবা কোন কোন সময়ে পাল্কী করিয়া সে শ্বশুরালয়ে যাতায়াত করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে টানাটানির সংসারে মিতব্যয়িতার নিতান্ত দরকার বুঝিয়া সে হাঁটিয়াই চলিয়াছে। মাতা অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, দুই এক টাকা গাড়ী ভাড়া দিলে কতই বা টানাটানি বাড়িত! কিন্তু সে কিছুতেই গাড়ী লইতে রাজি হয় নাই।

গ্রামখানি পার হইয়াই আবদুল্লাহ্ এক বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িল। তখন শরৎকাল প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। মাঠগুলি ধান্যে পরিপূর্ণ; মৃদুমন্দ বায়ুহিল্লোলে তাহাদের শ্যামল হাস্যে ক্ষণে ক্ষণে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছে। এই অপূর্ব নয়ন তৃপ্তিকর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে এবং শারদীয় প্রভাতের সুখ-শীতল সমীরণের মধুর স্পর্শ অনুভব করিতে করিতে আবদুল্লাহ্ মাঠের পর মাঠ এবং গ্রামের পর গ্রাম পার হইয়া চলিতে লাগিল।

ক্রমে বেলা বাড়িয়া উঠিল এবং ক্লান্ত পথিকের পক্ষে হৈমন্তিক রৌদ্রও অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং তিন চারি ক্রোশ পথ হাঁটিবার পর শ্রান্তি দূর করিবার জন্য আবদুল্লাহ্ এক মাঠের প্রান্তে বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর যখন তাহার মন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তখন নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা কথা মনে উঠিতে লাগিল। এতদিন সে যে উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিল, তাহা সফল হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, ক্লান্তদেহে আজ বটবৃক্ষতলে বসিয়া সে মনে মনে ভবিষ্যতের যে চিত্রটী আঁকিতেছিল, তাহা নিতান্ত উজ্জ্বলতাহীন নহে। সে ভাবিতেছিল চাকুরী তাহাকে করিতেই হইবে, আর কোন উপায় নাই। সরকারী চাকুরী তো পাওয়া কঠিন, মুরুব্বী না ধরিতে পারিলে সামান্য কেরাণীগিরিও জুটিবে না। কিন্তু মুরুব্বী কোথায় পাইবে? কাহাকে ধরিবে? সোজাসুজি গিয়া সাহেব-সুবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাইতে পারে। কিন্তু কি চাকুরীর জন্য চেষ্টা করিবে? পুলিশের?—নাঃ, ও চাকুরীটা ভাল নয়। সবরেজিষ্টারী?—ওটা পাওয়া বড় কঠিন নাও হইতে পারে; কত এন্ট্রান্স ফেল সবরেজিষ্টার হইতেছে, কিন্তু অনেক দিন এপ্রেন্টিসি করিতে হয়; ত্রিশ কি চল্লিশ টাকা মাহিনা পাওয়া যাইতে পারে, চাই কি একটা টুইশন যোগাড় করিতে পারিলে আরও দশ-বিশ টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আরও বিশেষ সুবিধা এই যে, মাষ্টারী করিতে করিতে বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া যাইবে। একটা মস্ত লাভ। আর কোন চাকুরীতে এই সুবিধাটা হইবে না। শ্বশুর তো সাহায্য করিবেনই না, তাহা জানা আছে; কেবল আম্মাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য একবার তাঁহার কাছে যাওয়া। তা' তিনি সাহায্য নাই করিলেন, পরের সাহায্য গ্রহণ না করিতে হইলেই ভাল। আবদুল্লাহ্ মাষ্টারী করিবে; বি-এ পাশ করিয়া তাহার চিরদিনের ঐকান্তিক বাসনা পূর্ণ করিয়া জীবন সফল করিবে। হাতে কিছু টাকা জমাইয়া আবার কলিকাতায় দুই বৎসর আইন পড়িবে—এখানেও একটী টুইশন যোগাড় করিয়া লইবে। পাশ করিয়া যখন সে ওকালতী আরম্ভ করিবে তখন আর ভাবনা কি?—চাই কি, তখন দেশের কাজে, সমাজের কাজে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া যাইবে। ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার, স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তন প্রভৃতি ব্যাপারে সে জীবন উৎসর্গ করিয়া

ধন্য হইবে। এই সকল সংস্কার সুসম্পন্ন না হইলে, বিশেষতঃ যতদিন স্ত্রী-শিক্ষা সমাজে প্রচলিত করা না যাইতেছে, ততদিন মুসলমানদের কুসংস্কারের আবর্জনা দূর হইবে না; এবং তাহা না হইলে সমাজের উন্নতি একেবারেই অসম্ভব। আবদুল্লাহ্ মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিল যে, খোদা যদি দিন দেন, তবে স্ত্রী-শিক্ষার জন্য তাহার যথাসর্বস্ব পণ করিয়া ফেলিবে।

এইরূপ সুমহৎ সঙ্কল্প করিতে করিতে হঠাৎ আবদুল্লার চৈতন্য হইল যে, বেলা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। শাহ্‌পাড়ায় পৌঁছিতে এখনও এক ক্রোশ পথ বাকী; কাজেই তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে আবার পথ লইতে হইবে।

৩

আবদুল্লাহ্ যখন শাহ্‌পাড়ার গোলদার বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। সংবাদ পাইয়া গৃহস্বামী কাসেম গোলদার ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল এবং তাহার দীর্ঘ শুভ্র শুশ্রুরাজি ভূলুণ্ঠিত করিয়া আবদুল্লার 'কদমবুসি' করিতে উদ্যত হইল! এ ধরনের অভিনন্দনের জন্য আবদুল্লাহ্ একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। পথে হঠাৎ সাপ দেখিলে মানুষ যেমন এক লম্ফে হটিয়া দাঁড়ায়, সেও তেমনি হটিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, "আহা, করেন কি, করেন কি, গোলদার সাহেব।"

কাসেম গোলদার বড়ই সরলপ্রাণ, ধর্মপরায়ণ, পীরভক্ত লোক। আবদুল্লার পিতা তাহার পীর ছিলেন; এক্ষণে তাঁহার মৃত্যুতে আবদুল্লাহ্ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত বলিয়া মনে করিয়া লইয়া সে আবদুল্লার 'কদমবুসি' করিবার জন্য নত মস্তকে হাত বাড়াইয়াছিল। কিন্তু আবদুল্লাহ্ পা টানিয়া লওয়ায় সে উহা স্পর্শ করিতে পাইল না; তাহার মনে হইল বেহেশতের দুয়ারের চাবি তাহার হাতের কাছ দিয়া সরিয়া গেল। বড়ই মর্মপীড়া পাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে কাসেম কহিতে লাগিল, "আমাদের কি পায়ে ঠেললেন, হুজুর! আমরা আপনাদের কত পুরুষের মুরীদ! আপনার কেবলা সাহেব তাঁর এই গোলামের উপর বড়ই মেহেরবান ছিলেন; আপনি আমাদের পায়ে না রাখলে কি উপায় হবে, হুজুর!"

কাসেমের মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করিয়া আবদুল্লাহ্ বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া গেল। চিরদিনের সংস্কারবশে যে ব্যক্তি তাহাকে পূর্ব হইতেই পীরের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে এবং আজ সরল বিশ্বাসে প্রাণের ঐকান্তিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা অঞ্জলি ভরিয়া নিবেদন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, আবদুল্লার এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাখ্যান যে সে ব্যক্তির প্রাণে গুরুতর আঘাত দিবে ইহা আর বিচিত্র কি! কিন্তু উপায় নাই। এ আঘাত অনেককেই দিতে হইবে এবং অনেকবার তাহাকে এইরূপ অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে।

আবদুল্লাহ্ কহিল, "অমন কথা বলবেন না, গোলদার সাহেব। আমার বাপ-দাদা সকলেই পীর ছিলেন মানি, কিন্তু আমি ত' তাঁদের মত পীর হবার যোগ্য হইনি। ও-কাজটা আমার দ্বারা কোন মতেই হবে না। তা ছাড়া আপনি বৃদ্ধ, সুতরাং আমার মুরুব্বী; এ ক্ষেত্রে আমারই উচিত আপনার 'কদমবুসি' করা।"

কাসেম শিহরিয়া উঠিয়া দাঁতে জিভ কাটিয়া কহিল, "আরে বাপ্‌রে বাপ্! এমন কথা ব'লে আমাকে গোনাহ্‌গার করবেন না, হুজুর! যে বংশে খোদা আপনাকে পয়দা করেছেন, তার এক বিন্দু রক্ত যাঁর গাঁয়ে আছে, তিনিই আমাদের পীর, আমাদের মাথার মণি। আপনাদের পায়ের একটুখানি ধূলো পেলেই আমাদের আখেরাতের পথ খোলাসা হয়ে যায়, হুজুর!

আবদুল্লাহ্ একটুখানি হাসিয়া কহিল, "খোদা না করুন যেন আখেরাতের পথ খোলাসা ক'রবার জন্যে কাউকে আমার মত লোকের পায়ের ধূলো নিতে হয়। তা যাকগে, এখন আমি যে এতটা পথ হেঁটে হয়রান হয়ে এলাম, আমাকে একটু বিশ্রাম করতে দিতে হবে, সে কথা কি ভুলে গেলেন গোলদার সাহেব?"

কাসেমের চৈতন্য হইল। তাই'! এতক্ষণ সে কথাটা যে তাহার খেয়ালেই আসে নাই। তখনই, "ওরে বিছানাটা পেতে দে, পানি আন, তেল আন্, গোসলের যোগাড় কর" ইত্যাকার শোরগোল পড়িল গেল।

আবদুল্লাহ্ যখন মুরশিদের প্রাপ্য ভক্তি-নিদর্শনগুলি গ্রহণ করিয়া কাসেমের মনের বাসনা পূর্ণ করিতে অস্বীকার করিল, তখন সে অন্তত মেহ্‌মানদারী বাবদে সে ত্রুটি ষোল আনা সংশোধন করিয়া লইতে চেষ্টা করিল। সময়াভাবে এ-বেলা কেবল মোরগের গোশ্‌ত এবং মুগের ডা'ল প্রভৃতির দ্বারা কোন প্রকারে মেহ্‌মানের মান রক্ষা হইল বটে, কিন্তু রাতের জন্য বড় এক জোড়া খাশীর এবং সেই উপলক্ষে গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগণকেও দা'ওৎ করিবার বন্দোবস্ত হইয়া গেল।

এদিকে বেলা প্রায় তিন প্রহরের সময় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া যখন আবদুল্লাহ্ কাসেম গোলদারকে ডাকিয়া কহিল যে, আর বিলম্ব করিলে চলিবে না, তাহাকে এখনই রওয়ানা হইতে হইবে, নহিলে সন্ধ্যার পূর্বে একবালপুরে পৌঁছিতে পারিবে না, তখন কাসেমের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে হাত দুটি জোড় করিয়া এমনই কাতর মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি তাহার মুখের উপর স্থাপন করিল যে, বেচারা বুড়া মানুষের মনে দ্বিতীয়বার দুঃখ দিতে আবদুল্লার মন সরিল না। সুতরাং সে সেখানেই সেদিনকার মত রাত্রিবাস করিতে রাজি হইয়া গেল। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কাসেম তৎক্ষণাৎ কোমর বাঁধিয়া যথারীতি আয়োজনে লাগিয়া পড়িল।

সারাটা বৈকাল এবং রাত্রি এক প্রহর ধরিয়া লোকজনের আনাগোনা, চীৎকার, বালক-বালিকাগণের গণ্ডগোল এবং ডেগ্‌চি কাফগীরের ঘন-সঙ্ঘাতে গোলদার-বাড়ী মুখরিত হইতে লাগিল। এই বিরাট ব্যাপার দেখিয়া আবদুল্লাহ্ ভাবিতে লাগিল, মুসলমান সমাজে পীর-মুরশিদের সম্ভ্রম ও মর্যাদা কত উচ্চ। গোলদারেরা না হয় সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ; ইহাদের পক্ষে মুরশিদের অভ্যর্থনার জন্য অম্লানবদনে অর্থব্যয় করা অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু নিতান্ত দরিদ্র যে, সে-ও তাহার বহু যত্নপাতি খাশী-মুরগীর মায়া গৃহাগত মুরশিদের সেবায় উৎসর্গ করিয়া এবং মহাজনের নিকট হইতে উচ্চ হারের সুদে গৃহীত ঋণের শেষ টাকাটি সালামী স্বরূপ তাঁহার চরণপ্রান্তে ফেলিয়া দিয়া বেহেশ্‌তের পাথেয় সঞ্চয় হইল ভাবিয়া আপনাকে ধন্য মনে করে।

রাত্রে আহারাদির পর কাসেম কয়েকজন মাতব্বর লোক লইয়া এক মজলিস বসাইল এবং তাহাদের এই একমাত্র পীর-বংশধর যে পৈতৃক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া হতভাগ্য মুরীদগণের পারত্রিক কল্যাণ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছেন ইহাই লইয়া নানা ছন্দোবন্ধে দুঃখ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। পীরগোষ্ঠী যে কত বড় কেরামতকুশল, সমাগত লোকদিগকে তাহা বুঝাইবার জন্য সে আবদুল্লার পূর্বপুরুষগণের বিষয়ে অনেক গল্প বলিতে লাগিল।

প্রথম যিনি আরব হইতে পীরগঞ্জে আসেন—সে কত কালের কথা, তাহার ঠিকানা নাই;—তিনি প্রকাণ্ড এক মাছে চড়িয়া সাগর পার হইয়াছিলেন; তাই তাঁহাকে সকলে 'মাহী সওয়ার' বলিত। তিনি কত বড় পীড় ছিলেন, তাঁহার "দস্ত-মোবারকের" স্পর্শমাত্রেই কেমন করিয়া মরণাপন্ন রোগীও বাঁচিয়া উঠিত, ঘরে বসিয়াই তিনি কেমন করিয়া বহুক্রোশ দূরবর্তী নদীবক্ষে মজ্জমান নৌকা টানিয়া তুলিয়া ফেলিতেন এবং সেই ব্যাপারে কিরূপে তাঁহার আস্তিন ভিজিয়া যাইত, আকাশে হাত তুলিয়া "আও—আও" বলিয়া ডাকিতেই কোথা হইতে হাজার হাজার কবুতর আসিয়া জুটিত এবং তিনি হাত নাড়িয়া কি প্রকারে আস্তিনের ভিতর হইতে রাশি রাশি ধান, ছোলা, মটর প্রভৃতি বাহির করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতেন, সে সকল ঘটনা সালঙ্কারে বর্ণনা করিয়া কাসেম সকলকে স্তম্ভিত ও চমৎকৃত করিয়া দিল। আবার শুধু তিনিই যে একলা পীর ছিলেন এমন নহে, তাঁহার বংশেও অনেক বড় বড় পীর জন্মিয়া গিয়াছেন; এমন কি, কেহ কেহ শিশুকালেই এমন আশ্চর্য কেরামত দেখাইয়াছেন যে, তাহা ভাবিলেও অবাক্ হইতে হয়। 'মাহী-সওয়ার' পীর সাহেবের পৌত্র কিংবা প্রপৌত্রের একটি বড় আদরের কাঁঠাল গাছ ছিল। একবার তাহাতে একটিমাত্র কাঁঠাল ফলিয়াছিল, সেটা তিনি নিজে খাইবেন বলিয়া ঠিক করিয়া

রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতকালে তাঁহার এক বালক পুত্র ঐ কাঁঠাল পাড়িয়া খাইয়া ফেলেন। বাটী আসিয়া পীর সাহেব যখন দেখিলেন যে কাঁঠাল নাই, তখন তিনি বড়ই রাগান্বিত হইয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কে উহা খাইয়াছে। সকলেই জানিত, কিন্তু ভয়ে কেহ বলিল না। অবশেষে তিনি পুত্রের বিমাতার নিকট জানিতে পারিলেন কাহার এই কাজ। তখন পুত্রের তলব হইল; কিন্তু তিনি অস্বীকার করিলেন এবং কহিলেন, "কেন, বাপ-জান, কেহ ত' সে কাঁঠাল খায় নাই, গাছের কাঁঠাল গাছেই আছে।

তাহার পর পীর সাহেব গিয়া দেখেন, সত্যসত্যই গাছের কাঁঠাল গাছেই ঝুলিতেছে! দেখিয়া ত' তিনি অবাক্ হইয়া গেলেন, কিন্তু ব্যাপার কি, তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। তখন তাঁহার বড় গোস্বা হইল; তিনি বলিলেন, "কেয়া এক গরমে দো পীর! যাও বাচ্চা, সো রহো। সেই যে বাচ্চা গিয়া শুইয়া রহিলেন, আর উঠিলেন না!

আবদুল্লাহ্ নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বসিয়া কাসেমের এই সরল বিশ্বাসের উচ্ছ্বাস-রঞ্জিত উপাখ্যানগুলি জীর্ণ করিতেছিল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়া চলিল দেখিয়া অবশেষে মজলিস ভঙ্গ করিয়া সকলে উঠিয়া গেল। অতঃপর আবদুল্লাহ্ শুইয়া ভাবিতে লাগিল, পুত্রের পীরত্বে পিতার হৃদয়ে এরূপ সংঘাতিক হিংসার উদ্রেক আরোপ করিয়া ইহারা পীর-মাহাত্ম্যের কি অদ্ভুত আদর্শই মনে মনে গড়িয়া তুলিয়াছে!

৪

বহু কষ্টে বৃদ্ধ কাসেম গোলদারের সরল ভক্তিজাল ছিন্ন করিয়া পরদিন বৈকালে আবদুল্লাহ্ একবালপুরে পৌছিল।

আবদুল্লার বড় সম্বন্ধী আবদুল মালেক এইমাত্র নিদ্রা হইতে উঠিয়া বৈঠকখানার বারান্দার এক প্রান্তে জলচৌকীর উপর বসিয়া 'ওজু' করিতেছিলেন। লোকটি হাফেজ এবং উৎকট পরহেজগার; ওজুর সময় কথা বলিলে গোনাহ্ হইবে বলিয়া কেবল একটুখানি মুচকি হাসিয়া তিনি আপাততঃ ভগ্নীপতির অভ্যর্থনার কাজ সারিয়া লইলেন এবং পুনরায় সযত্নে ওজু-ক্রিয়ায় মনোনিবেশ করিলেন। ওজু শেষে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর দুলামিঞা, ধরগে, তোমার কি মনে ক'রে? খবর ভাল ত'?"

আবদুল্লাহ্ তাঁহার কদমবুসি করিয়া কহিল, "জি হাঁ, ভালই। আপনি কেমন আছেন?"

"আছি ভাল। একটু বোস ভাই, আমি আসরের নামায পড়ে নি।" এই বলিয়া আবদুল মালেক নামায পড়িতে গেল।

এদিকে চাকর মহলে "দুলামিঞা", "দুলামিঞা এয়েছেন" বলিয়া একটা কলরব উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে উহা অন্দরমহল পর্যন্ত সংক্রামিত হইয়া পড়িল। কয়েকটা বাঁদী দরজার প্রান্তদেশ হইতে মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ দুলামিঞা রে?" চাকরেরা জবাব দিল, "পীরগঞ্জের দুলামিঞা।" বাঁদীরা সেই সংবাদ লইয়া অন্দরের দিকে দৌড়িয়া গেল।

দুলামিঞার আগমন-সংবাদে অন্দর হইতে একদল ছোট ছোট শ্যালক ছুটিয়া আসিল,—কেহ আবদুল্লার নিকটে আসিয়া কদমবুসি করিল এবং নিতান্ত ছোটগুলি একটু তফাতে দাঁড়াইয়া মুখে আঙ্গুল দিয়া চাহিয়া রহিল।

আবদুল্লাহ্ ইহাদিগের সহিত একটু মিষ্টালাপ করিতেছে, এমন সময় আবদুল মালেক নামায পড়িয়া উঠিয়া একজন চাকরকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওরে দুলামিঞার ওজুর পানি দে।"

আবদুল্লাহ্ ওজু করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "আবদুল কাদের কোথায়?"

আবদুল মালেক কহিল, "ওঃ, সে আজ ধরগে' তোমার মাস তিনেক হ'ল, বাড়ী ছাড়া।"

"কেন, কোথায় গেছে?"

"খোদা জানে, কোথায় গেছে! আব্বার সঙ্গে, ধরগে, তোমার এক রকম ঝগড়া ক'রেই চ'লে গেছে।"

আবদুল্লাহ্ একটু শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কেন, কি নিয়ে ঝগড়া কল্লে?"

আবদুল্লাহ পায়ের ধূলা-মাটি ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিবার জন্য একজন চাকরকে আর এক বদ্‌না পানির জন্য ইশারা করিল। ছোক্‌রার দলের মধ্যে একজন খিল্‌-খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিরক্ত হইয়া আবদুল মালেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসছিস কেন রে?"

একজন কহিল, "ঐ দেখুন, ভাইজান, দুলাভাই নাঙ্গল চ'ষে এয়েছেন, তাই এক হাঁটু ধুলো-কাদা লেগে র'য়েছে।"

আবদুল মালেক এক ধমক দিয়া কহিলেন, "যা—যাঃ! ছোঁড়াগুলো ধরগে' তোমার ভারী বেতমিজ হ'য়ে উঠেছে! যা-না তোরা, ওজু ক'রে আয় গে, নামাযের ওক্ত হ'য়ে গেছে, এখনো ধরগে' তোমার দাঁত বার ক'রে হাসছে আর ফাজলাম' করছে। যাঃ—"

ছেলের দল তাড়া খাইয়া চলিয়া গেলে আবদুল মালেক কহিলেন, "সত্যি, দুলামিঞা, এমন ক'রে হেঁটে আসাটা ধরগে' তোমার ভাল হয়নি। নিদেন পক্ষে একখানা গরুর গাড়ী ক'রে তোমার আসা উচিত ছিল।"

আবদুল্লাহ্ কহিল, "আমার মত গরীবের পক্ষে অতটা আমীরি পোষায় না, ভাই সাহেব!"

"আরে না, না; এ ধরগে' তোমার আমীরির কথা হচ্ছে না। লোকের মান-অপমান আছে ত'। এতে ধরগে' তোমার লোকে ব'লবে কি?"

"লোকে কি বলে না বলে, তা হিসেব ক'রে সকল সময় কি চলা যায়? লোকে কেবল বল্‌তেই জানে, কিন্তু গরীবের মান বাঁচাবার পয়সা যে কোত্থেকে আস্‌বে তা ব'লে দেয় না!"

"একখানা গরুর গাড়ী ক'রে আস্‌তে ধরগে' তোমার কতই বা খরচ হ'ত!"

"তা যতই হোক, গরীবের পথে সেটা মস্ত খরচ বই কি?"

"তবু, ধরগে' তোমার খোদা যে ইজ্জতটুকু দিয়েছেন, সেটুকু ধরগে' তোমার বজায় রাখতে ত' হবে!"

"যে ইজ্জতের সঙ্গে খোদা পয়সা দেন নি, সেটা ইজ্জতই নয়, ভাই সাহেব। বরং তার উল্টো। সেটাকে যে হতভাগা জোর ক'রে ইজ্জত ব'লে চালাতে চায়, তার কেস্‌মতে অনেক দুঃখ লেখা থাকে।"

কথাটা আবদুল মালেকের ঠিক বোধগম্য হইল না; সুতরাং কি জবাব দিবেন স্থির করিতে না পারিয়া তর্কটা ঘুরাইয়া দিবার জন্য কহিলেন, "তোমরা ভাই দু'পাতা ইংরেজী প'ড়ে কেবল ধরগে' তোমার তর্ক করতেই শেখ; তোমাদের সঙ্গে ত' আর কথায় পারা যাবে না। ধরগে' তো—"

আবদুল্লাহ্ বাধা দিয়া কহিল, "যাকগে, ও সব বাজে তর্কে কাজ নেই। আমি নামাযটা পড়ে নিই।" নামায শেষে আবদুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যে বল্‌ছিলেন, আব্দুল কাদের বাড়ী থেকে ঝগড়া ক'রে বেরিয়েছে......"

আবদুল মালেক কহিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে গোঁ ধরেছে, চাকরী ক'রবে। আব্বা বলেন, না, আবার মাদ্রাসায় পড়ঃ—তা তিনি ধরগে, তোমার ভাল কথাই বলেন; দু'তিন বছর ঘরে ব'সে নষ্ট কল্লে, পড়া-শুনা কিচ্ছু করে না—তদ্দিনে সে ধরগে' তোমার পাশ-করা মৌলবী হ'তে পারত—দীনী ইল্‌ম্‌ হাসেল ক'রত। তা সে দিকে ত' তার মন নেই; বলে চাকরী ক'রবে।"

'তা বেশ ত', চাকরী কল্লেই বা, তাতে ক্ষেতিটা কি হ'ত?"

আবদুল মালেক বিরক্ত হইয়া কহিলেন, 'হ্যাঁঃ, চাকারী ক'রবে। আমাদের খান্‌দানে ধরগে' তোমার কেউ কোন কালে চাকরী কল্লে না। আর আজ সে যাবে চাকরী কত্তে? তা যদি ধরগে' তোমার তেমন বড় চাকরী-টাকরী হ'ত, না হয় দোষ ছিল না;—উনি যে কটর-মটর একটু

ইংরেজী শিখেছেন, তাতে ধরগে' তোমার ছোট চাকরী ছাড়া আর কি জুটবে? তাতে মান থাক্‌বে? তাতে বাপ-দাদার নাম ধরগে তোমার......"

"সে গেছে কোথায়, ভাই সাহেব?"

"গেছে সদরে, আর যাবে কোথায়?"

"মোল্লার দৌড় ধরগে" তোমার মস্‌জিদ পর্যন্ত কিনা!" বলিয়া আবদুল মালেক একটু হাসিয়া দিলেন।

আবদুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিল, "সেখানে ব'সে কি কচ্ছে, তার কোন খবর পেয়েছেন?"

"ক'রবে আর কি? সেখানে আকবর আলী ব'লে একজন আমলা আছে তার বাপ ধরগে' তোমার প্যাদাগিরি ক'র্ত্ত—তারি ছেলে পড়ায় আর সে চাট্টি খেতে দেয়। সে নাকি ব'লেছে ওকে সবরেজিষ্টার ক'রে দেবে!"

আবদুল্লাহ্ কহিল, "বেশ ত' যদি সবরেজিষ্টার হ'তে পারে ত' মন্দ কি?"

আবদুল মালেক নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত কহিলেন, "হ্যাঃ, সবরেজিষ্টার চাকরী ধরগে' তোমার অম্‌নি মুখের কথা আর কি! তাতে প্যাদার পোকে মুরব্বী ধরেছেন, দুনিয়ায় আর লোক পান্‌নি!"

এই প্যাদার পো'টি কে, জানিবার জন্য আবদুল্লার বড়ই উৎসুক হইল, কিন্তু তাহার প্রতি আবদুল মালেকের যেরূপ অবজ্ঞা দেখা গেল, তাহাতে তাঁহার নিকট হইতে সঠিক খবর পাওয়া যাইবে, এরূপ বোধ হইল না। পরে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলেই জানা যাইবে মনে করিয়া আবদুল্লাহ্ চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে আবদুল্লাহ্ কহিল, "আমি তাকে বাড়ীর ঠিকানায় একখানা পত্র লিখেছিলাম, তার কোন জবাব পেলাম না। বোধহয় সে চিঠি সে পায় নি।"

আবদুল মালেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে লিখেছিলে?"

"আব্বার ব্যারামের সময়।"

আবদুল মালেক যেন একটু বিচলিত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "তা—তা—তা' ধরগে' তোমার ঠিক বলতে পারিনে।"

আবদুল্লাহ্ আবার কিছুক্ষণ ভাবিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিল, "শ্বশুর সাহেব এখন ভাল আছেন ত'?"

আবদুল মালেক কহিলেন, "নাঃ, ভাল আর কোথায়! তিনি ব্যারামে প'ড়েছেন এই ধরগে' তোমার প্রায় মাসাবধি হ'ল—"

"ব্যারামটা কি? এখন আছেন কেমন?"

"এই জ্বর আর কি! এখন ধরগে' তোমার একটু ভালই আছেন।"

আবদুল্লাহ্ কহিল, "ও জ্বর ত' আপনাদের বাড়ীতে লেগেই আছে! দু'দিন ভাল থাকেন ত' পাঁচ দিন জ্বরে ভোগেন। কাউকে ত' বাদ পড়তে দেখিনে......"

"না, না, এবার আব্বা বড় শক্ত ব্যারামে প'ড়েছিলেন। জ্বরটা ধরগে' তোমার দশ-বার দিন ছিল। বড্ড কাহিল হ'য়ে গেছেন। একেবারে ধরগে' তোমার বাঁচবারই আশা ছিল না। চাচাজানের ফাতেহার সময় ধরগে' তোমার সেই হাঙ্গামেই আমরা কেউ যেতে পারিনি। ধরগে' তোমা—"

"তা ফাতেহার সময় যেন যেতে পারেন নি, কিন্তু আব্বার ব্যারামের সময় যখন আমি খবর পাঠাই, তখন আমার স্ত্রীকে পর্যন্ত পাঠালেন না, হালিমাকেও না। মরণকালে তিনি ওদের একবার দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আপনাদের মেহেরবানিতে তাঁর ভাগ্যে আর সেটা ঘট'ল না।"

আবদুল মালেক একটু উষ্ণ হইয়া উঠিয়া কহিল, "বাঃ, কেমন ক'রে পাঠাই? আবদুল কাদের তখন বাড়ীতে ছিল না, আব্বাও ছিলেন না, কার হুকুমে ধরগে' তোমার পাঠাই!"

আবদুল্লাহ্ একটু শ্লেষের সহিত কহিল, "হ্যাঁ বাপ মরে, এমন সময় তো হুকুম ছাড়া পাঠান যেতেই পারে না। তা হালিমা আপনাদের বউ, তাকে না হয় আট্‌কে রাখলেন কিন্তু আমার স্ত্রীকে কেন পাঠালেন না? তার বেলায় তো আর কারুর হুকুমের দরকার ছিল না।"

"কার সঙ্গে পাঠাব? বাড়ীতে আর কেউ ছিল না, আমি তো আর ধরগে' তোমার বাড়ী ফেলে যেতে পারি নে!"

"কেন, আবদুল খালেকের সঙ্গে পাঠালেই তো হ'ত।"

আবদুল মালেক যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। বলিল, "সে কি! তার সঙ্গে? সে হ'ল ধরগে' তোমার 'গায়ের মহরুম'......"

আবদুল্লাহ্ একটু আশ্চর্য হইয়া কহিল, "আবদুল খালেক 'গায়ের মহরুম' হয়ে গেল!"

"বাঃ, হবে না? সে হল ধরগে' তোমার খালাত ভাই বই ত' নয়।"

"কেন, কেবল কি সে খালাত ভাই? চাচাত ভাইও ত' বটে—বাপের আপন মামাত ভাইয়ের ছেলে—আবার ধর'তে গেলে একই বংশ......"

"তা হ'লই বা, তবু শরীয়ত্ মত সে ধরগে তোমা......"

"এমন নিকট জ্ঞাতি যে, তার বেলাতেও আপনার শরীয়তের পোকা বেছে 'মহরুম, গায়ের মহরুমের' বিচার ক'রতে বসবেন বিশেষ করিয়া আমার এমন বিপদের সময়—এতটা আমার বুদ্ধিতে জুয়ায়নি।

"তা জুয়াবে কেন? 'তোমরা ধরগে' তোমার ইংরেজী প'ড়েছ, শরা-শরীয়ত্ তো মান না, সেই জন্যে ধরগে' তোমার......."

"অত শরীয়তের ধার ধারিনে ভাই সাহেব; একটুকু বুঝি যে, মানুষের সুখ-সুবিধারই জন্য শরা-শরীয়ত্ জারি হ'য়েছে; বে-ফায়দা কালে-অকালে কড়াকড়ি ক'রে মানুষকে দুঃখ দেবার জন্য হয় নি। যাক্-গে যাক্, আপনার সঙ্গে আর সে সব কথা নিয়ে মিছে তর্ক ক'রে কোন ফল নেই। আযানও পড়ে গেল, চলুন নামায পড়া যাক্।"

বহির্বাটীর এক কোণে ইহাদের বৃহৎ নূতন পারিবারিক মস্‌জিদ নির্মিত হইতেছিল। উহার গুম্বজগুলির কাজ শেষ হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু মেঝে, বারান্দা, কপাট, এসকল বাকী থাকিলেও কিছুদিন হইতে উহাতে রীতিমত নামায আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। আবদুল কুদ্দুস সাহেবের বাঁদীপুত্র খোদা নেওয়াজ এই নূতন মস্‌জিদের খাদেম। সেই আযান দিতেছিল। আযান শুনিয়া আবদুল মালেক আবদুল্লাকে লইয়া তাড়াতাড়ি মস্‌জিদের দিকে চলিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ছোট ছোট কয়েকটী বৈমাত্রেয় ভাই, দুই এক জন গোমস্তা এবং চাকরদের মধ্যে কেহ কেহ মস্‌জিদে গিয়া উঠিল। প্রতিবেশীরাও অনেকে মগরেবের সময় এইখানে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল; সুতরাং জমাত মন্দ হইল না। আবদুল মালেক ভিড় ঠেলিয়া পেশ-নামাযের উপর গিয়া খাড়া হইলেন এবং কৃচ্ছ সাধ্য কেরাত ও বহুবিধ শিরশ্চালনার সহিত 'সূরা ফাতেহা'র আবৃত্তি আরম্ভ করিলেন।

নামায শেষে আবদুল্লাহ্ বাহিরে আসিয়া মস্‌জিদটি দেখিতে লাগিল। একটু পরেই আবদুল মালেক বাহিরে আসিলে কহিল, "এখনও ত' মস্‌জিদের ঢের কাজ বাকী আছে, দেখ্‌ছি।"

আবদুল মালেক কহিল' "হ্যাঁ, এখনও ধরগে' তোমার অর্ধেক কাজই বাকী!"

উভয়ে বৈঠকখানার দিকে অগ্রসর হইল। আবদুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিল, "কত খরচ প'ড়লো?"

"ওঃ, সে ঢের! ধরগে' তোমার প্রায় হাজার আষ্টেক খরচ হ'য়ে গেছে।"

মস্‌জিদটি নির্মাণ করিতে সৈয়দ সাহেবকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে। হাতে নগদ টাকা কিছুই ছিল না; সুতরাং কয়েকটি তালুক বিক্রয় করা ভিন্ন তিনি টাকা সংগ্রহের কোন উপায় খুঁজিয়া পান নাই। আবদুল মালেক কিন্তু এই বিক্রয় ব্যাপারে মনে মনে পিতার উপর চটিয়া গিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, পিতা নিজের আখেরাতের জন্য পুত্রদিগকে তাহাদের হক্ হইতে

বঞ্চিত করিতেছেন। তাই মস্‌জিদের খরচের কথায় সে তাহার মনের বিরক্তিটুকু চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সে বলিয়া ফেলিল, "খান ক'য়েক তালুকও ধরগে' তোমার এই বাবদে উ'ড়ে গেছে।"

"কি রকম?"

"বিক্রী হ'য়ে গেছে।"

"শেষটা তালুক বেচ্‌তে হল! কেন, বন্ধক রেখে টাকা ধার নিলেও ত' হ'ত।"

"না; তাতে ধরগে' তোমার সুদ লাগে যে!"

কিন্তু তালুক বিক্রয় করিয়া মস্‌জিদ নির্মাণের কথায় আবদুল্লাহ্ বড়ই আশ্চর্য বোধ করিল। সে কহিল, "নিকটেই যখন আবদুল খালেকদের একটা মস্‌জিদ র'য়েছে তখন এত টাকা নষ্ট করে আর মস্‌জিদ দেওয়ার কি দরকার ছিল, তা তো আমি বুঝি নে!"

আবদুল মালেক ছোট খাট একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "যার আখেরাতের কাজ সেই করে রে ভাই; ও মস্‌জিদ যিনি দিয়ে গেছেন, তাঁর কাজ তিনিই ক'রে গেছেন; তাতে ক'রে ধরগে' তোমার আর কারুর আকবতের কাজ হবে না।"

আবদুল্লাহ্ কহিল, "এক মস্‌জিদের আযান যত দূর যায়, তার মধ্যে আর একটা মস্‌জিদ দেওয়া নিতান্তই ফজুল। এতে আকবতের কোন কাজ হ'ল বলে ত' আমার বিশ্বাস হয় না। তার ওপর এমন ক'রে তালুক বেচে মস্‌জিদ দেওয়া, এ যে খামাখা টাকা নষ্ট করা!"

"নষ্ট ঠিক না; আব্বার কাজ আব্বা ক'রে গেলেন, কিন্তু আমাদের ধরগে' তোমার এক রকম ভাসিয়ে দিলেন। তালুক এটা কিনেছে কে, জান।"

"না, কে কিনেছে?"

"আবদুল খালেকের বেনামীতে মামুজান কিনেছেন।"

"কোন্ মামুজান?"

"রসুলপুরের মামুজান—তিনি ছাড়া ধরগে' তোমার আবদুল খালেকের বেনামীতে আবার কে কিনবে?"

আবদুল্লার খেয়াল হইল, রসুলপুরের মামুজান আবদুল খালেকদেরই আপন মাতুল, আবদুল মালেকদিগের বৈমাত্রেয় মাতুল। কিন্তু সে বুঝিতে পারিল না, তিনি নিজের নামে না কিনিয়া ভাগিনেয়ের নামে বেনামী কেন করিলেন। সুতরাং ঐ কথা আবদুল মালেককে জিজ্ঞাসা করিল।

আবদুল মালেক কহিল, "কি জানি। হয়ত ধরগে' তোমার কোন মতলব-টতলব আছে।"

"তা হবে" বলিয়া আবদুল্লাহ্ চুপ করিয়া রহিল। এমন সময় অন্দর হইতে তাহার তলব হইল।

৫

অন্দরে প্রবেশ করিয়া আবদুল্লাহ্ তাহার শাশুড়ীর এবং অপরাপর মুরুব্বিগণের নিকট সালাম-আদাব বলিয়া পাঠাইল। তাহার পর হালিমার কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইতেই হালিমা তাহার শিশু পুত্রটি ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া ভ্রাতার 'কদমবুসি' করিল। পিতার মৃত্যু সংবাদ পাওয়া অবধি সে অনেক কাঁদিয়াছে। তাহার স্বামী বিদেশে; এ বাটীতে তাহাকে প্রবোধ দিবার আর কেহ নাই, সুতরাং সে নির্জনে বসিয়া নীরবে কাঁদিয়াই মনের ভার কিঞ্চিৎ লঘু করিয়া লইয়াছে। কিন্তু আজ ভ্রাতার আগমনে তাহার রুদ্ধ শোক আবার উথলিয়া উঠিল; সে আবদুল্লার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

উচ্ছ্বসিত শোকাবেগে আবদুল্লাহরও হৃদয় তখন মথিত হইতেছিল; তাই অন্যমনস্ক হইবার জন্য সে হালিমার ক্রোড় হইতে শিশুটিকে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিল এবং ধীরে ধীরে

দোল দিতে দিতে কহিল, 'আর মিছে-কেঁদে কি হবে বোন্। যা হবার হয়ে গেছে, সবই খোদার মর্জ্জি।"

এদিকে হালিমার পুত্রটি অপরিচিত ব্যক্তির অযাচিত আদরে বিরক্ত হইয়া খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল দেখিয়া হালিমা তাহাকে ভ্রাতার ক্রোড় হইতে ফিরাইয়া লইল এবং অশ্রুনিরুদ্ধ কণ্ঠে কহিতে লাগিল, "মরণকালে আব্বা আমাকে দেখতে চে'য়েছিলেন, কিন্তু এমন কেসমত্ নিয়ে এসেছিলাম, যে সে সময়ে তাঁর একটু খেদমত কত্তেও পেলাম না,—এ কষ্ট কি আর জীবনে ভুলতে পারব, ভাইজান।"

আবদুল্লাহ্ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "তা আর কি ক'রবে বোন্। তখন তোমার স্বামী, শ্বশুর, কেউ বাড়ী ছিলেন......"

"হ্যাঁ! গরীবের বেলাতেই যত হুকুমের দরকার। কেন?—সেবার আমার বড় জা'র মার ব্যারামের সময় ত' কেউই বাড়ী ছিলেন না, আর উনি ত' তখন কল্‌কেতায় পড়েন। বুবুর এক ভাই হঠাৎ এক দিন এসে তাকে নিয়ে চ'লে গেলেন, আমার শাশুড়ী-টাশুড়ী কেউ ত' টুশব্দটি কল্লেন না! তাঁরা বড় লোক কি না, তাই আর কারও হুকুম নেবার দরকার হ'ল না—"

"হয়ত' তাঁরা আগে থেকে হুকুম নিয়ে রেখেছিলেন......"

"না—তা হবে কেন? ওঁরা যেদিন চ'লে গেলেন, তার এক দিন বাদেই ত' আমার শ্বশুর বাড়ী এলেন। বাড়ী এসে তবে সব কথা শুনে চুপ ক'রে থাক্‌লেন!"

আবদুল্লাহ্ দুঃখিত চিত্তে কহিতে লাগিল, "তা আর কি হবে বোন। বড় লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা কল্লে এ রকম অবিচার সইতেই হয়। দেখ তোমার বেলা না হয় দুলামিঞার হুকুমের দরকার ছিল, কিন্তু আমিও তোমার ভাবীকে পাঠাতে লিখেছিলাম; তাও তো পাঠালেন না! আবদুল খালেকের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে পাঠাতে পাত্তেন, কিন্তু ভাই সাহেব বল্লেন, সে 'গায়ের মহ্‌রুম' কাজেই তার সঙ্গে পাঠান যায় না..."

হালিমা বাধা দিয়া কহিল, "কিসের 'গায়ের মহ্‌রুম'? ও সব আমার জানা আছে। কেবল না পাঠাবার একটা বাহানা। কেন? মজিলপুরের ফজলু মিঞাকে তো এঁরা সকলেই দেখা দেন, তিনিও তো খালাত ভাই!"

আবদুল্লাহ্ কহিল, "ফজলু হ'ল গিয়ে মায়ের আপন বোনের ছেলে, আর আবদুল খালেক সতাল বোনের ছেলে......"

"তা হ'লই বা সতাল বোনের ছেলে; ইনি যদি 'গায়ের মহ্‌রুম' হন তবে উনিও হবেন। ও-সব কোন কথা নয়, ভাইজান; আসল কথা, ফজলু মিঞারা বড় লোক, আর এ বেচারা গরীব।"

আবদুল্লাহ্ গম্ভীর-বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, "তা সত্য! গরীবকে এরা বড়ই হেকারত করেন—তা সে এগানাই হোক্, আর বেগানাই হোক্।"

হালিমা একটু ভাবিয়া আবার কহিল, "আচ্ছা, ওর সঙ্গে যেন না পাঠালেন; কিন্তু বড়-মিঞা ত' নিজেও নিয়ে যেতে পারতেন......"

"তিনি বাড়ী ফেলে যেতে পারলেন না যে!"

"ওঃ। ভারী ত' তিনি বাড়ী আগ্‌লে বসে র'য়েছেন কিনা। তিনি ত' আজ-কাল বাইরেই থাকেন, অন্দরের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই।"

"কেন, কেন! কি হ'য়েছে!"

কথাবার্তা নিম্নস্বরেই চলিতেছিল; কিন্তু এক্ষণে হালিমা আরও গলা নামাইয়া কহিল, "হবে আর কি? ওই গোলাপী ছুঁড়িটাকে উনি নিকে ক'রেছেন কি না, তাই।"

এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করিবার জন্য আবদুল্লাহ্ কহিল, "থাক্ গে যাক্। ও-সব কথায় আর কাজ নেই। তোমার ভাবী কোথায়?"

"তিনি আম্মার ঘরে নামায প'ড়ছেন।"

তখন এ'শার ওয়াক্ত ভাল করিয়া হয় নাই; সুতরাং আবদুল্লাহ্ ভাবিল, বুঝি এখনও মগরেবের জের চলিতেছে। তাই জিজ্ঞাসা করিল, "এত লম্বা নামায যে?"

হালিমা কহিল, "ওঃ! তা বুঝি আপনি জানেন না। এবার আমার শ্বশুরের ব্যারামের সময় পীর সাহেব এসেছিলেন কি না, তাই তখন ভাবী তাঁর কাছে মুরীদ হ'য়েছেন। সেই ইস্তক আমার শ্বশুরের মতো সেই মগরেবের সময় জায়-নামাযে বসেন, আর এ'শার নামায শেষ ক'রে তবে ওঠেন।"

আবদুল্লাহ্ সকৌতুকে তাহার স্ত্রীর আচার-নিষ্ঠার বিবরণ শুনিতেছিল। শুনিয়া সে কহিল, "বটে নাকি? তা হ'লে তোমার ভাবী ত' দেখ্ছি এই বয়েসেই বেহেশ্তের সিঁড়ি গাঁথতে লেগে গেছেন......"

হালিমা কহিল, "না না, ঠাট্টা নয়! ভাবী আমার বড়ই দীন্দার মানুষ। তারপর আবার পীর সাহেবের কাছে সেদিন মুরীদ হ'য়েছেন..."

"তা তুমিও সেই সঙ্গে মুরীদ হ'লে না কেন?"

হালিমা হঠাৎ বিষাদ-গম্ভীর হইয়া ধীরে ধীরে কহিল, "আমি যে আব্বার কাছেই আর বছর মুরীদ হ'য়েছিলাম, ভাইজান!"

এই কথায় উভয়ের মনে পিতার স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। উভয়ে কিয়ৎকাল নীরব হইয়া রহিল।

আবদুল্লাহ্ হাত বাড়াইয়া কহিল, "খোকাকে দেও তো আর একবার আমার কাছে......"

ইতিমধ্যে খোকা মাতার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হালিমা তাহাকে দুই বাহুর উপর নামাইয়া ধরিয়া কহিল, "এখন থাক্, আবার জেগে উঠে চেঁচাবে। শুইয়ে দিই।"

আবদুল্লাহ্ কিহল, "আচ্ছা হালিমা, ও-বেচারার বুকের ওপর একটা আধমণি পাথর চাপিয়ে রেখেছ কেন?"

হালিমা পুত্রকে শোয়াইতে শোয়াইতে জিজ্ঞাসা করিল, "আধমণি পাথর আবার কোথায়?"

"ঐ যে মস্ত বড় একটা তাবিজ।"

"ওঃ! ও একখানা হেমায়েল শরিফ তাবিজ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে।" আবদুল্লাহ্ চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিল, "এ্যাঁ। একেবারে আস্ত কোরআন!"

হালিমা কহিল, "কি ক'রব ভাইজান, সকলে মিলে ওর দুহাতে, গলায় এক রাশ তাবিজ বেঁধে দিয়েছিলেন। তার কতক রূপোর, কতক সোনার—সে গুলোর জন্যে কোন কথা ছিল না। কিন্তু কাপড়ের মোড়ক ক'রে যেগুলো দেওয়া হ'য়েছিল, সেগুলোতে তেল-ময়লা জড়িয়ে এমন বিশ্রী গন্ধ হ'য়ে উঠেছিল যে, উনি একদিন রাগ ক'রে সব খুলে ফেলে দিয়েছিলেন। আম্মা, বুবু, এঁরা সব ভারী রাগারাগি করতে লাগলেন। তাইতে উনি বল্লেন যে, "একখানা কোরআন-মজিদই তাবিজ ক'রে দিচ্ছি,—তার চাইতে বড় তো আর কিছু নেই!" তাই একটা আক্সী-কোরআন দেওয়া হ'য়েছে।

এমন সময় একটা বাঁদী নাশ্তার খাঞ্চা লইয়া আসিল এবং শাশুড়ী প্রভৃতি মুরুব্বিগণের দো'আ আবদুল্লাকে জানাইল। আবদুল্লাহ্ কহিল, "এখন নাশ্তা কেন?"

হালিমা কহিল, "এখন না তো কখন আবার নাশ্তা হবে?"

"একেবারে ভাত খেলেই হ'ত।"

"ওঃ, এ বাড়ীর ভাতের কথা ভু'লে গেছেন ভাইজান? রাত দুপুরের তো এদিকে না, ওদিকে বরং যতটা যেতে পারে।"

"তা বটে! তবে নাশ্তা একটু ক'রেই নেওয়া যাক্।" এই বলিয়া আবদুল্লাহ্ দস্তরখানে গিয়া বসিল। একটা বাঁদী সেলামচী লইয়া হাত ধোয়াইতে আসিল। তাহার পরিধানে একখানি মোটা ছেঁড়া কাপড়, তাহাতে এত ময়লা জমিয়া আছে যে, বোধহয় কাপড়খানি ক্রয় করা অবধি কখনো ক্ষারের মুখ দেখে নাই! উহার দেহটিও এমন অপরিষ্কার যে, তাহার মূল বর্ণ কি ছিল, কাহার সাধ্য তাহা ঠাহর করে।

আবদুল্লাহ্ অত্যন্ত বিরক্তির সহিত কহিল, "আচ্ছা হালিমা, তোমরা এই ছুঁড়িগুলোকে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ্‌তে পার না? এদের দেখ্‌লে যে বমি আসে। আর এই ময়লা গা-হাত দিয়ে ওরা খাবার জিনিসপত্র নাড়ে চাড়ে, ছেলে-পিলে কোলে করে, তাদের খাওয়ায়-দাওয়ায়, এতে শরীর ভাল থাক্‌বে কেন?

ঘরে জন দুই বাঁদী ছিল; আবদুল্লার এই কথায় উহারা ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে হাসিতে মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া গেল—যেন দুলামিঞা তাহাদের লইয়া ভারী একটা রসিকতা করিতেছেন।

হালিমা কহিল, "কি ক'রব ভাইজান, এ বাড়ীর ঐ রকমই কাণ্ড কারখানা। প্রথম প্রথম আমারও বড্ড ঘেন্না ক'রত, কিন্তু কি ক'রব এখন স'য়ে গেছে! অনেক চেষ্টা করিছি, কিন্তু হারামজাদীগুলোর সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠিনি। চিরকেলে অভ্যেস; তাই পরিষ্কার থাকাটা ওদের ধা'তেই সয় না।"

একখানি পরোটার এক প্রান্ত ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে আবদুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিল, "কাপড় ওদের কখানা ক'রে আছে?"

"ও, তা বড় বেশী না; কারুর ঐ একখানা, কারুর বা দেড়খানা—"

"দেড়খানা কেমন?"

"একখানা গামছা কারুর কারুর আছে, কালেভদ্দেরে সেই খানা প'রে তালাবে গিয়ে একটা ডুব দিয়ে আসে।"

চামচে করিয়া এক টুকরা গোশ্‌ত ও একটুখানি লোয়াব তুলিয়া লইয়া আবদুল্লাহ্ কহিল, "তা বেচারাদের খানকয়েক ক'রে কাপড় না দিলে কেমন ক'রেই বা পরিষ্কার রাখে, এতে ওদেরই বা এমন দোষ কি!"

"আর খানকয়েক ক'রে কাপড়! আপনিও যেমন বলেন! ও শূয়োরের পালগুলোকে অত কাপড় দিতে গেলে এরা যে ফতুর হয়ে যাবেন দুদিনে!"

"তবু এতগুলো বাঁদী রাখ্‌তেই হবে।"

হালিমা কহিল, "তা না হ'লে আর বড়-মানুষী হ'ল কিসে ভাইজান—ও কি? হাত তু'লে বস'লেন যে? কই কিছুই তো খেলেন না!..."

"নাশ্‌তা আর কত খাব?"

"না, না সে হবে না; নিদেন এই কয়খানা মোরব্বা আর এই হালুয়াটুকু খান।" এই বলিয়া হালিমা মিষ্টান্নের তশত্‌রীগুলি ভ্রাতার সম্মুখে বাড়াইয়া দিল। অগত্যা আরও কিছু খাইতে হইল।

নাশ্‌তা শেষ করিয়া হাত ধুইতে ধুইতে আবদুল্লাহ্, জিজ্ঞাসা করিল, "আবদুল কাদেরের কোন চিঠি-পত্র পেয়েছ এর মধ্যে?"

হালিমা মাথা নীচু করিয়া আঙ্গুলে শাড়ীর আঁচল জড়াইতে জড়াইতে কহিল, "আমার কাছে চিঠি লেখা তো উনি অনেক দিন থেকে বন্ধ করেছেন।"

আবদুল্লাহ্ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

হালিমা কহিল, "এ বাড়ীর কেউ ওসব পছন্দ করেন না। বলেন,—জানানাদের পক্ষে লেখা-টেখা হারাম। তাতেও বাধ্‌ত না—উনি ওসব কথা গ্রাহ্য করতেন না; কিন্তু চিঠি হাতে পেলেই বড় মিঞা সব খুলে খুলে পড়েন, তাই উনি চিঠি-পত্র লেখা ছেড়ে দিয়েছেন।"

এ বাটীর মহিলাগণ চিঠি-পত্রের ধার বড় একটা ধারতেন না। পড়াশুনার মধ্যে কোরান্ শরীফ, তাহার উপর বড় জোর উর্দু মেফতাহুল জান্নাত পর্যন্ত; ইহার অধিক বিদ্যা তাঁহাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ ফল। লেখা—তা সে উর্দুই হোক্ আর বাঙ্গলাই হোক্, আর বাঙ্গালা পড়া, এসকল তো একেবারেই হারাম। হালিমা যদিও পিত্রালয়ে থাকিতে এই হারামগুলি কিঞ্চিৎ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল এবং বিবাহের পর স্বামীর উৎসাহে প্রথম প্রথম উহাদের চর্চাও কিছু কিছু রাখিয়াছিল; কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই শ্বশুরালয়ের সুশাসনে তাহার এই কু-অভ্যাসগুলি দূরীভূত

হইয়া গিয়াছিল। আবদুল্লাহ্ হালিমাকে পত্র লিখিলে সে অপরাপর অন্দরবাসিনীদের ন্যায় বাটীর কোন বালককে দিয়া অথবা বাহিরের কোন গোমস্তার নিকট বাঁদীদের মারফৎ খবর দেওয়াইয়া জবানী-পত্র লিখাইয়া লইত। এইরূপ জবানী-পত্র পাইলে আবদুল্লাহ্ ভগ্নীকে লেখাপড়ার চর্চা ছাড়িয়া দিয়াছে বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়া পত্র লিখিত এবং সাক্ষাৎ হইলে হালিমা সময় পায় না ইত্যাদি বলিয়া কাটাইয়া দিত। এত দিন সে আসল কথাটা অনাবশ্যক বোধে ভ্রাতাকে বলে নাই, কিন্তু সম্প্রতি তাহার মন এ বাটীর সকলের উপর তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া সে কথায় কথায় অনেক কিছু বলিয়া ফেলিয়াছে। আবদুল্লাও আজ বুঝিতে পারিল, হালিমা কেন স্বহস্তে পত্রাদি লেখে না। মনে মনে তাহার রাগটা পড়িল গিয়া আবদুল মালেকের উপর। তিনি কেন পরের চিঠি খুলিয়া পড়েন, তাঁহার একটুও আক্কেল নাই? ছোট ভাই তাহার স্ত্রীর নিকট পত্র লিখিবে, তাহাও খুলিয়া পড়িবেন? কি আশ্চর্য।

এই কথাটি মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে আবদুল্লার সন্দেহ হইল, বোধহয় সে কলিকাতা হইতে আসিবার সময় পিতার রোগের সংবাদ দিয়া আবদুল কাদেরকে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহাও আবদুল মালেকের কবলে পড়িয়া মারা গিয়াছে। তাহার এই সন্দেহের কথা সে হালিমাকে খুলিয়া বলিল। হালিমা জিজ্ঞাসা করিল, "সেটা কি ইংরেজীতে লেখা ছিল?"

আবদুল্লাহ্ কহিল, "হ্যাঁ ইংরেজীতে। অনেক দিন আবদুল কাদের আমাকে পত্র লেখেনি; আমিও জানতাম না যে, সে চাকরীর সন্ধানে বরিহাটে গেছে। তাই বাড়ীর ঠিকানাতেই লিখেছিলাম।"

হালিমা একটু ভাবিয়া কহিল, "এক দিন বড় মিঞার ছেলে জানু ইংরেজী চিঠির মত কি একটা কাগজ নিয়ে খেলা করছিল। আমি মনে করলাম, এ ইংরেজী লেখা কাগজ ওনার ছাড়া আর কারুর হবে না ; কোন কাজের কাগজ হ'তে পারে ব'লে আমি সেটা জানুর হাত থেকে নিয়ে তুলে রেখেছিলাম।"

আবদুল্লাহ্ আগ্রহের সহিত কহিল, "কোথায় রেখেছিলে আনত দেখি।"

"তার খানিকটা নেই, জানু ছিঁড়ে ফেলেছিল। আনছি এখনি—" এই বলিয়া হালিমা সেই ছেঁড়া কাগজখানি বাক্স খুলিয়া বাহির করিল।

কাগজের টুকরাটি দেখিয়াই আবদুল্লাহ্ বলিয়া উঠিল, "বাঃ এত দেখ্ছি আমারই সেই চিঠি!"

হালিমা কহিল, "তবে নিশ্চয়ই বড় মিঞা ওটা খুলেছিলেন, তারপর ইংরেজী লেখা দেখে ফেলে দিয়েছিলেন।"

একটু আগেই যখন আবদুল্লাহ্ আবদুল মালেককে সেই চিঠির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তখন হঠাৎ তাহার চোখেমুখে একটু বিচলিত ভাব দেখা গিয়াছিল। সেটুকু আবদুল্লার দৃষ্টি না এড়াইলেও তাহার নিগূঢ় কারণটুকু বুঝিতে না পারিয়া তখন সে সেদিকে ততটা মন দেয় নাই। এক্ষণে উহার অর্থ বেশ পরিষ্কার হইয়া গেল, তাই সে বড়ই আফসোস করিয়া কহিতে লাগিল, "দেখ তো কি অন্যায়! চিঠিখানা না খুলে যদি উনি ঠিকানা দিতেন, তবে সে নিশ্চয়ই পেত। ইংরেজী চিঠি দেখেও সেটা খুলে যে তাঁর কি লাভ হ'ল, তা খোদাই জানেন। আবদুল কাদের আমার চিঠির জবাবও দিলে না, একবার এলও না; তাই ভেবে আমি তার ওপর চটেই গিয়েছিলাম। ফাতেহার সময় হ'য়ে গেছে! সে হয় তো এদ্দিন আব্বার ইন্তেকালের কথা শুনেছে; আর আমি তাকে একটা খবর দিলাম না মনে ক'রে সে হয় তো ভারী বেজার হ'য়ে আছে....."

হালিমা কহিল "না না, ভাইজান, বেজার হবেন কেন? এই চিঠির টুকরাই তো আপনার সাক্ষী! বল্লে তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন, কার জন্য এটা ঘটেছে। আপনি তাঁকে একখানা চিঠি লিখে দিন না।"

আবদুল্লাহ্ কহিল, "হ্যাঁ কালই লিখতে হবে।"

এমন সময় একজন বাঁদী পানের বাটা লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। হালিমা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "পান কে দিল রে, বেলা?"

"ছোট বুবুজী দিয়েছেন।"

"তাঁর নামায হ'য়ে গেছে?"

"হ্যাঁ, নামায প'ড়ে উঠেই পান তয়ের করলেন।"

হালিমা ভ্রাতাকে কহিল, "তবে এখন একবার ও-ঘরে যান। রাতও হ'য়েছে; দেখিগে ভাতের কদ্দুর হ'ল।"

দুয়ারের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া হালিমা জিজ্ঞাসা করিল, "এবার কদিন থাকবেন, ভাইজান?"

"কেন বল দেখি?"

"যাবার সময় আমাকে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু।"

"আমার তো তাই ইচ্ছে আছে; এখন দেখি কর্তারা কি বলেন। যদি তাঁরা দুলা মিঞার হুকুম চেয়ে বসেন, তবেই ত মুস্কিল হবে......"

"না, এবার না গিয়ে কিছুতেই ছাড়ব না, তা ব'লে রাখচি।"

"আচ্ছা আচ্ছা দেখি তো একবার ব'লে কয়ে।"

৬

স্ত্রীর ঘরে গিয়া আবদুল্লাহ্ দেখিল, সালেহা খাটের সম্মুখস্থ চৌকির উপর বসিয়া পান সাজিতেছে। ঘরে একটা বাঁদী ছিল; আবদুল্লাকে আসিতে দেখিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

সালেহা তাড়াতাড়ি চৌকি হইতে নামিয়া স্বামীর নিকটবর্তী হইল এবং কদমবুসি করিবার জন্য দেহ নত করিল। আবদুল্লাহ্ ইহার জন্য প্রস্তুতই ছিল, সে তৎক্ষণাৎ স্ত্রীর বাহুদ্বয় ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল এবং কহিল "আঃ, ছিঃ তোমার ও রোগটা এখনও গেল না দেখ্‌ছি!"

ইতিমধ্যে সালেহা আবদুল্লার বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার স্বামী এইরূপ অভ্যর্থনা চান বটে; কিন্তু সে কদমবুসির পরিবর্তে এরূপ বেহায়াপনার দ্বারা স্বামীর অভ্যর্থনা করা মোটেই পছন্দ করিত না। সে ভাবিত, তাহার স্বামী তাহাকে একটা বৃহৎ কর্তব্য-কর্মে বাধা দিয়া কাজ ভাল করেন না।

"ছাড়ুন ছাড়ুন, কেউ দেখতে পাবে" বলিয়া সালেহা স্বামীর সাগ্রহ বাহুবেষ্টন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। একটু পরে আবার কহিল, "আপনি বড় অন্যায় করেন।"

আবদুল্লাহ্ চৌকির উপর বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি অন্যায় করি?"

চৌকির অপর প্রান্তে উঠিয়া বসিতে বসিতে সালেহা কহিল, "এই—এই—সালাম ক'রতে দেন না আর কি! ওতে যে আমার গোনাহ্ হয়।"

"যদি গোনাহ্ হয়, তবে সে আমারই হবে, কেননা আমিই ক'রতে দিই নে।"

"আপনার হলে তো আমারও হ'ল—"

আবদুল্লাহ্ একটু বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "বাঃ, বেশ ফৎওয়া জারি ক'রতে শিখেছ যে দেখছি!"

পানের বাটাটি স্বামীর সম্মুখে বাড়াইয়া দিয়া সালেহা কহিল, "ফৎওয়া আবার কোথায় হ'ল?"

বাটা হইতে দুটি পান তুলিয়া মুখে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে আবদুল্লাহ্ কহিল, "কেন এই যে বল্লে এক জনের গোনাহ্ হলে দু-জনের হয়? এ তো নতুন ফৎওয়া—নতুন মুরীদ হ'য়ে বুঝি এ সব শিখেছ?"

সালেহা একটু বিরক্ত হইয়া কহিল, "যান্, ও-সব কথা নিয়ে তামাশা করা ভাল না—"

"না তামাশা কচ্ছিনে; কিন্তু আজকাল তোমার নামায আর ওযিফার যে রকম বান ডেকেছে, তাতে হয় তো আমি ভেসেই যাব। এই যে আমি এদ্দিন পরে এসে সন্ধ্যে থেকে বসে আছি....."

সালেহা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া কহিল, "খোদার কাজ ক'রতে আপনি মানা করেন।"

আবদুল্লাহ্ কৃত্রিম ভয়ের ভাব দেখাইয়া দাঁতে জিভ কাটিয়া কহিল, "তওবা তওবা, তা কেন ক'রব? তবে কিনা সংসারের কাজও তো মানুষের আছে......"

"কেন আমি নামায পড়ি ব'লে কি সংসারের কাজ আট্কে থাকে?

"নামায প'ড়লে আট্কায় না বটে, কিন্তু অত লম্বা ওযিফা জুড়ে' ব'সলে আটকায় বই কি! বিশেষ ক'রে আমাদের মত গরীবের ঘরে, যেখানে বাঁদী-গোলামের ভিড় নেই।"

কথাটা সালেহার ভাল লাগিল না। সে তাহার পিতার বড়ই অনুগত ছিল এবং শৈশব হইতে এ সকল ব্যাপারে তাঁহারই অনুকরণ করিয়া আসিতেছে। তাহার উপর আবার সম্প্রতি পীর সাহেবের নিকট মুরীদ হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে ধর্মের অনুষ্ঠানে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছে। তাহার বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে যে, এইরূপ কঠোর অনুষ্ঠানই পরকালে বেহেশ্ত লাভের উপায়, ইহাই সর্বপ্রধান কর্তব্য। সংসারের কাজগুলি সব নিতান্তই বাজে-কাজ, যে টুকু না করিলে চলে না, সেইটুকু করিলেই যথেষ্ট। সংসার সম্বন্ধে ইহার অধিক কোন কর্তব্য থাকিতে পারে না। তাই আজ তাহার স্বামী খোদার কাজ অপেক্ষা সংসারের কাজের গুরুত্ব অধিক বলিয়া মত প্রকাশ করিতেছেন মনে করিয়া সালেহা বিরক্ত, ক্ষুণ্ন এবং রুষ্ট হইয়া উঠিল। সে একটু উষ্ণতার সহিত বলিয়া ফেলিল, "হোক্ তবু খোদার কাজ আগে, পরে আর সব।"

আবদুল্লাহ্ দেখিল, এ আলোচনা ক্রমে অপ্রীতিকর হইয়া উঠিতেছে। তখন সে কথাটা চাপা দিবার জন্য কহিল, "সে কথা ঠিক্। তা যাক্ তুমি কেমন আছ, তাই বল।"

"আছি ভালই, আম্মার তবিয়ত ভাল ত'?"

"ভাল আর কোথায়। আব্বার ইন্তেকালের পর থেকে তাঁর শরীর ক্রমে ভেঙ্গে প'ড়েছে।"

সালেহা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তখন যেতে পারিনি ব'লে কি তিনি রাগ ক'রেছেন?"

আবদুল্লাহ্ কহিল, "না—তিনি তোমার উপর রাগ করবেন কেন।" তবে আব্বা মরবার সময় তোমাকে দেখ্তে পান্নি বলে বড় দুঃখ করে গেছেন।"

"তা কি করব, আমাকে পাঠাবার তখন কোন সুবিধে হয়ে উঠ্ল না।" পরে একটু ভাবিয়া সালেহা আবার কহিল "আপনিও তো এসে আমাকে নিয়ে যেতে পারতেন।"

"আমি আব্বাকে ফেলে আসি কি ক'রে? তাঁকে দেখবার-শুনবার আর লোক ছিল না।"

সালেহা চুপ করিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আবদুল্লাহ্ কহিল, "আমার বোধহয় আর পড়াশুনা হবে না।"

"তবে কি করবেন?"

"ভাব্ছি একটা চাকরীর চেষ্টা দেখব।"

"একজন তো চাকরী করবেন ব'লে আব্বার সঙ্গে চটাচটি ক'রে গেছেন... ।"

"সে চাকরী ক'রে নিজের উন্নতি ক'রতে চায়, তাতে বাধা দেবার তো আমার শ্বশুরের উচিত হয় নি......"

"আর বাপের অমতে, তাঁকে চটিয়ে, চাকরী ক'রতে যাওয়া বুঝি মেজ ভাইজানের বড় উচিত হয়েছে?"

"এমন ভাল কাজেও যদি বাপ চটেন, তা হ'লে লাচার হ'য়ে অবাধ্য হ'তেই হয়......"

"না, তাতে কি কখনও ভাল হয়! হাজার ভাল কাজ হ'লেও বাপ যদি নারাজ থাকেন, তাতে বরকত হয় না।"

স্ত্রীর সহিত তর্কে এইখানে আবদুল্লাকে পরাস্ত হইতে হইল। অগত্যা সে কহিল, "হাঁ, সে কথা ঠিক। আবদুল কাদেরের উচিত ছিল, বাপকে বুঝিয়ে ব'লে তাঁকে রাজী করে যাওয়া......"

"তাতে কিছু হ'ত না। আব্বা মেজ ভাইজানকে বলেছিলেন আবার মাদ্রাসায় পড়'তে। তিনি বলেন—যারা শরীফজাদা তাদের উচিত দীন ইস্‌লামের উপর পাকা হয়ে থাকা। ইংরেজী পড়া, কি চাকরী ক'রতে যাওয়া ও-সব দুনিয়াদারীর কাজে ইমান দোরস্ত থাকে না বলে তিনি মোটেই পছন্দ করেন না।"

"পছন্দ করেন না, তা তো বুঝলাম। কিন্তু যাঁরা এখন শরীফজাদা আছেন, পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে কোন রকমে না হয় শরাফতি ক'রে যাচ্ছেন। তার পর দুই এক পুরুষ বাদে সম্পত্তিটুকু তিল তিল ক'রে ভাগ হ'য়ে যাবে, তখন শরাফতি বজায় রাখবেন কি দিয়ে? তখন যে পেটের ভাতই জুটবে না......"

"কেন জুটবে না? খোদার উপর তওয়াক্কল রাখলে নিশ্চয়ই জুটবে।"

"ঘরে ব'সে ব'সে খালি খোদার উপর তওয়াক্কল রাখলে তো আর অমনি ভাত পেটের ভিতর ঢুকবে না। তার জন্য চেষ্টা ক'রতে হবে ও যাতে দু'পয়সা উপায় হয় তার জন্য খাটতে হবে। যে দিন কাল প'ড়েছে তাতে ইংরেজী না শিখ্‌লে আর সেটি হবার যো নেই......"

"কেন কত লোক যে ইংরেজী শেখেনি, খোদা কি তাদের ভাত কাপড় জুটিয়ে দিচ্ছেন না?"

তর্ক আবার অপ্রিয় হইয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া আবদুল্লাহ্ কহিল, "যাক্‌গে যাক্, ওসব কথা তোমরা বুঝবে না ও তর্কেও আর কাজ নেই......"

"না, আমরা বুঝিও না বুঝতে চাইও না; কেবল এইটুকু জানি যে, খোদার উপর তওয়াক্কল রাখলে আর তাঁর কাজ রীতিমত ক'রে গেলে, কারুর কোন ভাবনা থাকে না। আব্বা যে ব'লে থাকেন, ইংরেজী প'ড়লে খোদার উপর আর লোকের তেমন বিশ্বাস থাকে না, তা দেখছি ঠিক।......"

শেষটা তাহার নিজের উপরই প্রযুক্ত হইল বুঝিয়া আবদুল্লাহ্ একটু বিরক্তির স্বরে কহিল, "খোদার উপর অবিশ্বাস দেখলে কোনখানে? সংসারে উন্নতির চেষ্টা না ক'রে কেবল হাত-পা কোলে ক'রে ব'সে থাক্‌লেই যদি খোদার উপর বিশ্বাস আছে ব'লে, ধরতে চাও, তবে আমি স্বীকার করি, আমার তেমন বিশ্বাস নেই।"

স্বামীর মুখে এত বড় নাস্তিকতার কথা শুনিয়া সালেহা একেবারে শিহরিয়া উঠিল। সে দাঁতে জিভ কাটিয়া কহিল, "এঁ্যা, বলেন কি! তওবা করুন, তওবা করুন, অমন কথা মুখ দিয়ে বার ক'রবেন না! ওতে কত বড় গোনাহ্ হয়, তা কি আপনি জানেন না? ও-কথা যে শোনে সেও জাহান্নামে যায়।..."

এমন সময় মসজিদে এশার নামাযের আযান আরম্ভ হওয়ায় আবদুল্লাহ্ চুপ করিয়া রহিল। আযান শেষে মুনাজাত করিয়া কহিল, "জাহান্নামে যাবার ভয় থাকে তো তোমার আর ও-সব শুনে কাজ নেই।"

এই বলিয়া আবদুল্লাহ্ একটা বালিশ টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল।

সালেহা কহিল, "এখন শুলেন যে? নামায প'ড়তে যাবেন না?"

"না, আর মসজিদে যাব না, ঘরেই পড়ব এখন; একটু গড়াগড়ি দিয়ে নিই। বড্ড হয়রান হ'য়ে এসেছি।"

"তবে আমি যাই, নামাযটা প'ড়ে নিয়ে খানার যোগাড় করি গিয়ে—"

"তা হ'লে দেখছি খাওয়া-দাওয়ার এখনও ঢের দেরী আছে—ততক্ষণে আমি নামায প'ড়ে বেশ একটু ঘুম দিয়ে নিতে পার'ব। তুমি এক বদনা ওজুর পানি পাঠিয়ে দিও—"

এই বলিয়া আবদুল্লাহ্ চৌকির উপর পড়িয়া একটা বিকট হাই তুলিয়া সাড়ম্বরে আলস্য ত্যাগ করিল।

সালেহা একটা বাঁদীকে ডাকিয়া পানি দিতে বলিয়া চলিয়া গেল।

হালিমা ও সালেহার চেষ্টায় সে দিন একটু সকাল সকাল খানার বন্দোবস্ত হইল। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর পার হইয়া গিয়াছে।

একটা বাঁদী আসিয়া আবদুল্লাহকে ডাকিয়া তাহার শ্বশুরের ঘরে লইয়া গেল। দস্তরখান সেই খানেই বিছান হইয়াছিল। আবদুল্লাহ্ ঘরে প্রবেশ করিতেই শ্বশুর কহিলেন, "এস বাবা, এস, ভাল আছো তো?"

আবদুল্লাহ্ শ্বশুরের কদমবুসি করিয়া কহিল, "জি হাঁ, ভালই আছি। হুজুরের তবীয়ত কেমন?"

শ্বশুর একটু কাতর স্বরে কহিলেন, "আর বাবা তবীয়ত! এবার নিতান্তই খোদার মর্জিতে আর হুজুরের* দোয়াতে বেঁচে উঠেছি, নইলে বাঁচবার আশা ছিল না! এখনো চলতে পারিনে, হাত-পা কাঁপে।"

আবদুল্লাহ্ কহিল, "তা, এই দুর্বল শরীর রাত্রে একটু সকাল সকাল খেয়ে নিলে বোধ করি ভাল হয়......"

"আর বাবা, ওটা অভ্যেস হ'য়ে গেছে—তা ছাড়া নামাযটা না প'ড়ে কেমন করে খাই। খেলে যে আর না শুয়ে পারিনে......"

এমন সময়ে বাঁদীরা বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলিকে নিদ্রা হইতে উঠাইয়া টানিতে টানিতে আনিয়া দস্তরখানে একে একে বসাইয়া দিয়া গেল। বেচারারা বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিল। কর্তার বাঁদীপুত্র খোদা নেওয়াজ দস্তরখানের উপর বাসন-পেয়ালা প্রভৃতি সাজাইতে সাজাইতে একটা বাঁদীকে ডাকিয়া কহিল, "ওরে ফুল, বড়মিঞা সাহেবকে ডেকে নিয়ে আয়!"

আবদুল কুদ্দুস প্রথম বয়সে একটি বাঁদীকে নেকাহ্ করিয়াছিলেন, তাহারই গর্ভে খোদা নেওয়াজের জন্ম হয়। খোদা নেওয়াজই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র; কিন্তু সে বাঁদীগর্ভজাত বলিয়া বিবি-গর্ভজাত কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে 'বড় মিঞা সাহেব', 'মেজ মিঞা সাহেব' ইত্যাদি বলিয়া ডাকিতে হয়। সংসারে যে তাহাকে ঠিক চাকরের মত থাকিতে হয়, এরূপ বলা যায় না; কেবল মসজিদে এবং দস্তরখানে খাদেমী এবং অন্দরের ও সদরের ফুট-ফরমাইশ খাটা ভিন্ন তাহার আর বড় একটা কাজ ছিল না। অবশ্য তাহার আহারাদি যে চাকর মহলেই হইত, বলাই বাহুল্য।

বড় মিঞা সাহেব তাঁহার বহির্বাটীস্থ মহল হইতে অন্দরে আনীত হইলে খানা আরম্ভ হইল। কর্তা আবদুল্লাকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, "তোমার ওয়ালেদ মরহুমের সঙ্গে আমার একবার শেষ দেখাটা হ'ল না, সে জন্য আমার জানে বড় 'সদমা' লেগেছে। বড় ভাল লোক ছিলেন তিনি, এমন দীনদার পরহেজগার লোক আজ-কালকার জমানায় বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। কি করব, বাবা, সবই কেসমত! তা তোমার আম্মা ভাল আছেন তো?"

"জি না, তেমন ভাল আর কোথায়! আব্বার ইন্তেকালের পর থেকে তাঁরও তবীয়ত খারাব হ'য়ে পড়েছে।"

"তা তো পড়বেই বাবা, তাঁর ধড়ে কি আর জান আছে! এর চেয়ে সদমা আর দুনিয়াতে নেই। ওঁয়ার শরীরটার দিকে একটু নজর রেখ বাবা, আর এ সময় তুমি কাছে কাছেই থেক, ওঁয়াকে, একলা ফেলে কোথাও গিয়ে বেশী দিন থেক না, এ সময়ে তুমি কাছে থাকলে ওঁর মনটা একটু ভাল থাকবে।..."

এইরূপ বহুবিধ উপদেশের মধ্যে খানা শেষ হইল। আবদুল্লাহ্ একবার মনে করিয়াছিল, তাহার পড়াশুনার কথাটা এই সময়ে পাড়িয়া দেখিবে, কিন্তু আবার ভাবিল, না এখন ওসব কথা পাড়িয়া কাজ নাই। কাল দিনের বেলা সুবিধামত নিরিবিলি পাইলে তখন বলা যাইবে। বিশেষতঃ এতগুলি লোকের সামনে তাহার মুখ ফুটিল না; তাহার আত্মসম্মান অন্তরের মধ্য হইতে তাহাকে বাধা দিতে লাগিল।

---

* অর্থাৎ পীর সাহেবের।

পলাশডাঙ্গার মদন গাজীর বাড়িতে আজ মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। তাহার ভয়ানক বিপদ উপস্থিত। মহাজন দিগম্বর ঘোষ পেয়াদা এবং বহু লোকজন লইয়া আজ তাহার বসতবাড়ীতে বাঁশগাড়ী করিতে আসিয়াছেন। পাড়ার লোক জনে তাহার বাহিরবাড়ী পরিপূর্ণ, সকলেই বেচারার ঘোর বিপদে সহানুভূতি ও দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু এ বিপদ হইতে মদন গাজী কিসে উদ্ধার পাইতে পারে তাহা কেহই স্থির করিতে পারিতেছে না।

মদনের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। তাহার খামার জমিগুলির মত উর্বরা জমি এ অঞ্চলে আর কাহারও ছিল না। গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গরু-ছাগল এবং উঠান-ভরা মোরগ-মুর্গী লইয়া সে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিত। তাহার জমিতে পাট ও প্রচুর জন্মিত এবং তাহা হইতে রাশি রাশি কাঁচা টাকা পাইয়া সে কৃষক-মহলে খাতিরও যথেষ্ট জমাইয়া লইয়াছিল। তাহার একমাত্র পুত্র সাদেক আলীর বিবাহে জ্ঞাতি-কুটুম্ব একত্র হইয়া ধরিয়া বসিল, খুব ধুমধাম করা চাই, দু'চার খানা গ্রামের লোক খাওয়াইতে হইবে, বাজি-বাজনা, জারি-কবি, এসবের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, নহিলে শুধু মদন গাজীর কেন, পলাশডাঙ্গার শেখেদের কাহারও মান থাকিবেনা! শেখেরা তো আর এখন আগেকার মত মিঞা সাহেবদের গোলামী করে না। মদন গাজীর মত মাথা-তোলা লোকও মিঞা সাহেবদের মধ্যেই বা কটা আছে? এবার দেখানো চাই, শেখেরাও মিঞাদের মত ধুমধাম করিতে জানে, ইত্যাদি।

প্রথমটা মদনের এসবে বড় মত ছিল না; কিন্তু পাঁচ-জনের উৎসাহে সেও নাচিয়া উঠিল। পুত্রের বিবাহে বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া ফেলিল। সুতরাং বেশ রকমের একটা দেনাও তাহাকে ঘাড় পাতিয়া লইতে হইল। আর মদনের মত সম্পন্ন গৃহস্থকে কেই বা না বিনা বাক্যব্যয়ে টাকা ধার দিবে! রসুলপুরের দিগম্বর ঘোষ যদিও ভারী কড়া মহাজন,—তাঁহার সুদের হারও যেমন উচু; আদায়ের বেলাও তেমনি কড়া-ক্রান্তি পর্যন্ত কোন দিন রেয়াত করে না। তবু এ-ক্ষেত্রে তিনি পরম আগ্রহের সহিত খামারগুলি রেহান রাখিয়া কম সুদেই মদনকে টাকা ধার দিয়া তাহাকে মস্ত খাতির করিয়া ফেলিয়াছেন। তাই পাঁচ-জনে বলিল, "ও দেনার জন্য কিচ্ছু ভয় নেই মদন! খোদা তোমাকে যেমন দিতে আছেন, তাতে ওই কটা টাকা পরিশোধ কত্তি আর কদ্দিন?" মদন আশায় বুক বাঁধিল; পিতাপুত্র দ্বিগুণ উৎসাহে আবার ক্ষেতের কাজে লাগিয়া গেল।

মদনের খামার জমিগুলির উপর অনেকেরই লোভ ছিল; কিন্তু এ যাবৎকাল কেহই তাহাতে হাত দিবার সুযোগ পায় নাই। এবারে যখন সে হতভাগ্য ঘোষ মহাশয়ের কবলে পতিত হইল, তখন তিনি মনে মনে বেশ একটুখানি প্রীতি অনুভব করিলেন, তাহার পর দুই-তিন বৎসর ধরিয়া যখন ক্রমাগত অজন্মা হইতে লাগিল এবং মদনের দেয় সুদ কিস্তির পর কিস্তি বাকী পড়িয়া চক্রবৃদ্ধিহারে ক্রমাগত বাড়িয়া চলিল, তখন ঘোষ মহাশয় ভাবিলেন,—আর যায় কোথায়!

ফলে ঘটিল তাহাই। টাকা আর পরিশোধ হইল না। তিন বৎসরের অজন্মার পর চতুর্থ বৎসরে যখন সুপ্রচুর ফসল জন্মিবার সম্ভাবনা দেখা গেল, তখন মদনের আশা হইল যে, খোদায় করিলে এবার মহাজনের টাকা পরিশোধ করিতে পারিবে। কিন্তু ওদিকে ঘোষ মহাশয়ের সজাগ দৃষ্টি ফসলের প্রাচুর্যের দিকে পতিত হইয়া তাঁহাকে একটু ব্যস্ত করিয়া তুলিল—পাছে মদন ঋণ পরিশোধ করিবার সুযোগ পাইয়া বসে, এই ভয়ে তিনি তামাদির ওজুহাতে তাড়াতাড়ি নালিশ করিয়া দিলেন। মদন প্রচুর ফসলের সম্ভাবনার কথা বলিয়া প্রার্থনা করিল, কিন্তু সে সময়ে তাহার হাতে নগদ টাকা ছিল না, সহসা কাহারও নিকট ধারও পাওয়া গেল না। কাজেই তদ্বিরের অভাবে বিশেষতঃ ও-পক্ষের মুক্তহস্ত তদ্বিরের মুখে সে তাহার ক্ষীণ প্রার্থনা গ্রাহ্য করাইতে পারিল না। মদনের খামার জমিগুলি নীলাম হইয়া গেল এবং ঘোষ মহাশয় সেগুলি খরিদ করিয়া ফেলিলেন। আর একটু বিশেষ রকম তদ্বিরের ফলে সমস্ত খামার জমিগুলি নীলাম হইয়াও কতক টাকা বাকী রহিয়া গেল। মদন সেই টাকার দরুন আবার বসতবাটী রেহান দিয়া নূতন খত লিখিয়া দিল এবং সে যাত্রা নিষ্কৃতি পাইল।

কিন্তু খামারগুলি হারাইয়া এক্ষণে তাহার পক্ষে সেই নূতন খতের টাকা পরিশোধ করা আরও অসম্ভব হইয়া পড়িল। এখন তাহার পেট চালানই দায়; পরিবারের লোক ত' কম নয়,—দু-বেলা তাহাদের সকলে পেট ভরিয়া আহার জুটে না, পরিবারদের পরণে কাপড় এক প্রকার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঘরের জিনিস-পত্র একে-একে সব গিয়াছে। তবু মদন জোয়ান ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া পাড়ায় জন-মজুরী করিয়া কোনক্রমে পরিবারগুলিকে অনশন হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে—কিন্তু এ যাবৎ একটি পয়সা সুদ দিয়া উঠিতে পারে নাই। ক্রমে অনশনক্লেশ এবং তাহার উপর দারুণ ভাবনায় তাহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

এদিকে কিছু দিন হইতে মদনের বসতবাটীখানির উপর ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান জনার্দন ঘোষের লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়া আছে। বাড়ীখানি বেশ উচ্চভূমির উপর নির্মিত এবং তাহার সহিত কয়েক বিঘা বাগানের উপযুক্ত জমিও আছে। স্থানটিও বেশ নির্জন—চারিদিকে যদিও মুসলমান কৃষক-বস্তী তথাপি অন্ততঃ যখন সেখানে কোন ভদ্রলোকের বসতি নাই, তখন স্থানটি একটি সুন্দর বাগানবাড়ীর জন্য উপযুক্তরূপ নির্জন বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। পিতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির উপর ঘরে বসিয়া যদৃচ্ছা আমোদ-প্রমোদ করা চলে না; তাই একটি বাগানবাড়ী নির্মাণ করিবার জন্য এইরূপই একটি নির্জন প্রশস্ত স্থানের অভাব জনার্দন বাবু অনেক-দিন হইতে বোধ করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে পলাশডাঙ্গা এবং রসুলপুরের মধ্যে একটা নদীর ব্যবধান থাকায়, এই গ্রামটিই বাগানবাড়ী নির্মাণের উপযুক্ত বলিয়া তিনি স্থির করিয়াছেন। মদনের বাড়ীখানিও ঠিক নদীর উপরেই; সুতরাং গোপন বিহারের জন্য এরূপ নিরাপদ স্থান আর কোথায় পাওয়া যাইবে? সুতরাং মদনের নামে নালিশ করিয়া উহার বাড়ীখানির দখল লইবার জন্য তিনি কিছুকাল যাবৎ পিতাকে বার-বার তাগাদা করিতেছেন। আর ঘোষ মহাশয়ই বা কতকাল খতখানি ফেলিয়া রাখিবেন? সুতরাং আবার নালিশ হইল। ঘোষ মহাশয় দস্তুর-মাফিক ডিক্রী পাইলেন।

এক্ষণে সেই ডিক্রীর বাবদে ঘোষ মহাশয় বহু লোকজন সহ মদনের ভিটাবাড়ীতে বাঁশগাড়ী করিতে আসিয়াছেন।

মদন আসিয়া ঘোষ মহাশয়ের পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল এবং কহিতে লাগিল, "দোহাই বাবু, আমারে এক্কেবারে পথে দাঁড় করাবেন না বাবু, আপনার পায়ে পড়ি বাবু!..."

ঘোষ মহাশয় পা টানিয়া কহিলেন, "তা আমি কি ক'রব বাপু; তুই টাকাটা এদ্দিন ফেলে রাখলি, যদি কিছু কিছু করে দিয়ে আস্‌তিস তোরও গায়ে লাগত না, আমারও খত তামাদি হতো না। খত ফেলে রেখে তো আর আমি টাকাটা খোওয়াতে পারিনে!"

মদন কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "বল্লে বিশ্বাস কর্‌বেন না বাবু, আমি দু-বেলা দু-মুঠো ভাতই জোটাতে পারিনে, পরিবারের পরনে কাপড় দিতে পারিনে, কন্‌তে আপনার টাকা দেবো......"

দিগম্বর ঘোষ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, হ্যাঁ, ওসব মায়া কান্না রেখে দে! কেন, তোর জোয়ান ব্যাটা র'য়েছে, দুই বাপ-পোয়ে তো জন খেটে পয়সা রোজগার করিস—আবার বলে কিনা (মুখ ভ্যাংচাইয়া) দু-মুঠো ভাত জোটাতে পারিনে, পরিবারের কাপড় দিতে পারিনে!—"

মদন কহিল, "হায়, হায়, বাবু দ্যাহেন তো বুড়ো হ'য়ে গিছি, তাতে আজ বছরখানেতে হাঁপানি ব্যারামে এক্কালে কাবু হ'য়ে পড়িছি—কাজ কত্তি আর পারিনে। একলা ওই ছাওয়ালডা খা'টে খা'টে আর কত রোজগার কত্তি বাবু? খানেআলা তো এট্টা দুডো না, কেমন করে যে সবগুলোর জানটা বেঁচে আছে, তা আল্লাই জানে......"

"নে, নে, এখন ওসব প্যানপ্যানানি রাখ্‌। আমার টাকা তো আদায় করতে হবে......"

একান্ত প্রাণের দায়ে মরিয়া হইয়া মদন কহিল, "তবে আর কয়ডা দিন রেহাই দেন কত্তা, আমি এবার না-খায়ে না-দায়ে আপনার টাকা কিছু কিছু ক'রে দেবো......"

ঘোষ মহাশয় অবজ্ঞাভরে কহিলেন, "হ্যাঁঃ, তুই এতদিন বড় দিতে পাল্লি, এখন আবার দিবি! শুধু কথায় কি আর চিঁড়ে ভিজে রে, মদন!"

"তবে আমার কি উপায় হবে বাবু—কনে গে' দাঁড়াব সব কাচ্চাবাচ্চা নে।"

"তা আমি কি জানি; তোর যেখানে খুশী সেইখানেই যা,—এখন বাড়ী আমার, আমি দখল ক'রেছি!"

এই কথায় মদন আর স্থির থাকিতে পারিল না। উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "ওগো আপনারা পাঁচজন আছেন, এট্টুখানি দয়া ক'রে ওনারে দুটো কথা ক'য়ে আমারে বাঁচান গো! আমারে বাঁচান, এ বাপদাদার ভিটেটুক্‌খানি গেলি আমি কন্নে গে' দাঁড়াব—হায় রে আল্লা! আমি কন্নে গে' দাঁড়াব।"

বিরক্ত হইয়া জনার্দন বাবু পেয়াদাকে ডাকিয়া কহিলেন,—"নেও, তোমরা বাঁশটা গেড়ে ফেল। এই ব্যাটারা, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন? বাজা, ঢোল বাজা!"

দমাদম্ ঢোলে ঘা পড়িতে লাগিল। মদনের মনে হইল, যেন সে ঘা তাহার বুকের ভিতরই পড়িতেছে। সে আবার ডুক্‌রিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এদিকে ঘোষ মহাশয় তাঁহার লোকজন লইয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন দেখিয়া সে দরজার সম্মুখে আড় হইয়া পড়িয়া কহিল, "আমার গলায় পা দে' দমডা বার ক'রে ফেলে দেন, কত্তা! আমার জানে আর এ সয় না গো, আমার জানে আর সয় না! হায় রে আল্লা! আমি কাচ্চা-বাচ্চা বউ-ঝি নিয়ে কন্নে গে' দাঁড়াব—ওগো আপনারা দয়া ক'রে আমার হ'য়ে বাবুকে দুটো কথা কন্ গো! আমার ঝি-বউরে পথে বার করবেন না গো বাবু, এট্টু দয়া করেন বাবু। আমি যে তাগোরে কারো বাড়ী ধান ভানতিও যাতি দেইনি। তাগোর মান-ইজ্জত মারবেন না, হা হা হা!".......

পাড়ার একজন মোড়ল এ দৃশ্য আর দেখিতে না পারিয়া দিগম্বর ঘোষের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া কহিল, "কত্তা! বুড়ো মানুষ ডুক্‌রে কাঁদতি লেগেছে, এট্টু, দয়া করেন—ওগোরে পথে বের করবেন না......"

জনার্দন বাবু রুখিয়া উঠিয়া কহিলেন, "ও ব্যাটার কান্নাতেই আমাদের খতের টাকা পরিশোধ হবে নাকি?"

মোড়ল মিনতি করিয়া কহিল, "না, বাবু আমি সে কথা কইনি। এক্কনি ওগোরে বাড়ী হতি তাড়াবেন না, তাই কই। কিছুদিন সোমায় দিলি ও আপনার এট্টা মাথা গোঁজবার জাগা ক'রে নিতি পারবে......"

পাছে বাগান বাড়ীর পত্তন করিতে বিলম্ব হইয়া পড়ে, এই ভয়ে জনার্দন বাবু অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "না না, ও সব হবে টবে না বাপু। আমরা আজই দখল নেব।"

মোড়ল কহিল, "তা নেন, কত্তা; কিন্তু ওগোরে দিন কতেক থাক্‌তি দেন......"

এদিকে মদন দরজার সম্মুখে আড় হইয়া পড়িয়াই আছে। দিগম্বর ঘোষ অতিষ্ঠ হইয়া কহিলেন, "ওঠ, নইলে তোকে ডিঙ্গিয়ে আমরা বাড়ীর ভিতর ঢুক্‌ব......"

এই কথায় আরও একজন প্রতিবেশী দয়াপরবশ হইয়া কহিল, "ঘোষ মশাই, দখল তো আপনার হ'লোই, তা এখন বাড়ীর মদ্দি গে ওগোরে বে-ইজ্জত ক'রে আর আপনাগোর লাভডা কি হবে? এট্টু থামেন, আমরা মদন গাজীর পরিবারগোরে সরায়ে নে যাই। আপনারা যদি দোড়ডা ছাড়েন, তয় আমরা বাড়ী খালি করি।"

পেয়াদা তখন বলিয়া উঠিল, "আরে তোমরা সেই ফাঁকে জিনিস-পত্তোরগুলোও সরাও আর কি?

মদন উঠিয়া বসিয়া বলিয়া উঠিল, হায় হায়, প্যাদাজি, জিনিস-পত্তোর কি কিছু আছে! কিছু নেই রে আল্লা! কিছু নেই। বউডোর এট্টা বদ্‌না ছিল, তাও আজ কদ্দিন হ'ল বেচে খাইচি—ছাওয়ালডার জ্বর হ'ল, কদ্দিন কাজে যেতে পান্নে না, কচি বউডোরে কাঁদায়ে নিজিগোর প্যাটা ভরাম—" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের শ্বেত শ্মশ্রুরাজি বাহিয়া দরবিগলিতধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

এমন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে স্ত্রীলোকদিগের যুগপৎ ক্রন্দন এবং চীৎকার শুনা গেল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া মদন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাড়ীর ভিতর যাইতেছিল, এমন সময় তাহার বৃদ্ধা স্ত্রী দরজার কাছে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিল, "ওগো আল্লা গো! কি হল গো, আমার সাদেক গাঙ্গে ঝাঁপ দেছে গো,—ওরে আমার সোনার যাদু রে—ভিটে মাটি সব গেল সেই দুঃখে আমার যাদু পানিতে ডুব দেছে রে আল্লা! হা হা হা......"

এদিকে স্ত্রীর মুখে এই কথা শুনিতে শুনিতে হতভাগ্য মদন দড়াম্ করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। বাড়ীর ভিতরে বাহিরে একটা শোরগোল পড়িয়া গেল—এক দিক্ হইতে স্ত্রীলোকেরাও অন্য দিক্ হইতে প্রতিবেশীরা ছুটিয়া দরজার কাছে আসিয়া দেখিল, বৃদ্ধ মদন চৌ কাঠের উপর মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে।

৮

রসুলপুর গ্রামখানি বেশ বর্ধিষ্ণু। তথায় বহুসংখ্যক উচ্চশ্রেণীর হিন্দু এবং মুসলমান রইস্ বাস করেন। হিন্দুগণ প্রায় সকলেই সম্পন্ন গৃহস্থ; কিন্তু মুসলমান রইস্‌গণের অবস্থা ভাল নহে। তাঁহাদের অনেকেরই পৈতৃক সম্পত্তি, এমন কি, কাহারও কাহারও বসতবাটীখানি পর্যন্ত রসুলপুরেরই হিন্দু মহাজনদিগের নিকট ঋণদায়ে আবদ্ধ; তথাপি তাঁহারা সাংসারিক উন্নতির জন্য কোন প্রকার উদ্যোগ করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন না। একমাত্র খোদা ভরসা করিয়াই খোশ মেজাজে, বহাল-তবিয়তে দিন গুজরান করিয়া থাকেন।

এতদ্ভিন্ন পলাশডাঙ্গা প্রভৃতি নিকটস্থ গ্রামগুলিতে অনেক মুসলমান কৃষক বাস করে। গ্রাম সন্নিহিত বিল এবং ক্ষেত্রগুলি প্রচুর উৎপাদনশীল হইলেও এই সকল হতভাগ্য কৃষকের অবস্থা সচ্ছল নহে। তাহারা যাহা কিছু উপার্জন করে তাহার অধিকাংশই মহাজনেরা গ্রাস করিয়া বসে; অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহাতে কায়ক্লেশে বৎসরের অর্ধেককাল চালাইয়া বাকী অর্ধেকের খাওয়া-পরার জন্য ইহারা আবার মহাজনের হাতে-পায়ে ধরিতে যায়।

আবদুল্লার ফুফা মীর মোহ্‌সেন আলি রসুলপুর গ্রামেরই একজন মধ্যবিত্ত রইস। তিনি পৈতৃক সম্পত্তি যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা সামান্য হইলেও পাটের কারবারের এবং মহাজনীতে বেশ দু'পয়সা উপার্জন করিয়া এক্ষণে এ অঞ্চলের মধ্যে একজন ধনী লোক বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মীর সাহেব গৃহশূন্য এবং নিঃসন্তান। লোকে বলিত, স্বামী সুদ খান বলিয়া পীরের মেয়ে মনের দুঃখে সংসার ছাড়িয়া গিয়াছেন এবং সুদের গোনায় আল্লাহ্-তা'লা মীর সাহেবকে সংসারের সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন।

কিন্তু মহাজনী কারবারে মীর সাহেব নিজগ্রাম অঞ্চলে বড় একটা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার খাতকেরা প্রায় সকলেই ভিন্ন গ্রামের এবং তাহাদের অধিকাংশই ব্যবসায়ী মুসলমান। মীর সাহেবের নিকট অনেক কম সুদে টাকা পাইত বলিয়া তাহারা ফী-মৌসুমে তাঁহার নিকট হইতে আবশ্যক মত টাকা ধার লইত এবং মৌসুম-শেষে যথেষ্ট লাভ করিয়া মীর সাহেবের কড়া-গণ্ডা বুঝাইয়া দিয়া যাইত।

মধ্যবিত্ত মুসলমান রইস্ যাঁহাদের একটু আধটু ভূ-সম্পত্তি আছে এবং দরিদ্র মুসলমান কৃষক, গ্রাম্য মহাজনের পক্ষে এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে টাকা খাটাইবার যেমন সুবিধা, এমন আর কোথায়ও নাই। রসুলপুর অঞ্চলে এই শ্রেণীর লোক যথেষ্ট থাকাতে হিন্দু মহাজনেরা বেশ ফাঁপিয়া উঠিতেছেন; কিন্তু তাঁহার সুদের হার অতি সামান্য হইলেও মীর সাহেব তাহাদের মধ্যে দুইটি কারণে ব্যবসায় জমাইতে পারেন নাই। প্রথমতঃ রইস্‌গণের প্রায় সকলেই তাঁহার জ্ঞাতি-কুটুম্ব; সুতরাং তাঁহার পরম হিতৈষী। কাজেই হিন্দু মহাজনদিগের নিকট হইতে উচ্চ হারের সুদে ঋণ গ্রহণ করিয়া জেরবার হইতেছেন, তথাপি মীর সাহেবকে মহাজনী কারবারে প্রশ্রয় দিয়া তাঁহাকে জাহান্নামে পাঠাইতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হইতেছে না! দ্বিতীয়তঃ পূর্ব পুরুষগণের

মনিব বলিয়া কৃষকমহলে রইস্‌গণের আজ পর্যন্ত যে প্রভুত্বটুকু টিকিয়াছিল, তাহারই বলে তাঁহারা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, মুসলমান হইয়া যে ব্যক্তি সুদ খায় সে জাহান্নামী এবং সে জাহান্নামীর সঙ্গে মুসলমান হইয়া যে কারবার করে সেও জাহান্নামে যায়। এই জন্যই তো সুদখোরের বাড়ীতে খাওয়া অথবা তাহাকে বাড়ীতে 'দাওৎ' করিয়া খাওয়ান মস্ত গোনার কাজ। কিন্তু হিন্দুদের যখন ধর্মে বাধে না, তখন সুদ খাইলে তাহাদের কোন পাপ নাই, সুতরাং লাচারী হালতে তাহাদের সঙ্গে কারবারেও কোন দোষ হইতে পারে না।

পাঁচজন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে একত্রে যখন লোক দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং সেই অবস্থায় কয়েক পুরুষ কাটাইয়া দেয়, তখন তাহাদের কেমন একটা দুর্দশার নেশা লাগিয়া যায়—কিছুতেই সে নেশা ছুটিতে চাহে না। ক্রমে মনে এবং দেহে একটা অবসাদ আসিয়া পড়ে, যাহার গতিকে সংসারের দুঃখ-কষ্ট তাহাদের ধা'তে বেশ সহিয়া যায়। ইহা অপেক্ষা অধিক সুখে সংসারে বাস করা যে সম্ভব হইতে পারে, এরূপ কল্পনা তাহাদের মনেও আসে না,—কেন না, খোদা না দিলে আসিবে কোথা হইতে? এরূপ অবস্থায় খোদার উপর এক প্রকার সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট নির্ভরের মাত্রা কিছু বেশী পড়ে এবং ইহকালের সচ্ছলতার বিনিময়ে পরকালের বেহেশ্‌তের মেওয়া-জাতের উপর একচেটিয়া অধিকার পাইবার আশায় ধর্মের বাহ্যিক আচার-নিষ্ঠার বাড়াবাড়িও দেখা গিয়া থাকে।

কিন্তু অপরের সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি বাহ্যতঃ ঔদাসীন্য দেখাইলেও যে ব্যক্তি অক্ষমতা এবং উদ্যমবিহীনতার দরুন নিজের দুর্দশা ঘুচাইতে পারে না, তাহার শত আচার-নিষ্ঠার অন্তরালেও অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকের প্রতি একটা ঈর্ষার অস্বচ্ছন্দতা তাহার মনের কোণে সঙ্গোপনে বিরাজ করিতে থাকিবেই, যাহাদের উপর ব্যক্তিগত অথবা সামাজিকভাবে কোন প্রকার শাসন-তাড়না চালাইবার সুযোগ বা সম্ভাবনা না থাকে, তাহাদের উপর সে ঈর্ষা প্রকাশ তো পায়-ই না বরং উহা আবশ্যক মত নীচ তোষামোদেও পরিণত হইতে পারে; কিন্তু জ্ঞাতি-কুটুম্ব প্রভৃতি যাহাদের উপর একটু আধটু ক্ষমতা চলে, তাহাদের মধ্যে যখন কেহ আত্মোন্নতি করিয়া স্ব-সমাজকে সকলের উপর ' টেক্কা' মারিবার যোগাড় করিয়া তুলে তখন সেই গুপ্ত ঈর্ষা তাহার সকল প্রচেষ্টাকে নষ্ট করিয়া দিবার জন্য বিকট মূর্তিতে সকলের মনে স্ব-প্রকাশ করিয়া বসে। কাজেই যাহারা দল বাঁধিয়া একবার মজিয়াছে, শত চেষ্টা করিলেও তাহাদের উদ্ধার পাওয়া কঠিন। কয়েকজন লোক পানিতে ডুবিলে পরস্পর পরস্পরকে পানির ভিতর টানিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়া থাকে।

রসুলপুরের রইস্‌গণও কয়েক পুরুষ ধরিয়া দল বাঁধিয়া ক্রমাগত মজিয়া আসিতেছেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ মীর মোহসেন আলি নিজের চেষ্টায় যখন অবস্থা ফিরাইয়া আনিলেন তখন কাহারও পক্ষে তাঁহাকে সুনজরে দেখিবার সম্ভাবনা রহিল না। তিনি সকলের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন—বিশেষতঃ, তিনি যখন সুদ খাইতে আরম্ভ করিলেন তখন সকলে তাঁহাকে মনে মনে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে কেহ তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে সাহস পাইতেন না, বরং মৌখিক শিষ্টাচারের একটু বাড়াবাড়িই দেখাইতেন। তাহা হইলেও, সামাজিকভাবে তাঁহার সহিত মেলা-মেশা সকলে যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিতেন।

এদিকে মীর সাহেবের ন্যায় গৃহশূন্য নিঃসন্তানের পক্ষে তো গ্রামের উপর অথবা বাড়ীর উপর কোন মায়ার-বন্ধন ছিল না; তাই তিনি বৎসরের অধিকাংশ সময় বিদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ইহাতে তাঁহার পাটের কারবারেরও সুবিধা হইত এবং বিদেশে লোকের কাছে খাতিরও পাইতেন বেশ। সুতরাং স্বগ্রাম অপেক্ষা বিদেশই তাঁহার পক্ষে অধিক বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। মাসেক দু'মাস বিদেশে ঘুরিবার পর তিনি বাটী আসিয়া দশ-পনের দিন থাকিতেন, আবার বাহির হইয়া পড়িতেন।

এইরূপে একবার মাস-দুই বিদেশভ্রমণের পর বাটী আসিয়া মীর সাহেব আবদুল্লার একখানি পত্র পাইয়া অবগত হইলেন যে, তাঁহার সম্বন্ধী খোন্দকার ওলিউল্লাহ্ পরলোকগমন

করিয়াছেন। পত্রখানিতে প্রায় এক মাস পূর্বের তারিখ ছিল—মীর সাহেব ভাবিতে লাগিলেন, এতদিন আবদুল্লার পিতা-মাতা সুদখোর বলিয়া মীর সাহেবের উপর নারাজ ছিলেন এবং স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতে মীর সাহেবের সহিত শ্বশুরালয়ের সম্বন্ধ একরূপ উঠিয়া গিয়াছিল, তথাপি তিনি আবদুল্লাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং কলিকাতায় গেলে একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া ফিরিতেন না। অবশ্য আবদুল্লার সহিত তাঁহার এই ঘনিষ্ঠতার বিষয় তাহার পিতা-মাতার নিকট হইতে গোপন রাখা হইয়াছিল; এবং যদিও এক্ষণে মীর সাহেবের গায়ে পড়িয়া খায়েরখাহী দেখাইতে যাওয়াটা আবদুল্লার মাতা পছন্দ নাও করিতে পারেন তথাপি আবদুল্লার একটা সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি মন স্থির করিতে পারিতেছেন না। চিঠি তো সে বাড়ী হইতে প্রায় এক মাস পূর্বে লিখিয়াছে; কিন্তু এখন যে কোথায় আছে, তাহা কি করিয়া জানা যায়? এ অবস্থায় একবার পীরগঞ্জেও যাওয়া কর্তব্য কিনা, মীর সাহেব তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বৈঠকখানার বারান্দায় বসিয়া তিনি মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, একটা লোক ভিজা কাপড়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাঁহারই দিকে আসিতেছে। একটু কাছে আসিলেই তিনি লোকটিকে চিনিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ "কি, কি সাদেক গাজী খবর কি?" বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সাদেক একেবারে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পা দুটি জড়াইয়া ধরিল এবং রুদ্ধ নিশ্বাসে কহিতে লাগিল, "দোহাই হুজুর, আমাগোরে রক্ষে করেন..."

অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া মীর সাহেব তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইতে গেলেন, কিন্তু সে কিছুতেই তাঁহার পা ছাড়িয়া উঠিতে চাহিল না, কেবলই বলিতে লাগিল,—"আমাগোরে বাঁচান, হুজুর, আমাগোরে বাঁচান!"

"আরে কি হ'য়েছে, তাই বল না। আমার সাধ্যে যা থাকে তা ক'রব বল'ছি—এখন উঠে স্থির হ'য়ে ব'সে কথাটা কি ব'লত শুনি!"

এই কথায় একটু আশ্বস্ত হইয়া সাদেক পা ছাড়িয়া উঠিয়া মাটির উপর বসিতে বসিতে কহিল, "আর কি থির হবার যো আছে, হুজুর! দিগম্বর ঘোষ মশায় আমাগোর সব খা'য়ে বইছেন, এখন বাড়ীখানও কোরকে দে' আজ আ'সে বাঁশগাড়ী করতিছেন। আমাগোর কি উপায় হবে, হুজুর! আমাগোর বাঁচান কর্তা! আপনি না হলে আর কেউ বাঁচাতি পারে না!......"

মীর সাহেব তাহাকে বাধা দিয়া কহিলেন, "আরে ছি ছি! অমন কথা ব'লে না সাদেক, বাঁচানে-ওয়ালা খোদা!"—আচ্ছা, কত টাকার দেনা ছিল?

সাদেক কহিল, "খতে ল্যাহা ছিল দুইশ তিন কুড়ি, এখন সুদ আর খরচ-খরচা সে মহাজনের দাবী হইছে পাশ্‌শ বাইশ টাকা কয় আনা যেনি!......

"আপনি যদি এট্টু দয়া না করেন মীর সাহেব, তবে আমরা এবার একাল পথে দাঁড়াই..."

মীর সাহেব কহিলেন, "আচ্ছা তুমি এগোও, আমি টাকা নিয়ে আসছি।"

"না হুজুর, আমি আপনার সাথেই যাব—গাঙ স্যাঁথরে আইছি, তাড়াতাড়ি লা পালাম না, কারো কিছু কইনি, পাছে দেরী হ'য়ে যায়......"

"আচ্ছা আচ্ছা, চল, আমি এক্ষুণি টাকা নিযে আসছি", বলিয়া মীর সাহেব অন্দরে চলিয়া গেলেন এবং একটু পরেই কাপড়-চোপড় পরিয়া আবশ্যক মত টাকা লইয়া বাহিরে আসিলেন।

মীর সাহেবের বাড়ীর পশ্চাতে বাগানের পরেই তাঁহাদের ঘাট; ঘাটে একখানি ডিঙ্গি নৌকা বাঁধা ছিল, উভয়ে গিয়া তাহাতে উঠিলেন। সাদেক বৈঠা লইয়া বসিলে মীর সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,"আচ্ছা সাদেক, তোমাদের এমন দশা হ'য়েছে তা এদ্দিন আমাকেএকবারও বলনি তো।"

সাদেক কহিতে লাগিল, "কি ক'রব হুজুর, বাপাজি আপনার কাছে আস্‌তি সাহস করেন না। ওই বাদশা মিঞারাইতো যত নষ্টের গোড়া—তানিই বাপজিরে আপনার কাছে আসতি মানা করেন। তানারা সাত-পুরুষের মুনিব বাপজি কন্‌ কেমন ক'রে তানগোর কথা ঠেলি।"

"আমি ত' সেই কালেই কইছিলাম বাপজিরে যে ও ঘোষের পোর কাছে যাবেন না—ওর যে সুদির খাই বাপ্‌পস রে! তা বাদশা মিঞা পরামিশ্যে দে' বাপ্‌জিরে সেই ঘোষের পোর কাছেই নে' গেল—তা' নলি কি আজ আমাগোর ভিটে মাটি উচ্ছন্ন যায় হুজুর!"

বলিতে বলিতে ডিঙ্গি আসিয়া ওপারে ভিড়িল। মীর সাহেব চট্ করিয়া নামিয়া মদন গাজীর বাড়ীর দিকে চলিলেন। সাদেক তাড়াতাড়ি নৌকাখানি রাখিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইয়া গেল।

৯

সেই দিন বৈকালে আসরের নামায বাদ তস্‌বীটি হাতে ঝুলাইতে ঝুলাইতে বাদশা মিঞা প্রতিবেশী ভ্রাতি লাল মিঞার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার পায়ে এক জোড়া বহু পুরাতন চটি, পরিধানে মার্কিনের পান কাটা তহ্‌বন, গায়ে ঐ কাপড়েরই লম্বা কোর্তা, মাথায় চিকনিয়া চাঁদপাল্লা টুপি—তস্‌বীর দানাগুলির উপর দ্রুত সঞ্চলনশীল অঙ্গুলিগুলির সহিত ওষ্ঠদ্বয় ক্ষণ-কম্পমান।

এইমাত্র লাল মিঞা আসরের নামায পড়িয়া গিয়াছেন—বাদশা মিঞার আগমনে তিনি বাহিরে আসিয়া সালাম-সম্ভাষণ করিলেন, বাদশা মিঞাও যথারীতি প্রতি-সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার সহিত বৈঠকখানায় গিয়া উঠিলেন। বৈঠকখানা ঘরটি নিরতিশয় জীর্ণ এবং আসবাব-পত্রও তাহার অনুরূপ। বসিবার জন্য একখানি ভগ্নপ্রায় চৌকি—সে এত পুরাতন যে ধুলা-বালি জমিয়া জমিয়া তাহার রং একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে। চৌকির উপর একটি শতছিদ্র ময়লা শতরঞ্জি পাতা, তাহার উপর ততোধিক ময়লা দুই একটা তাকিয়া। উহার এক পার্শ্বে সদ্যব্যবহৃত ক্ষুদ্র 'জায়নামায'টি কোণ উল্টাইয়া পড়িয়া আছে। মেঝের উপর একটা গুড়গুড়ি, নলচাটিতে এত ন্যাকড়া জড়ান হইয়াছে যে, তাহার আদিম আবরণের চিহ্নমাত্রও আর দৃষ্টিগোচর হইবার উপায় নাই। গৃহের এক কোণে একটি মেটে কলসী, অপর কোণে একটি বহু টোল-খাওয়া নল-বাঁকা কলাই বিহীন বদ্‌না স্বকৃত কর্দমের উপর কাৎ হইয়া আছে।

টলটলায়মান চৌকিখানির করুণ আপত্তির দিকে নজর রাখিয়া উভয়ে সাবধানে তাহাতে উঠিয়া বসিলেন। লাল মিঞা কহিলেন, "তারপর, ভাই সাহেব, খবর কি?"

অঙ্গুলি এবং ওষ্ঠদ্বয়ের যুগপৎ সঞ্চালন বন্ধ করিয়া বাদশা মিঞা কহিলেন, "পলাশডাঙ্গার মদন গাজীর খবর শুনেন নি?"

"না ত'! কেন, কি হ'য়েছে?"

"মারা গেছে।" বলিয়া তিনি আবার পূর্ববৎ অঙ্গুলি এবং ওষ্ঠ ঘন ঘন চালাইতে লাগিলেন।

"মারা গেছে! হঠাৎ মারা গেল কিসে?"

"ও, সে অনেক কথা! ও দিগম্বর ঘোষের অনেক টাকা ধারত কিনা, তাই দিগম্বর এইছিল বাড়ী ক্রোক ক'ত্তে। সে কিছুতেই দখল দেবে না, তারপর যখন জোর ক'রে ওদের বাড়ী থেকে বার ক'রে দিতে গেল, তখন ওর ছেলেটা গিয়ে পানিতে প'ল, আর তাই শুনে মদন অজ্ঞান হ'য়ে ধড়াক ক'রে প'ড়ে গেল চৌকাঠের ওপর। তারপর মাথা ফেটে রক্তারক্তি আর কি।"

"তাইতে ম'লো?"

"হ্যাঁ, সেই যে প'ল, আর উঠ্‌লো না..."

"আহা। বেচারা বুড়ো বয়সে বড় কষ্ট পেয়েই গেল!"

সহানুভূতি-সূচক ঘাড় নাড়া দিয়া বাদশা মিঞা কহিলেন, "সত্যি, বড় কষ্টটাই পেয়েছে! এদানী তার বড্ডই টানাটানি প'ড়েছিল কি না?"

"ছেলেটা যে পানিতে প'ল বল্লে, তার কি হ'ল?"

"তা তো আর শুনিনি। সেও গেছে বোধ হয়..."

"আহা! এক সঙ্গে বাপ ব্যাটায় গেল! মুসীবত যখন আসে, তখন এম্‌নি ক'রেই আসে!"

বাদশা মিঞা অনুমোদনসূচক মস্তক সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, "তার আর সন্দেহ কি?" বলিয়াই আবার তস্‌বীহ্‌ চালাইতে লাগিলেন।

লাল মিঞা যেন একটু ক্ষুণ্ন মনেই কহিলেন, "আর ক্রোক ক'ত্তে পাল্লে কই। ওদিকে মীর সাহেব যে কোন্‌ সন্ধানে ছিলেন তা তিনিই জানেন; ঠিক সময় মত এসে হাজির আর কি?"

"তা তিনি এসে কি ক'ল্লেন?"

"টাকাটা মিটিয়ে দিলেন আর কি।"

লাল মিঞা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। চোখ তুলিয়া কহিলেন, "এ্যাঁ! মীর সাহেব!"

বাদশা মিঞা গম্ভীরভাবে কহিলেন, "হ্যাঁ। তবে ওর ভেতর অনেক কথা আছে।" আবার তাঁহার ওষ্ঠ ও অঙ্গুলি ক্ষিপ্রগতিতে চলিতে আরম্ভ করিল।

লাল মিঞা ঔৎসুক্যে অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা, ভাই, কি কথা?"

কিছুক্ষণ আপন মনে তস্‌বীহ্‌ পড়িয়া বাদশা মিঞা কহিলেন, "কথা আর কি। যেত ঘোষেদের ঘরে, তার বদলে এল এখন মীরের পোর হাতে। সে ঐ ফিকিরেই দিন-রাত্ত ফেরে কি না।"

লাল মিঞা একটুখানি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "তাই তো!"

বাদশা মিঞার তসবীহ্‌ ঘন ঘন চলিতে লাগিল। একটু পরে তিনি কহিলেন, "এর ভেতরে মী'রের পোর আরও মতলব আছে..."

সাগ্রহে লাল মিঞা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মতলব, ভাই সাহেব?"

বাদশা মিঞা স্বর অত্যন্ত নামাইয়া ফিস্‌ ফিস্‌ করিতে করিতে কহিলেন, "মদনের ব্যাটার বউকে দেখেছেন?"

"না।"

"চাষা হ'লে কি হয়, দেখ্‌তে বেশ!"

"তাই—কি?"

"মীরের পোর নজর পড়েছে।"

চোখ্‌ কপালে তুলিয়া লাল মিঞা কহিলেন, "এ্যাঁ সত্যি নাকি?"

"কদ্দিন দেখিছি মীরের পো ওপারে গিয়ে সময় নেই অসময় সেই, ঘুরঘুর ক'রে একলাটি ঘুরে বেড়াচ্চে। আর দেখুন, কত লোকের বাড়ী-ঘরদোর নীলাম হ'য়ে যাচ্ছে, ক্রোক হ'চ্চে, কারুর বেলায় কিছু না, ওই মদন গাজীর জন্যে ওর এত পুড়ে উঠ্‌ল—কেন? টাকাটা অমনি দিয়ে ফেল্লে একটা খতও নিলে না! হ্যাঃ! মীর সাহেব তেম্‌নি লোক আর কি! আর এখন ত' খুব সুবিধেই হ'য়ে গেল! বাপ-ব্যাটা দু'জনেই ম'রেছে। আসল কথা, আমি যা ব'ল্লাম—দেখে নেবেন।"

লাল মিঞা কহিলেন, "মীরের পোর ওদিকেও একটু আছে, তা তো আমি জানতাম না! এই জন্যেই আর বে-থা ক'ল্লে না, কেবল পথে পথেই ঘুরে বেড়ায়..."

সমর্থন পাইয়া বাদশা মিঞা সোল্লাসে কহিলেন, "ঠিক ব'লেছেন, ভাই! ওইটাই আসল কথা। নইলে একলা মানুষ এত টাকা রোজাগরের ফন্দী কেন? তোর বাপু কে খাবে!"

"ওর পয়সা কি আর কারুর ভোগে লাগবে? খোদা সে পথ যে আগেই মেরে রেখেছেন! হারামের পয়সা ও হারামেই উড়িয়ে দিয়ে যাবে।"

বাদশা মিঞা গম্ভীরভাবে স্বীয় মস্তকটি বার কয়েক ঝাঁকা দিয়া অনুমোদন জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় ও অঙ্গুলি দ্রুতবেগে তস্‌বীহ্‌ পাঠ করিয়া চলিল।

এমন সময় মসজিদ হইতে মগরেবের আযান শুনা যাইতে লাগিল। উভয়েই নীরবে আযান বাদ মুনাযাত করিলেন এবং তাড়াতাড়ি বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া মসজিদের দিকে প্রস্থান করিলেন।

নামায অন্তে যখন মুসল্লিগণ মসজিদ হইতে একে একে বাহির হইতে লাগিলেন, তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার ভাল করিয়া ঘনায় নাই। মীর মোহসেন আলিও মসজিদে আসিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি একটু বিলম্বে আসিয়া এক প্রান্তে স্থান লইয়াছিলেন এবং মফল নামায শেষ করিয়া মুদ্রিত নয়নে নীরবে দোওয়া-দরূদ পাঠ করিতেছিলেন। বাদশা মিঞা বাহিরে আসিবার সময় অস্পষ্ট আলোকে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং লাল মিঞার গা টিপিয়া ইশারা করিয়া দেখাইলেন। উভয়ে পরস্পরের দিকে চাহিয়া একটু গূঢ়ার্থসূচক হাস্য করিলেন।

আজকার মদন গাঙ্গী সংক্রান্ত ব্যাপারটি সকলের কাছে সালঙ্কারে বর্ণনা করিবার জন্য বাদশা মিঞা উৎসুক হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই বাহিরে আসিয়া দুই এক জনের সম্মুখে কথাটি উত্থাপন করিবামাত্র "কি হ'য়েছে?" "কি হ'য়েছে?" বলিতে বলিতে বহু উৎকণ্ঠ শ্রোতা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বাদশা মিঞা তাঁহার ইতিহাস অর্ধেক চোখের ভঙ্গীতে এবং অর্ধেক নিম্ন স্বরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। এদিকে মীর সাহেব মসজিদ হইতে বাহির হইয়া যখন তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া সালাম সম্ভাষণ করিলেন, তখন সকলে প্রতি-সম্ভাষণ করিয়া, "কবে আসিলেন?" "কেমন আছেন?" ইত্যাদি কুশল-প্রশ্ন করিলেন; মীর সাহেবও স্মিতমুখে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

বাটী আসিয়া মীর সাহেব দেখিলেন যে, তাঁহার বৈঠকখানার বারান্দায় কে একটা লোক বসিয়া আছে। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে তিনি জিজ্ঞাসা করিরেন, "কে হে, অন্ধকারে ব'সে?"

লোকটি কহিল, "আমি আল্‌তাফ।"

"ওঃ, তুমি এসেছ! বেশ, বেশ, বেশ। আমি আরও ভাবছিলাম, তোমাকে ডেকে পাঠাব। ঘরে এস—ওঃ, ঘর যে অন্ধকার,—এই উল্‌ফৎ উল্‌ফৎ!"

উল্‌ফৎ নামক তাঁহার বিহার-নিবাসী ভৃত্যটি অন্য ঘরে বসিয়া বসিয়া তামাক টানিতেছিল। মনিবের ডাকে সে তাড়াতাড়ি হুঁকা রাখিয়া গালভরা ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে ভারী আওয়াজে বলিল, "আওতা হায়, হাযুর।"

মীর সাহেব একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আরে আওতা কেয়া রে! বাত্তি লাও না! শাম হো গ্যায়া আবতক্ বাত্তি নেহি দিয়া ঘরমে?"

উল্‌ফৎ বাহিরে আসিয়া কহিল, "উ কা হায় মেজ পর!" তাহার পর ঘর অন্ধকার দেখিয়া অপ্রস্তুত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আরে বুত্‌ গইল! হম তো হারকেন জ্বালকে মেজ্ হী পর ধর দিয়া রাহা।"

মীর সাহেব একটু হাসিয়া কহিলেন, "হাঁ হাঁ, বুত্‌তো গইল, আব্ ফের জ্বালা দেইল তো আচ্ছা ভইল্।"

মনিব তাহার ভাষা লইয়া মধ্যে মধ্যে এইরূপ পরিহাস করিতেন, তাহাতে উল্‌ফৎ শুধু একটু হাসিত, কখনও বেজার হইত না। সেও একটুখানি হাসিয়া কহিল, "আবহী জ্বালা দেতা হাযুর!"

আলো জ্বালা হইলে মীর সাহেব আল্‌তাফকে সঙ্গে লইয়া ভিতরে গিয়া বসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের কলেজ খোলেনি!"

আল্‌তাফ কহিল, "জি না, এই সোমবারে খুল্‌বে।" মীর সাহেব কহিলেন, "তবু ভাল! আমার এবার বাড়ী ফিরতে দেরী হ'য়ে গেল, তাই ভাবছিলাম বুঝি এদ্দিন কলেজ খুলে গেছে! যা হোক, বেশী দেরীও তো আর নেই। আজ হ'ল গিয়ে বিস্যুৎবার, মধ্যে আর তিন দিন বাকে। কবে রওয়ানা হবে?"

"আমার তো ইচ্ছে কাল বাদ-জুমা রওয়ানা হই; কিন্তু বাপজানের যে মত হয় না!"

"কেন?"

"তিনি আমাকে ত' আর প'ড়তেই দিতে চান না। বলেন, এন্ট্রান্স পাশ করেছিস্ ঐ ঢের হ'য়েছে, এখন একটা দারগাগিরি-টিরির চেষ্টা দেখ।"

"তা তুমি কি ঠিক্ ক'রেছ?"

"আমার ত' ইচ্ছে এফ-এ টা পাশ করি। এক্‌জামিনের তো আর বেশী দেরী নেই, এই কটা মাস......"

মীর সাহেব বাধা দিয়া কহিলেন, "এফ এ-টা যদি পাশ ক'রে পার, তবে কি ক'রবে?"

আল্‌তাফ একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল, "বি-এ প'ড়তে পারে তো ভালই হ'ত, তবে......"

"তবে আবার কি, তুমি যদি প'ড়তে চাও, তবে যদ্দিন বেঁচে আছি, তোমাকে যেমন খরচ দিচ্ছি, তেমনই দেব। সে জন্য কিছু ভেব না!"

"বাপজান যে বড় গোলমাল করেন। ঐ তারাপদ বাবুর ছেলে সুরেন দারোগা হ'য়েছে কিনা, আর উপায়ও ক'চ্ছে খুব, তাই দেখে তিনি আমাকেও ঐ কাজে ঢুক্‌বার জন্যে কেবলই জেদ ক'চ্ছেন।"

"আচ্ছা বাদশা মিঞাকে আমি ভাল করে বুঝিয়ে দেব'খন। খরচ-পত্রের জন্য ত' আর এখন আট্‌কাচ্ছে না; কেন মিছেমিছি পড়া বন্ধ করে ভবিষ্যৎ মাটি করা! আর দারোগগিরি-ফারোগগিরি ও সব কাজে যেয়ো না—ওতে গেলে মানুষ একেবারে মাটি হ'য়ে যায়।

"জি না, আমার তো ইচ্ছে না, কেবল বাপজানই জেদ করেন কি না, তাই বল'ছিলাম।"

"আচ্ছা আমি তাঁকে কালই ব'লব। আমার আবার একটু পীরগঞ্জে যাবার ইচ্ছে ছিল। মনে ক'রেছিলাম, কালই রওয়ানা হব। থাক্‌, একটা দিন পরে গেলেও ক্ষতি হবে না।"

"তা তুমি এক কাজ কর না কেন, পরও আমার নৌকাতেই চল তোমাকে বরিহাটীতে নামিয়ে দিয়ে যাব।"

আল্‌তাফ তাহাতেই সম্মত হইয়া কহিল, "জি আচ্ছা, পরও আপনার সঙ্গেই যাব।"

মীরসাহেব একটু চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আহ্‌মদ আলি টালি ওদের কোন খবর পেয়েছ?"

"জি না, আহ্‌মদ আলির কোন খবর পাই নি, তবে আবদুল বারীর পত্র পেয়েছি। সেও আজ-কাল রওয়ানা হবে।"

"দু'মাস থেকে কারুর টাকা দেওয়া হয় নি। তা কল্‌কেতায় গেলে পরে পাঠিয়ে দিলে চ'লবে না?"

"তা চল্‌তে পারে। কিন্তু আমার পথ-খরচের টাকা নেই—বাপজান বল্লেন, তাঁর হাত বড় টানাটানি......"

"ওঃ, আচ্ছা আমি গোটা পাঁচেক টাকা দেবো—পরশুই দেবো—এক সঙ্গেই তো যাওয়া হবে। আর তোমার কল্‌কেতায় গিয়ে এই হপ্তাখানেকের মধ্যেই টাকা পাবে। ওদের ব'লে দিও!"

"জি আচ্ছা। তবে এখন উঠি, রাত হ'ল......"

"আচ্ছা এস।"

আল্‌তাফ কিঞ্চিৎ মাথা নোয়াইয়া আদাব করিয়া বিদায় লইল।

১০

প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিলে আবদুল্লাহ্‌ দেখিল খোলা জানালার ভিতর দিয়া ঘরে রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে। না-জানি কত বেলা হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া আবদুল্লাহ্‌ ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিল; কিন্তু পার্শ্বে সালেহাকে দেখিতে না পাইয়া মনে মনে কহিল, "দেখ তো, কি অন্যায়! কখন উঠে গেছে অথচ আমাকে ডেকে দিয়ে গেল না।"

প্রতিদিন ভোরে উঠা যাহাদের অভ্যাস, হঠাৎ একদিন উঠিতে বিলম্ব হইয়া গেলে সে নিজের উপর তো চটেই পরন্তু যে লোক ইচ্ছা করিলে তাহাকে সময়মত তুলিয়া দিতে পারিত, অথচ

দেয় নাই, তাহারও উপর চটিয়া যায়। তাই, সালেহাকে বেশ একটু বকিয়া দিতে হইবে এইরূপ সংকল্প করিতে করিতে আবদুল্লাহ্ পর্দা সরাইয়া খাট হইতে নামিয়া আসিল। সালেহার বাঁদী বেলা রাত্রে সেই ঘরে শুইত; আবদুল্লাহ্ তাহাকে ডাকিতে গিয়া দেখিল, সেও ঘরে নাই। মনে মনে ভারী বিরক্ত হইয়া আবদুল্লাহ্ আপনা-আপনি বলিয়া উঠিল, "কি মুশকিল, আমি এখন বাইরে যাই কি করে!"

একটু ভাবিয়া আবদুল্লাহ্ দরজার নিকট আসিল এবং কপাট দুটি সামান্য একটু ফাঁক করিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে চেষ্টা করিল, কেহ কোথাও আছে কি না। ভাল করিয়া দরজার বাহিরে মুখ বাড়াইতে তাহার সাহসে কুলাইল না; কি জানি যদি এমন কোন স্ত্রী-পরিজনের সহিত তাহার চোখাচোখি হইয়া যায় যিনি তাহাকে দেখা দেন না, তাহা হইলে ভয়ঙ্কর লজ্জার কথা হইবে!

কিন্তু আবদুল্লাহ্ কাহারও সাড়াশব্দ পাইল না। যদিও রৌদ্রে উঠান বেশ ভরিয়া গিয়াছে, তথাপি বাড়ীশুদ্ধ সকলকে নিদ্রিত বলিয়াই বোধ হইল। বেলা দেড় প্রহরের পূর্বে ইহাদের শয্যাত্যাগের নিয়ম নাই; তবে যাহারা নিতান্তই ফজরের নামায কাযা করিতে চাহেন না, তাঁহারা ভোরে একবার শয্যাত্যাগ করেন বটে, কিন্তু নামায পড়িয়াই আবার আর এক কিস্তি নিদ্রা দিয়া থাকেন। সুতরাং এ সময়ে একা একা সটান বাহিরে চলিয়া গেলেও কোন অদ্রষ্টব্য পুর-মহিলার সাক্ষাতে পড়িয়া অপ্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা নাই। আবদুল্লাহ্ একবার ভাবিল, তাহাই করা যাউক; কিন্তু পরক্ষণেই তাহার খেয়াল হইল, একজন পথপ্রদর্শকের সাহায্য ব্যতিরেকে শ্বশুর-দুর্গের প্রাঙ্গণ অতিক্রম করা জামাতার পক্ষে গুরুতর অশিষ্টতা। কাজেই, বাহিরে যাইবার জরুরী তলব থাকিলেও তাহাকে আপাততঃ নিশ্চেষ্ট হইয়া শয্যা-প্রান্তে বসিয়া থাকিতে হইল।

একটু পরেই হালিমা দরজার কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাইজান উঠেছেন!"

"হ্যাঁ, এস হালিমা।"

হালিমা ভিতরে আসিয়া কহিল, "এই একটু আগেই একবার ডেকে গিইছি, তখন আপনার কোন সাড়া পাইনি।"

আজ উঠ্‌তে বড্ড বেলা হ'য়ে গেছে। তোমার ভাবী কোন্ সকালে উঠে গেছে, তা আমাকে তুলে দিয়ে যায় নি......"

অনেক রাত্রে শু'য়েছিলেন, তাই বোধহয় তিনি আপনার ঘুম ভাঙ্গান নি..."

"সে গেল কোথায়?"

"বোধহয় আমার ঘরে গিয়ে ঘুমুচ্ছেন......"

"আর আমি এখেনে এক্‌লা এক্‌লা বসে ফ্যা ফ্যা ক'চ্চি। একটু বাইরে যাব, একটা লোক পাচ্চি নে যে আমাকে নিয়ে যায়......"

"কেন বেলা ছুঁড়িটা কোথায় গেল?"

"কেমন ক'রে ব'লব কোথায় গেল! ওই যে তার মাদুর প'ড়ে আছে, কিন্তু তার দেখা নেই।"

এ বাটীর দস্তুর এই যে, বিবি স্বয়ং উপস্থিত না থাকিলে কোন বাঁদীকে স্বামীর ঘরে থাকিতে দেওয়া হয় না। এই কথা মনে করিয়া হালিমা কহিল, "ওঃ, তাকে তবে ভাবী সাহেবা উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। আচ্ছা, আমিই আপনাকে পার ক'রে দিচ্ছি, চলুন, এখন কেউ ওঠেন নি, খবর দেওয়ার দরকার হবে না।"

এই বলিয়া হালিমা ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিল এবং এদিক ওদিক চাহিয়া কহিল, "যান"। আবদুল্লাহ্ বাহিরে চলিয়া গেল।

বহির্বাটী তখনও নিস্তব্ধ; কেবল খোদা নেওয়াজ কুঁয়ার নিকটে বসিয়া কর্তার হুঁকাটি মাজিতেছিল। আবদুল্লাহ্ কুঁয়ার দিকে অগ্রসর হইয়া কহিল, "আদাব, ভাই সাহেব!"

আবদুল্লার অভিবাদনে খোদা নেওয়াজ যেন একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, "আদাব, আদাব! আসুন, দুলা মিঞা। পানি তুলে দেব কি?"

আবদুল্লাহ্ কহিল, "না, না, ভাই সাহেব, আপনি কষ্ট ক'রবেন না, চাকরদের কাউকে ডেকে দিন।"

বাঁদী-পুত্র বলিয়া খোদা নেওয়াজকে সকলেই প্রায় বাড়ীর চাকরের মতই দেখিত; কেহ তাহাকে 'আপনি' বলিয়া কথা কহিত না, অথবা ব্যবহারেও কোন প্রকার সম্ভ্রমের ভাব দেখাইত না। কিন্তু তাহার সহিত আবদুল্লার ব্যবহার স্বতন্ত্ররূপ ছিল; বড় সম্বন্ধী বলিয়া তাহাকে যথারীতি সম্মান করিতে সে ত্রুটি করিত না। ইহাতে খোদা নেওয়াজ যেমন একটু সঙ্কোচ বোধ করিত, তেমনই আবদুল্লার প্রতি শ্রদ্ধায় তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিত। সে তাড়াতাড়ি হুঁকাটি ধুইতে ধুইতে কহিল, "না না কষ্ট কিসের! আপনার জন্যে একটু পানি তু'লে দেব, তাতে আবার কষ্ট!"

এই বলিয়া খোদা নেওয়াজ হুঁকাটি রাখিয়া পানি উঠাইবার জন্য বাল্‌তির দড়ি গুছাইতে লাগিল।

"আচ্ছা, আপনি পানি তুলুন, আমি বদনাটা নিয়ে আসি।" এই বলিয়া আবদুল্লাহ্ বৈঠকখানার দিকে অগ্রসর হইল। খোদা নেওয়াজ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "না, না, দুলা মিঞা, আপনি দাঁড়ান আমি বদনা এনে দিচ্ছি।"

চাকরদিগের ঘরে তখন দুই একজন উঠিয়া বসিয়া ধূমপান প্রভৃতির সাহায্যে আলস্য দূর করিতেছিল। খোদা নেওয়াজের কথা শুনিতে পাইয়া তাহারা বাহিরে আসিল এবং একজন দৌড়িয়া গিয়া বদনা আনিয়া দিল। বদনায় পানি ভরিয়া দিয়া খোদা নেওয়াজ তাহাকে কহিল, "যা তো, কালু, বদনাটা পায়খানায় দিয়ে আয়।"

"আরে না, না, নবাবীর কাজ নেই—আমিই বদনা নিয়ে যাচ্ছি।"—এই বলিয়া আবদুল্লাহ্ বদনা লইতে গেল, কিন্তু কালু চট্ করিয়া বদনাটা তুলিয়া লইয়া পায়খানার দিকে অগ্রসর হইল।

মুখ হাত ধুইয়া আবদুল্লাহ্ খোদা নেওয়াজকে জিজ্ঞাসা করিল, "বড় মিঞা সাহেব এখনও ওঠেন নি?"

খোদা নেওয়াজ কহিল, "বোধকরি এতক্ষণ উঠেছেন; এই সময়ে তো ওঠেন।"

"তিনি থাকেন কোন ঘরে?"

খোদা নেওয়াজ একটু খানি হাসিয়া কহিল, "তাঁর নতুন মহলে! সেই শাহ দুয়ারের ঘরখানায় যেখানে মেয়েরা ব'সে পড়ে।......"

"ও! আচ্ছা তাঁর কাছে একবার যাই আর আমাদের নতুন ভাবী সাহেবার সঙ্গে আলাপ ক'রে আসি......"

"যান, কিন্তু সে দেখা দিলে হয়..."

"কেন, কেন?"

"সে যে এখন বিবি হয়েছে..."

আবদুল্লাহ্ সকৌতুকে কহিল, "বটে নাকি?"

"দেখতেই পাবেন এখন।"

বাটীর পশ্চাৎ দিকের বাগানের ভিতর দিয়া আবদুল্লাহ্ বড় মিঞার মহলে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরের দরজা খোলাই ছিল। আব্দুল মালেক জাগিয়াছে, কিন্তু এখনও শয্যা ত্যাগ করে নাই। পেচোয়ানের অগ্রভাগ হাতে ধরিয়া, মুখনলটি ঠোঁটের উপর রাখিয়া সে আসন্ন ধূমপানের গৌরচন্দ্রিকা ভাঁজিতেছিল। তাঁহার "সদ্য-বিবাহিতা সহধর্মিনী" সোনালী খাটের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কলিকায় ফুঁ দিতেছিল; বারান্দায় কাহার পদশব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইতেই আবদুল্লার সহিত তাহার চোখোচোখি হইয়া গেল। অমনি পুরা দেড় হাত ঘোমটা টানিয়া তাড়াতাড়ি কলিকাটি হুঁকার মাথায় বসাইয়া দিয়া ঘরের কোণে গিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

আব্দুল মালেক একটু ব্যস্ত হইয়া "কে? কে?" বলিতে বলিতে বিছানায় উঠিয়া বসিল। আবদুল্লাহ্ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আসতে পারি, ভাই সাহেব?"

"আরে তুমি দুলা মিঞা? তুমি আসবে, তা ধরগে' তোমার আসতে পারি টারি আবার কেন?"

"কি জানি, নতুন ভাবী সাহেবা পাছে কিছু মনে করেন"— বলিতে বলিতে আবদুল্লাহ্ ঘরের ভিতর উঠিয়া আসিল।

"না, না, ও ধরগে' তোমার কি মনে ক'রবে—বরাবর তো ধরগে' তোমার দেখা দিয়ে এসেছে..."

এদিকে দরজা খোলা দেখিয়া গোলাপী এক দৌড়ে পলাইয়া গেল। আবদুল্লাহ্ কহিল, "ঐ দেখুন ভাই সাহেব, যা ব'লেছিলাম!"

আব্দুল মালেক এক গাল হাসিয়া কহিল, "হেঁ, হেঁ, তা এখন ধরগে' তোমার একটু লজ্জা ক'রবে বই কি? তোমার বড় ভাবী যখন তোমার দেখা দেন না, তখন ধরগে' তোমার..."

"তা তো বটেই, তা তো বটেই।" বলিতে বলিতে আবদুল্লাহ্ শয্যাপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। আব্দুল মালেক সজোরে তামাক টানিতে লাগিল।

আবদুল্লার ইচ্ছা হইতেছিল যে, একবার সেই চিঠিখানার কথা তুলিয়া আব্দুল মালেককে একটু ভর্ৎসনা করিয়া দেয়; কিন্তু আবার ভাবিল, তাহাতে কোন লাভ হইবে না। চিঠি খোলা যে কি দোষ, তাহা তো উহার ন্যায় কুশিক্ষিত কুসংস্কার-সম্পন্ন লোককে বুঝান যাইবেই না, বরং এই কথা লইয়া হয় তো একটা মন কষাকষির সূত্রপাত হইতে পারে। সুতরাং সে কথা মনে মনে চাপিয়া গিয়া আবদুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিল, "কর্তা কি আজ-কাল বাইরে আসেন?"

আব্দুল মালেক কহিল, "হ্যাঁ, আজ ক'দিন থেকে আসচেন একবার ক'রে।"

"কখন?"

"এই সকালেই। বাইরেই এসে নাশ্‌তা করেন। কেন, কোন কথা আছে নাকি?"

"আছে কিছু কথা।"

ঔৎসুক্যের ঝোঁকে বেশ একটুখানি চঞ্চলতা দেখাইয়া আব্দুল মালেক জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা, এ্যাঁ? কি কথা?"

"এমন কিছু না, এই কি ক'রব না ক'রব তারই পরামর্শের জন্য।"

"ও, তারি জন্যে!" বলিয়া আব্দুল মালেক একটুখানি সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া আবার সজোরে তামাক টানিতে লাগিল। দুই চারি টান দিয়াই সে আবার কহিল, "তা তোমাদের জাত-ব্যবসায় ধর না কেন?"

কথাটির ভিতরে আবদুল্লাহ্ বেশ একটুখানি শ্লেষের ইঙ্গিত অনুভব করিলেও সে মনোভাব চাপিয়া রাখিয়া কহিল, "নাঃ ওটা আমার ক'রবার ইচ্ছে নেই।"

"তবে কি কর'বে?"

এ প্রসঙ্গ লইয়া আর নাড়াচাড়া করিবার ইচ্ছা আবদুল্লার আদৌ ছিল না; তাই সে কহিল, "দেখি আমার শ্বশুর সাহেবের কি মত হয়।"

আবদুল মালেক একটা "হুঁ" বলিয়া পুনরায় পেচোয়ানে মনোনিবেশ করিল এবং খুব জোরের সহিত টান দিতে লাগি। অবশেষে একটি সুদীর্ঘ 'সুখটান' দিয়া গাল-ভরা ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে কহিল, "এইবারে উঠি, মুখ-হাত ধুয়ে নিই। কি জানি ধরগে' তোমার আব্বা যদি বৈঠকখানায় এসে পড়েন, তবে এক্ষুণি নাশ্‌তার ডাক প'ড়বে।"

নলটি বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া আবদুল মালেক নামিয়া পড়িল। আবদুল্লাও তাহার সঙ্গে উঠিয়া বাহিরে আসিল এবং বৈঠকখানার দিকে চলিয়া গেল।

বৈঠকখানার এক প্রান্তে তখন বাটীর পারিবারিক মক্তব বসিয়া গিয়াছে। একখানি বড় অনতিউচ্চ চৌকির উপর কম্বল পাতা; তাহারই উপর বসিয়া পূর্বাঞ্চল-নিবাসী বৃদ্ধ মৌলবী সাহেব আরবী, ফারসী এবং উর্দু 'সবকের' রাশিতে ছোট ছোট ছেলেদের মাথা 'ভরাট' করিয়া দিতেছেন। বাটীর ছোট ও মাঝারী পাঁচ-ছয়টি এবং প্রতিবেশীদিগের মাঝারী ও বড় আট-দশটি ছেলে সুরে-বেসুরে 'সবক' ইয়াদ করিতে লাগিয়া গিয়াছে। বাড়ীর ছেলেগুলি মৌলবী সাহেবের সহিত একাসনে বসিয়াছে, কিন্তু অপর সকলকে কম্বলের সমুখে মেঝের উপর মাদুর পাতিয়া বসিতে হইয়াছে।

মৌলবী সাহেব প্রত্যহ এখানে বসিয়া এই ক্ষুদ্র মক্তবটি চালাইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহাকে বৈকালে আরও একটি ক্ষুদ্র বালিকা মক্তব চালাইতে হয়। যে ঘরটিতে আবদুল খালেক আজকাল অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন, সেটি একটু নিরালা জায়গায় বলিয়া বাড়ীর খুব ছোট ছোট মেয়েরা সেইখানে বসিয়া মৌলবী সাহেবের নিকট 'সবক' গ্রহণ করে। এই জন্য বহির্বাটীর অপর কোন পুরুষের সেখানে গতিবিধি একেবারে নিষিদ্ধ। মৌলবী সাহেব একে বৃদ্ধ, তাহাতে বহুকাল যাবৎ এ বাটীতে বাস করিয়া একণে একরূপ বাটীর লোকের মধ্যেই গণ্য হইয়া উঠিয়াছেন বলিয়া আট বৎসরের অধিক বয়স্কা বালিকাদিগকে 'সবক' দিবার অধিকারটুকু প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরম 'দীনদার' লোক বলিয়া সকলেই এমন কি খোদ সৈয়দ সাহেব পর্যন্ত তাঁহার খাতির করেন।

আবদুল্লাহ্ বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া "আস্‌সালামু আলায়কুম" বলিয়া মৌলবী সাহেবকে সম্ভাষণ করিল। মৌলবী সাহেব তাড়াতাড়ি উঠিয়া 'ওআলায় কুম সালাম' বলিয়া প্রতি-সম্ভাষণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বালকেরাও দাঁড়াইয়া উঠিয়া সমস্বরে ওস্তাদজীর অনুকরণে অভ্যাগতের সম্বর্ধনা করিল। অতঃপর মৌলবীসাহেব আবদুল্লার সহিত মোসাফা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কবে আসলেন দুল্‌হা মিয়া? তবীয়ত বালো তো?"

"এই কাল সন্ধ্যাবেলায় এসেছি। ভালই আছি। আপনি কেমন আছেন, মৌলবী সাহেব?"

"বালোই! হুনলাম আপনার ওয়ালেদ সাহেব এন্তেকাল ফরমাইছেন?"

"জি হাঁ।"

"আচানক? খি বেমারি আসর খরছিল তানিরে?"

"এই জ্বর, আর কি?"

মৌলবী সাহেব তাঁহার সুদীর্ঘ শ্বেত শুভ্ররাজির মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে গভীর দুঃখ ও সহানুভূতির সুরে কহিলেন, "আহা বরো নেক বান্দা আছিলেন তিনি। আমারে বরো বালা জানতেন। এ বারি আইলেই আমার লগে এক বেলা বইস্যা আলাপ না কইর‍্যা যাইতেন না।"

এদিকে বালকগুলি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া ইহাদের আলাপ শুনিতেছিল। হঠাৎ সেদিকে মৌলবী সাহেবের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি ধমক দিয়া কহিলেন, "বহ, বহ, তরা সবক পর। বইঅ্যান, দুলহা মিঞা, খারাইয়া রইল্যান ক্যান?"

আবদুল্লাহ্ কম্বলের উপর উঠিয়া বসিল, মৌলবী সাহেবও তাহার পার্শ্বে বসিলেন। ওদিকে বালকের দল আরবী, ফারসী এবং উর্দুর যুগপৎ আবৃত্তির অদ্ভুত সম্মিলিত কলরবে বৈঠকখানাটি মুখরিত করিয়া তুলিল।

আবদুল্লাহ্ কিছুক্ষণ মনোযোগের সহিত উহাদের পাঠ শ্রবণ করিল। পরে কে কি কেতাব পড়ে, কোন্ ছেলেটি কেমন, ইত্যাদি বিষয় মৌলবী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বাড়ীর ছেলেগুলি বয়সে ছোট হইলেও, অপর ছেলেদের অপেক্ষা অনেক বেশী পড়িয়া ফেলিয়াছে দেখিয়া আবদুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিল, "ও বেচারারা এত পিছনে পড়ে আছে কেন, মৌলবী সাহেব?"

মৌলবী নিতান্ত অবজ্ঞাভরে কহিলেন, "অঃ, অরা? তারা আর খি খর্‌তাম্ পারে? অরগো কি জেহেন আছে দুল্‌হা মিয়া সাব! বচ্ছর বচ্ছর 'খায়দা বোগ্‌দাদী' আর 'আম্ ফারা' গ্যাঁগোর গ্যাঁগোর খর্‌তে আছে। সবক এয়াদই খরতাম্ ফারে না......"

"আচ্ছা দেখি" বলিয়া আবদুল্লাহ্ উঠিয়া উহাদের নিকটে গিয়া দুই একটি বালককে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। দেখিল, উহারা যে সবকটুকু পাইয়াছে, সেটুকু মন্দ শিখে নাই। নানারূপ জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া আবদুল্লাহ্ বুঝিতে পারিল যে, ইহারা বহুদিন অন্তর নূতন সবক পাইয়া থাকে; তাও যেটুকু পায়, সে অতি সামান্য। এই হতভাগ্য বালকগুলি ওস্তাদজীর চেষ্টাকৃত অবহেলায় মারা যাইতেছে দেখিয়া আবদুল্লাহ্ উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওদের বুঝি রীতিমত সবক দেন না মৌলবী সাহেব?"

মৌলবী সাহেব চট্ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দিমু না কিয়েল্লাই? ইয়াদ খরতাম্ ফারে না তো!"

আবদুল্লাহ্ প্রতিবাদ করিল, "কেন পারবে না, মৌলবী সাহেব আমি তো যে কয়টাকে দেখ্‌লাম, তারা তো কয়েকটা 'সূরা' বেশ শিখেছে!

বৃদ্ধ একটু চঞ্চল হইয়া কহিলেন, "হঃ, যে ইয়াদ খরতাম্ ফারে, হে ফারে। আর হগ্‌গোলে ফারে চাঁখার পারবার! আয় তো দেহি কলিমুদ্দী তর সবক লইয়া..."

কলিমুদ্দীন নামক একটি দশ কি এগার বৎসরের ছেলে 'আম্ পারা' ও 'পান্দেনামা' হাতে লইয়া মাদুরাসন হইতে উঠিয়া আসিল। মৌলবী সাহেব তাহাকে আদেশ করিলেন, "ক'ত দেহি, খয়ডা সুরা ইয়াদ খরছস্?"

বালকটি গড় গড় করিয়া অনেকগুলি সুরা মুখস্থ বলিয়া গেল। পরে আবদুল্লার নির্দেশক্রমে পান্দেনামা হইতেও কয়েকটি বয়েত আবৃত্তি করিল। ছেলেটি মেধাবী বলিয়া মৌলবী সাহেব যে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারেন নাই, তাহা বেশ বুঝা গেল?

আবদুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিল, "ওরা ও-সবের মানে টানে কিছু বোঝে?"

মৌলবী সাহেব দারুণ তাচ্ছিল্যের সহিত কহিলেন, "হাঃ, মানি বুজ্‌বো! হেজ্জে মতনই খরতে মুণ্ডু গুইর‍্যা যায় তা আবার মানি বুজ্‌বো! খি বা খন, দুল্‌হা মিয়া! ইয়ার মইদ্দে আরো খতা আছে দুল্‌হা মিয়া বোজলেন? খতা আছে!" বলিয়া মৌলবী সাহেব গূঢ়ার্থসূচক ভঙ্গী সহকারে মস্তক সঞ্চালন করিলেন।

আবদুল্লাহ্ কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা, মৌলবী সাহেব?"

কলিমুদ্দীন তাঁহাদের সম্মুখে এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল। মৌলবী সাহেব তাহাকে এক ধমক দিয়া কহিলেন, "যা-যাঃ—সবক ইয়াদ খর গিয়া..." তাড়া খাইয়া বেচারা গিয়া স্বস্থানে বসিয়া আবার অপরাপর বালকগণের সহিত কলরবে যোগদান করিল।

মৌলবী সাহেব আবদুল্লার আরো কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "খতাডা খি, বোজ্‌লেন, নি দুল্‌হা মিয়া? অরা আইলো গিয়া আতরাফগোর ফোলাফান, অরা এই সব মিয়াগোরের হমান হমান চল্‌তাম্ ফারে? অরগো জিয়াদা সবক দেওয়া মানা আছে, বোজ্‌লেন, নি?"

"কার মানা?"

"খোদ সা'বের! তিনি আইস্যা দহ্‌লিজে বইস্যা হুনেন খারে খি সবক দি না দি।"

এতক্ষণে আবদুল্লাহ্ এই পাঠদান-কৃপণতার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইল। পাছে প্রতিবেশী সাধারণ লোকের ছেলেরা নিজের ছেলেদের অপেক্ষা বেশী বিদ্যা উপার্জন করিয়া বসে, সেই ভয়ে তাহার শ্বশুর এইরূপ বিধান করিয়াছেন। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তা ওদের প'ড়তে আস্‌তে দেন কেন? একেবারেই যদি ওদের না পড়ান হয়, সেই ভাল নয় কি?"

এই কথায় মৌলবী সাহেবের হৃদয়ে করুণা উথলিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "অহঃ, হেডো কাম ভাল অয় না, দুল্‌হা মিয়া! গরীব তালবেলম হিক্‌বার চায়, এক্কেকালে নৈরাশ করলে খোদার কাছে কি জবাব দিমু? গোমরারে এলেম দেওয়া বহুৎ সওয়াব আছে কেতাবে ল্যাহে।"

মৌলবী সাহেবের কেতাবের জ্ঞানের বহর এবং তাহার প্রয়োগের প্রণালী দেখিয়া আবদুল্লাহ্ মনে মনে যথেষ্ট কৌতুক অনুভব করিতেছিল, এমন সময় কর্তা সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস সাহেব ধীরে ধীরে লাঠি ভর করিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন।

১২

সৈয়দ সাহেবকে আসিতে দেখিয়া সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। আবদুল্লাহ্ একটুখানি মাথা নোয়াইয়া আদাব করিল, কিন্তু মৌলবী সাহেব পরম সম্ভ্রমে আভূমি অবনত হইয়া তাঁহাকে আদাব করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হুযুরের তবিয়ত বালা তো?"

সৈয়দ সাহেব উভয়ের আদাব গ্রহণ করিয়া, বৈঠকখানার অপর প্রান্তস্থ প্রশস্ত ফর্‌শের উপর উঠিয়া বসিতে বসিতে একটু ক্ষীণস্বরে কহিলেন—"হ্যাঁ, এক রকম ভালই, তবে কমজোরীটা যাচ্ছে না,..."

মৌলবী সাহেব সহানুভূতির ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন,—"অহঃ, হুযুর যে বেমারী কাটাইয়া উঠ্‌ছেন, তাই খোদার কাছে শোকর করন লাগে। খুম্‌জুরী ত অইবই! তা অডা যাইব গিয়া খাইতে লইতে।"

সৈয়দ সাহেব জামাতার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"এস বাবা, বস।"

আবদুল্লাহ্ বড় ফর্‌শের উপর উঠিয়া বসিল। মৌলবী সাহেব তাঁহার ছাত্রদিগের নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং ছাত্রেরা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত দুলিয়া দুলিয়া "সবক ইয়াদ" করিতে লাগিল।

শ্বশুরকে একাকী পাইয়া আবদুল্লাহ্ তাহার পড়া-শুনার কথা বলিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। কি বলিয়া কথাটি তুলিবে, মনে মনে তাহারই আলোচনা করিতেছিল, এমন সময় তাহার শ্বশুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তা, এখন কি ক'রবে ট'রবে কিছু ঠিক করেছ, বাবা?"

শ্বশুর আপনা হইতেই কথাটি পাড়িবার পথ করিয়া দিলেন দেখিয়া সোৎসাহে আবদুল্লাহ্ কহিল, "জি, এখনও কিছু ঠিক ক'রতে পারি নি; তবে পরীক্ষেটার আর ক'মাস মাত্র আছে, এ কটা মাস প'ড়তে পাল্লে বোধ হয় পাশ করতে পারতাম..."

"তা বেশ তো! পড় না হয়..."

"কিন্তু খরচ চালাব কেমন ক'রে তাই ভাব্‌ছি। হুজুর যদি মেহেরবানি ক'রে একটু সাহায্য করেন..."

বাধা দিয়া শ্বশুর বলিয়া উঠিলেন,—"হেঃ হেঃ আমি! আমি কি সাহায্য ক'রব?"

"এই কটা মাসের খরচের অভাবে আমার পড়াটা বন্ধ হয়। সামান্যই খরচ, হুযুর যদি চালিয়ে দিতেন, তো আমার বড্ড উপকার হ'ত..."

"আমি কোথা থেকে দেব? আবার এখন এমন টানাটানি যে তা বলবার নয়। মস্‌জিদটার জন্য ক'বছর ধরে মাথা খুঁড়ে যদি বা শুরু ক'রে দিয়েছিলাম, তা এখনও শেষ ক'রতে পারলাম না। এবারে ব্যারামে পড়ে ভেবেছিলাম, বুঝি খোদা আমার কেসমতে ওটা লেখেন নি! তাড়াতাড়ি 'আকামত' ক'রে নামায শুরু করিয়ে দিলাম; কিন্তু কাজটা শেষ ক'রতে এখনও ঢের টাকা লাগ্‌বে। কোথা থেকে কি ক'রব ভেবে ভেবে বেচায়েন হ'য়ে পড়েছি। এখন এক খোদাই ভরসা, বাবা, তিনি যদি জুটিয়ে দেন, তবে মসজিদ শেষ ক'রে যেতে পারব। কিন্তু এখন আমার এমন সাধ্যি নেই যে তোমাকে সাহায্য করি।"

আবদুল্লাহ্ অত্যন্ত দুঃখের সহিত কহিল,—"তা হ'লে আর আমার পড়া-শুনা হয় না, দেখ্‌ছি!"

শ্বশুর একটু সান্ত্বনার ও সহানুভূতির সুরে কহিলেন,—"তা আর কি ক'রবে, বাবা, খোদা যার কেসমতে যা মাপান, তার বেশী কি সে পায়? সকল অবস্থাতেই 'শোকর গোজারী' ক'রতে হয়, বাবা,! সবই খোদাতা'লার মর্জ্জি! আর তা ছাড়া এতে তো তোমার ভালই হবে, আমি

দেখছি; তোমাকে ইংরেজী পড়তে দিয়ে তোমার বাপ বড্ডই ভুল ক'রেছিলেন,—এখন বুঝে দেখ, বাবা, খোদাতা'লার ইচ্ছে নয় যে তুমি ওই বেদীনী লোভে প'ড়ে দীনদারী ভুলে যাও। তাই তোমার ও-পথ বন্ধ ক'রেছেন তিনি! তোমরা পীরের গোষ্ঠী, তোমাদের ও-সব চা'ল-চলন সইবে কেন, বাবা? ও-সব দুনিয়াদারী খেয়াল ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে দিনদারীর দিকে মন দাও, দেখবে খোদা সব দিক থেকে তোমার ভাল ক'রবেন—"

আবদুল্লাহ্ তাহার শ্বশুরের এই দীর্ঘ বক্তৃতায় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল। সে একটু বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে তো পয়সা রোজগার কর্তে হবে..."

শ্বশুর বলিলেন,—"কেন তোমার বাপ-দাদারা সংসার চালিয়ে যান্ নি? তাঁরা যেমন দীনদারী বজায় রেখেও সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসার ক'রে গেছেন, তোমরা "এলে-বিয়ে" পাশ ক'রেও তেমন পারবে না। আর লোকের কাছে কত মান-সম্ভ্রম..."

"তাঁরা যে কাজ ক'রে গেছেন, আমার ওকাজে মন যায় না!"

শ্বশুর একটু বিরক্তির স্বরে কহিলেন,—"ঐ তো তোমাদের দোষ। সাধে কি আমি ইংরেজী পড়তে মানা করি? ইংরেজী প'ড়লে লোকের আর দীনদারীর দিকে কিছুতেই মন যায় না—কেবল খেয়াল দৌড়ায় দুনিয়াদারীর দিকে—খালি পয়সা, পয়সা। আর তাও বলি, তোমার বাপ খোন্দকারী ক'রেও তো খাসা পয়সা রোজগার ক'রে গেছেন, তোমার পেছনেও কম টাকাটা ওড়ান্ নি! যদি একটা ভাল কাজে টাকাগুলো খরচ ক'রতেন, তাও না হয় বুঝ্তাম, নিজের 'আকবতে'র কাজ ক'রে গেলেন। নাহক টাকাটা উড়িয়ে দিলেন, না নিজের কোন কাজে লাগ্‌ল, না তোমাদের কোন উপকার হ'ল! আজ সে টাকাটা যদি রেখেও যেতেন তা হ'লে তোমাদের আর ভাবনা কি ছিল?"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"আমাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে আব্বা যে টাকাটা খরচ ক'রেছেন, অবিশ্যি তাতে তাঁর নিজের আক্‌বতের কোন উপকার হ'য়েছে কি না তা বলতে পারিনে, কিন্তু আমার যে তিনি উপকার ক'রে গেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি পড়া শেষ ক'রতে পারতাম, তা হ'লে তো কথাই ছিল না; সেই জন্যেই আপনার কাছে কিছু সাহায্য চাইতে এসেছিলাম। তা যাক্, এখনও খোদার ফযলে চাক্‌রী ক'রে যা রোজগার ক'রতে পারব, তাতে সংসারের টানাটানিটা তো অন্ততঃ ঘুচবে। আব্বা তো চিরকাল টানাটানির মধ্যেই কাটিয়ে গেছেন..."

শ্বশুর বাধা দিয়া কহিলেন,—"সে তাঁরই দোষ; দু'-ঘর মুরীদান যাতে বাড়ে-সেদিকে তো তাঁর কোনই চেষ্টা ছিল না। তুমি বাপু যদি একটু চেষ্টা কর, তবে তোমার দাদা পর-দাদার নামের বরকতে এখনও হাজার ঘর মুরীদান যোগাড় ক'রে নিতে পার। তা হ'লে আর তোমার ভাবনা কি? নবাবী হালে দিন গুজরান ক'রতে পারবে—ও শত চাকরীতেও তেমনটি হবে না আমি বলে রাখলুম বাপু!"

ইহার উপর আবদুল্লার কোন কথা বলিতে ইচ্ছা হইল না; সে চুপ করিয়া ঘাড় নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া শ্বশুর আবার কহিলেন,—"কি বল?"

"জি নাঃ, ও-কাজ আমার দ্বারা হবে না—!"

সৈয়দ সাহেব একটু রুষ্ট হইয়া কহিলেন,—"তোমরা যে সব ইংরেজী কেতাব প'ড়েছ, তাতে তো আর মুরুব্বীদের কথা মানতে শেখায় না। যা খুশী তোমরা কর গিয়ে বাবা, আমরা আর ক'দিন! ছেলে তো একটা গেছে বিগ্‌ড়ে, তাকেই যখন পথে আন্‌তে পারলাম না, তখন তুমি তো জামাই, তোমাকে আর কি ব'লব বাবা!"

আবদুল্লাহ্ আর কোন কথাই কহিল না। এদিকে খোদা নেওয়াজ নাশ্‌তা লইয়া আসিল। আবদুল মালেকের ডাক পড়িল। তিনি আসিলে মৌলবী সাহেব তাঁহার ফর্‌শী ছাত্রগণকে সঙ্গে লইয়া 'দস্তরখানে' বসিয়া গেলেন। অপর ছাত্রেরা মাদুরের উপর বসিয়া গুন্ গুন্ করিয়া 'সবক ইয়াদ' করিতে লাগিল বটে, কিন্তু বেচারাদের এক চোখ্ কেতাবের দিকে থাকিলেও আর এক চোখ্ অদূরবর্তী দস্তরখানটির দিকে ক্ষণে ক্ষণে নিবদ্ধ হইতে লাগিল।

নাশ্‌তা শেষ হইতে হইতেই একজন চাকর আসিয়া সংবাদ দিল যে, "পশ্চিমপাড়ার ভোলানাথ সরকার মহাশয় আরও একজন লোক সঙ্গে করিয়া সৈয়দ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। সৈয়দ সাহেব ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কহিলেন,—"নিয়ে আয়, নিয়ে আয় ওঁদের!"

ভোলানাথ এবং তাঁহার অনুচরবর্গ বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতেই সৈয়দ সাহেব তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য 'আস্‌তে আজ্ঞা হোক্‌, আস্‌তে আজ্ঞা হোক্‌," বলিতে বলিতে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিতে যাইতেছিলেন ; কিন্তু ভোলানাথ কহিলেন,—"থাক্‌ থাক্‌, উঠ্‌বেন না, আপনি কাহিল মানুষ—আমরা এই বস্‌ছি—"বলিয়া তাঁহারা ফরশের এক প্রান্তে উঠিয়া বসিলেন। সৈয়দ সাহেব তাঁহাদের নিকটে সরিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তারপর, সরকার মশায়, খবর ভাল তো?"

সরকার মহাশয় পরম বিনয়ের সহিত কহিলেন,—"হ্যাঁ, আপনার দোওয়াতে খবর সব ভাল। আপনার শরীর-গতিক আজ কাল কেমন?"

সৈয়দ সাহেব একটু কাতরোক্তির সহিত কহিলেন, "আর মশায় এ বয়সে আবার শরীর গতিক! বেঁচে আছি, সেই ঢের। জ্বরটায় বড্ড কাহিল ক'রে ফেলেছে..."

সরকার মহাশয় কহিলেন,—"তাই তো। আপনার চেহারাও বড্ড রোগা হয়ে গেছে—তা আপনার বয়েসই বা এমন কি হয়েছে, দু-চার দিনেই সেরে উঠ্‌বেন এখন।"

সৈয়দ সাহেব বলিলেন,—"হ্যাঁ, বয়েসে তো আপনি আমার কিছু বড় হবেন; কিন্তু আপনার শরীরটা বেশ আছে—আমি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছি।"

ভোলানাথ একটু হাসিয়া কহিলেন,—"আমাদের কথা আর কি ব'লছেন, সৈয়দ সাহেব—খাটুনীর শরীর, একটু মজবুত না হ'লে চলে না যে! আপনাদের সুখের শরীর কিনা, অল্পেই কাহিল হ'য়ে পড়েন। মনে ক'রবেন ওটা কিছু না, তা হ'লে দু'দিনেই তাজা হ'য়ে উঠবেন।"

সরকার মহাশয়ের সঙ্গে একটি যুবকও আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আবদুল কুদ্দুস জিজ্ঞাসা করিলেন—"এটি কে, সরকার মশায়?"

"এটি আমার কনিষ্ঠ পুত্র হরনাথ। এম্‌-এ পাশ করেছে, এখন আইন প'ড়ছে,—হরে, সৈয়দ সহেবকে সেলাম কর বাবা, এরা হ'চ্ছেন আমাদের মনিব!"

হরনাথ মাথা নোয়াইয়া সালাম করিলে সৈয়দ সাহেব কহিলেন,—"বেঁচে থাক, বাবা!" তারপর ভোলানাথের দিকে চাহিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার বড় ছেলেরা সব কোথায়?"

"তারা সব নিজের নিজের চাকরীস্থানে—বড়টি রাজশাহীতে—মেজটি বাঁকুড়ায়, আর সেজটি আছে কটকে।"

"বড়টি ডিপুটি হয়েছে, না?"

"আজ্ঞে না, সে মুন্‌সেফ, মেজটি ডিপুটি হ'য়েছে আর সেজটি ডাক্তার।"

"বেশ বেশ, বড় সুখের কথা। আপনাদের উন্নতি দেখলে চোখ জুড়ায়, সরকার মশায়।"

"এ সব আপনাদেরই দোওয়াতে!"

"তা ছোটটিকে কি চাকরীতে দেবেন ঠিক ক'রেছেন?"

"না, ওকে চাকরীতে দেবো না—আর ওরও ইচ্ছে নয় যে চাকরী করে। আইন পাশ ক'রে ওকালতী ক'রবে।"

সৈয়দ সাহেব কহিলেন—"তা বেশ, বেশ! ওকালতী ক'রবেন উনি সে তো খুব ভাল কথা!—যত সব বাজে লোকের কাছে যেতে হয় মালিমোকদ্দমা নিয়ে, একজন ঘরের ছেলে উকীল হ'লে তো আমাদেরও সুবিধে—কি বলেন সরকার মশায়!"

সরকার মহাশয় সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন,—তা তো বটেই, তা তো বটেই—হারু তো আপনাদের ঘরের ছেলের মতই—ওর বাপ দাদা তো আপনাদের খেয়েই মানুষ।"

সৈয়দ সাহেব "হে হে হে" করিয়া একটু হাস্য করিলেন। এমন সময় অন্দর হইতে এক 'তশ্‌তরী' ছেঁচা পান এবং এক বাটা খিলি আসিল। সৈয়দ সাহেবের কয়েকটি দাঁত পড়িয়া গিয়াছে এবং অবশিষ্টের অনেকগুলি নোটিশ দিয়াছে ; তাই তিনি খিলিগুলি অভ্যাগতগণের দিকে বাড়াইয়া দিয়া চামচে করিযা ছেঁচা পান তুলিয়া তুলিয়া খাইতে লাগিলেন এবং তামাকের হুকুম করিলেন।

ভোলানাথ পান চিবাইতে চিবাইতে কহিলেন, "আজ আপনার কাছে একটা দরবার নিয়ে এসেছিলাম, তা যদি মেহেরবানি ক'রে শোনেন তো..."

সৈয়দ সাহেব ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"সে কি! সে কি! আমার কাছে আবার 'দরবার' কি রকম!"

"দরবার বই কি। একটা লোক—আমারই একজন আত্মীয়—মারা যায়, এখন আপনার দয়ার উপরই তার জীবন-মরণ!"

"কথাটা কি সরকার মশায়, খুলেই বলুন না। আমার যা সাধ্য থাকে, তা আমি ক'রব।"

ভোলানাথের নায়েব রতিকান্ত বলিয়া উঠিল, সাধ্যের কথা কি ব'লছেন, হুযুর! আপনার একটা মুখের কথার উপরেই সব নির্ভব ক'রছে!"

ভোলানাথ কহিতে লাগিলেন,—"বল্‌ছিলাম ঐ মহেশ বোসের কথা..."

আবদুল কুদ্দুস জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ মহেশ বোস?"

"আপনারই তহশীলদার সে..."

"ওঃ, তারি কথা বলছেন? কেন কি হ'য়েছে?"

ভোলানাথ দেখিলেন, সৈয়দ সাহেব তাঁহার বিষয়-আশয় সম্বন্ধে বড় একটা খবর রাখেন না। আগেও এ-কথা তিনি জানিতেন, তবে এখন তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়া ভাবিলেন, তাঁহার কাজ হাসিল করিতে বড় বেগ পাইতে হইবে না। তিনি কহিলেন,—"কথাটা এত সামান্য যে, হয় তো সেটা আপনার নজরেই পড়েনি,—কিন্তু সামান্য হ'লেও বেচারা গরীবের পক্ষে একেবারে মারা যাওয়ার কথা..."

সৈয়দ সাহেবের ঔৎসুক্য চরম মাত্রায় চড়িয়া উঠিল। তিনি একটু অসহিষ্ণু হইয়া কহিলেন,—"আসল কথাটা কি, তাই বলুন না, সরকার মশায়!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই ব'ল্‌ছি। কথাটা কি,—বেচারার তহবিল থেকে কিছু টাকা খো গেছে..."

"খোআ গেছে? কত টাকা?"

"বেশী নয়, এই শ'-আষ্টেক আন্দাজ হবে..."

"কেমন ক'রে খোআ গেল?"

"তা সে নিজেই বুঝতে পাচ্ছে না, সৈয়দ সাহেব! গেল চোৎ মাসে হিসেব মিলাবার সময় ওটা ধরা পড়ল—একটা মাস অনেক করে উল্টে পাল্টে দেখ্‌লে কিছুতেই টাকাটার মিল হ'লো না ; ...এখন বেচারা একেবারে পাগলের মত হয়ে গেছে..."

সৈয়দ সাহেব বলিয়া উঠিলেন,—"ওরে কে আছিস্, মহেশকে ডাক্ তো।"

ভোলানাথ কহিতে লাগিলেন,—"আপনি দয়া না করলে বেচারার আর কোন উপায় নাই। অনেকগুলো পুষ্যি, না খেয়েই মারা যাবে!"

"আচ্ছা, দেখি!"

রতিকান্ত কহিতে লাগিল,—"হুযুর একটি মুখের কথা ব'ললেই বেচারা মাফ পেয়ে যায়—ও কটা টাকা তো হুযুরদের নখের ময়লা বই তো নয়।"

সৈয়দ সাহেব কহিলেন,—"আচ্ছা দেখি।"

মহেশ গলার চাদরখানি দুইটি হাত জোড় করিয়া ধরিয়া ঘরের ভিতর আসিল এবং আভূমি নত হইয়া সকলকে সালাম করিল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ওসমান আলী নামক সৈয়দ সাহেবের অপর একজন গোমস্তা খাতা-পত্র লইয়া প্রবেশ করিল।

সৈয়দ সাহেব ওসমানকে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞেস করিলেন,—"তুমি কি চাও।"

ওসমান কহিল,—"হুযুর আমি মহেশের তহবীলের গরমিলটা ধ'রেছিলাম কি না, তাই—"

সৈয়দ সাহেব ক্রোধভরে কহিলেন,—" তোমাকে কে আসৃতে বল্লে ; যাও..."

ওসৃমান বেচারা বে-ওকুফ হইয়া খাতাপত্র রাখিয়া চলিয়া গেল। অতঃপর সৈয়দ সাহেব মহেশকে কহিলেন,—"কই দেখি, কোথায় গরমিল হ'চ্চে?"

মহেশ কম্পিত হস্তে হিসাবের খাতা খুলিয়া দেখাইতে লাগিল এবং ক্রন্দনের সুরে কহিতে লাগিল,—"হুযুর, কেমন ক'রে এ টাকাটা যে কোথায় গেল তা আমি কিছুই ভেবে ঠিক্ ক'র্তে পাচ্ছিনে—এখন আপনি মাফ না ক'র্লে একেবারেই মারা পড়ি—"বলিয়া সৈয়দ সাহেবের পা ধরিতে গেল।"

"আরে কর কি, কর কি" বলিয়া সৈয়দ সাহেব পা টানিয়া লইলেন এবং কহিলেন,—"আচ্ছা যাও, ও টাকা আমি তোমাকে মাফ ক'রে দিচ্ছি—আয়েন্দা একটু সাবধানে কাজ-কর্ম ক'রো।"

ভোলানাথ কহিলেন,—"সে কি আর বল্‌তে ; এবার ওর যা শিক্ষা হল—কেবল আপনার দয়াতে পরিত্রাণ পেলে। এতে ওর যথেষ্ট চৈতন্য হবে।"

সৈয়দ সাহেব হিসাবের খাতায় "মাফ করা গেল" লিখিয়া ফার্সিতে এক খোঁচায় নিজের নাম দস্তখত করিয়া খাতাটা ছাড়িয়া দিলেন। মহেশ এক সুদীর্ঘ সালাম বজাইয়া খাতা-পত্র লইয়া চলিয়া গেল।

রতিকান্ত কহিতে লাগিল,—"হুযুররা বাদশার জাত কি না, নইলে এমন উঁচু নজর কি যার তার হয়? এঁদের পূর্বপুরুষদের কথা শুনিছি, তাঁদের কাছে কেউ কোন দিন আশা ক'রে নিরাশ হয়নি! এই যে একবালপুরে যত তালুকদার টালুকদার আছে, সমস্তই তো এই বংশেরই দান পেয়ে আজ দু'মুঠো খাচ্ছে!"

ভোলানাথ কহিলেন,—"তাতে আর সন্দেহ! এ অঞ্চলে এঁরাই তো বুনিয়াদী জমিদার, আর সকলে এঁদেরই খেয়ে মানুষ। যেমন ঘর তেমনি ব্যাভার। ভগবান যাঁরে দ্যান, তাঁর নজরটাও তেমনি উঁচু ক'রে দ্যান কি না।"

এমন সময় একটি চাকর আবদুল মালেকের একটি শিশু পুত্র কোলে লইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল এবং শিশুটিকে ফরশের উপর নামাইয়া দিয়া কলিকাটি পেচোয়ানের মাথায় বসাইয়া দিল।

সৈয়দ সাহেব কহিলেন,—"ওরে, আর একটা কল্কে নিয়ে আয় না। আর বাবুদের হুঁকোটা আন্‌লিনে..."

ভোলানাথ কহিলেন,—"থাক্, বেলা হ'য়ে উঠল, আমরা এখন উঠি।"

সৈয়দ সাহেব বাধা দিয়া কহিলেন,—"না, না, একটু বসুন—ওরে, আর কল্কের কাজ নেই ; এতেই হবে, কেবল হুঁকোটা নিয়ে আয়।"

চাকর একটা শুক্‌না নারিকেলী হুঁকা আনিয়া ভোলানাথের হাতে দিল। সৈয়দ সাহেব স্বহস্তে পেচোয়ানের মাথা হইতে কলিকাটা তুলিয়া তাঁহাকে দিতে গেলেন।

ভোলানাথ "না, না, না, থাক্ থাক্ আমি নিচ্ছি" বলিয়া একটু অগ্রসর হইয়া কলিকাটি লইলেন এবং ধূমপান করিবার জন্য বাহিরে যাইবার উদ্দেশ্যে ফর্‌শ হইতে নামিয়া পড়িলেন।

সৈয়দ সাহেব কহিলেন,—"ওকি, উঠ্‌লেন যে ; এই খানেই ব'সে তামাকটা খান না, সরকার মশায়!"

সরকার মহাশয় কহিলেন,—"না, না, তাও কি হয়! আপনারা হ'চ্ছেন গিয়ে আমাদের মনিব! বলিয়া তিনি বারান্দায় গিয়া শুষ্ক হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন।"

এদিকে আবদুল মালেকের শিশু পুত্রটি আসিয়া তাহার দাদা-জানের ক্রোড় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। দাদা-জান পান খাইতেছেন দেখিয়া সে "আমাকে দাদা-জান" বলিয়া পক্ষী-শাবকের ন্যায় হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল। পান তখন প্রায় ফুরাইয়াছে—কাজেই

দাদা-জান আর কি করিবেন, নড়ানড়া দাঁতগুলির ফাঁকে যাহা কিছু লাগিয়াছিল, তাহাই জিভ দিয়া টানিয়া টানিয়া খানিকটা লাল থুথুর সহিত মিশাইয়া মুখে টানিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া হরনাথ মুখখানি অত্যন্ত বিকৃত করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া রহিল।

তামাক খাওয়া হইলে ভোলানাথ বৈঠকখানায় পুনঃ প্রবেশ করিলেন এবং কলিকাটি যথাস্থানে প্রত্যর্পণ করিয়া বিদায় লইলেন।

১৪

বৈকালে একটু বেড়াইতে যাইবে মনে করিয়া আবদুল্লাহ্ আবদুল মালেকের সন্ধানে তাহার'মহলে' গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু দেখিল সে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে এবং গৃহের অপর পার্শ্বে বৃদ্ধ মৌলবী সাহেব তাঁহার দুই-তিনটি ছাত্রী লইয়া নিম্নস্বরে সবক দিতেছেন। আবদুল্লাহ্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ইনি ওঠেন কখন?"

মৌলবী সাহেব কহিলেন,—"অঃ, আসরের আগে উঠ্‌তানইন্ না—গুমানের বাতে বড় মিয়া সাব এক্কালে সব্‌কত্ লইছেন" বলিয়া তিনি মৃদু হাস্য করিলেন।

অগত্যা আবদুল্লাহ্ একেলাই বেড়াইতে বাহির হইল। সৈয়দ সাহেবের বিস্তীর্ণ বাগানটির পশ্চাতেই আবদুল খালেকদের বৃহৎ পুষ্করিণী। তাহার ওপারে তাহাদের পুরাতন মসজিদটি মেরামতের দরুন তক্-তক্ করিতেছে দেখিয়া আবদুল্লাহ্ ভাবিল, "যাই একবার দেখিয়া আসি।"

বাগানের পথটি ধরিয়া, পুষ্করিণীর তীর দিয়া আবদুল্লাহ্ মসজিদের ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইল। সিঁড়ির উপর আবদুল খালেকের দশমবর্ষীয় পুত্র আবদুস্ সামাদ একাগ্রচিত্তে বসিয়া মাছ ধরিতেছিল, কেহ যে আসিয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া আছে তাহা সে টের পায় নাই। আবদুল্লাহ্ কহিল,—"কিরে, সামু, কটা মাছ পেলি!"

হঠাৎ ডাকে সামু ওরফে আবদুস্ সামাদ চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল এবং "বাঃ। চাচাজান! কখন এলেন?" বলিয়া ছিপ ফেলিয়া উঠিয়া আসিয়া আবদুল্লার 'কদমবুসি' (পদচুম্বন) করিল।

"এই কাল এসেছি। তোরা ভাল আছিস তো?"

"জি হ্যাঁ—অ্যাঁ ; ভাল আছি!" বলিয়া সামু ঘাড়টা অনেকখানি কাৎ করিয়া দিল। আবদুল্লাহ্ তাহার মাথায় হাত রাখিয়া কহিল,—ক্রমেই যে লম্বা হ'য়ে চলেছিস্, সামু! গায়ে তো গোশ্‌ত্ নেই। কেবল রোদে রোদে খেলে বেড়াস্ বুঝি—আর মাছ ধরিস্—কেমন, না?"

সামু মুখ নীচু করিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল,—"না—আঃ—"

"কি মাছ পেয়েছিস্ দেখি?"

"বেশী পাইনি, দু-তিনটে বাটা আর একটা ফলুই..."

"ওঃ, তবে তো বড্ড পেয়েছিস দেখছি!"

পাছে আবদুল্লাহ্ তাহার ক্ষমতা সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়া বসেন, এই ভয়ে সামু তাড়াতাড়ি দুই হাতে এক বৃহৎ মৎস্যের আকার দেখাইয়া চোখ পাকাইয়া গম্ভীর আওয়াজে বলিয়া উঠিল,—"আর একটা মস্ত মোটা মাছ, বোধহয় রুই কি কাতলা হবে—আর একটু হ'লেই তুলেছিলাম আর কি।"

"তুলতে পাল্লিনে কেন?"

সামু ক্ষুণ্নস্বরে কহিল,—"যে জোর কল্লে, কেটে গেল!"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"ভাগ্যি কেটে গেল, নইলে হয় তো তোকে শুদ্ধ টেনে পানির ভেতর নিয়ে যেত।"

সামু আপনাকে যথেষ্ট অপমানিত জ্ঞান করিয়া কহিল,..."ইস্, টেনে নিয়ে গেল আর কি! আমি কত বড় মাছ ধরি, ছিপে!"

"ওঃ তাই নাকি? তবে তো খুব বাহাদুর হ'য়ে উঠেছিস। ইস্কুলে টিস্কুলে যাস্ না খালি মাছ মারিস্?"

সামু খুব সপ্রতিভভাবে কহিল,..."বাঃ স্কুলেই যাইনে বুঝি? এখন যে বন্ধ।"

"কোন ক্লাসে পড়িস্?"

গম্ভীর ভাবে সামু কহিল, "সিকস্থ ক্লাস, দি পশ্চিমপাড়া শিবনাথ ইনষ্টিটিউশন!"

এই সাড়ম্বর নামোল্লেখ শুনিয়া আবদুল্লাহ্ মনে মনে একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের ইস্কুল খুলবে কবে?"

"ওঃ, সে দেরী। সামনের সোমবারের পরের সোমবার।"

"এ ছুটীর মধ্যে পড়া-শুনা কিছু করিছিস্?"

"বাঃ করিনি বুঝি? রোজ সকালে উঠে পড়া করি। আজ দাদাজান আমার একজামিন নিলেন।"

"দাদাজান? কোন্ দাদাজান?"

"রসুলপুরের দাদাজান! আবার কে?"

"ওঃ! তিনি এসেছেন?"

"হ্যাঁ, আজ সকালে, আমি যখন পড়া কচ্ছিলাম, সেই তখন।"

"বাড়ীতে আছেন?"

"না—আব্বার সঙ্গে তিনি ক্ষেতে গেছেন।"

"কোথায় ক্ষেতে?"

"উ—ই যে ওদিকে—" বলিয়া সামু আঙ্গুল দিয়া বাড়ীর পশ্চাৎদিক দেখাইয়া দিল। আবদুল্লাহ্ সেই দিকে প্রস্থান করিল এবং সামু পুনরায় তাহার বড়শীর টোপে মন দিল।

ক্ষেতের কাছে গিয়া আবদুল্লাহ্ দেখিতে পাইল, জন দুই কৃষাণ জমি পাইট করিতেছে এবং তাহার এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মীর সাহেব ও আবদুল খালেক তাহাদের কাজ দেখিতেছে। দূর হইতে আবদুল্লাহকে দেখিতে পাইয়া তাঁহারা উভয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"বাঃ আবদুল্লাহ্ যে!"

মীর সাহেব কহিলেন,—"আমি তোমাদের ওখানেই চলেছি। তা এখানে কবে এলে?"

আবদুল্লাহ উভয়ের 'কদ্‌মবুসি' করিয়া কহিল,—"কাল সন্ধেবেলা এসেছি।"

"ভাল তো সব?"

"হ্যাঁ, এক রকম ভালই—আপনি পীরগঞ্জে যাবেন বল্‌ছিলেন..."

"হ্যাঁ, বাবা তোমার চিঠি পেলাম তবুও বাড়ী এসে—প্রায় মাসেককাল আগের চিঠি, মনে করলাম একবার খবরটা নিয়ে আসি। তা ভালই হ'ল, তোমার সঙ্গে এইখেনেই দেখা হ'য়ে গেল। এখন খবর কি বল।"

আবদুল্লাহ্ কহিল—"খবর কি, পড়াশুনোর আর কোন সুবিধে ক'রে উঠতে পাচ্ছিনে, ফুফাজান।"

"কেন, খরচ-পত্রের অভাবে?"

"জি হ্যাঁ।"

"তোমার শ্বশুরকে ব'লে দেখেছ?"

"তাই ব'ল্‌তে তো আম্মা আমাকে ঠেলেঠুলে পাঠিয়ে দিলেন ;—কিন্তু যা ভেবেছিলাম তাই—তিনি কোন সাহায্য ক'ত্তে পারলেন না।"

মীর সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন পারবেন না, তা কিছু বল্লেন কি?"

"ব'ল্লেন যে মসজিদটায় তাঁর অনেক খরচ প'ড়ে যাচ্ছে, এ সময় হাত বড় টানাটানি—কিন্তু এ-দিকে আর এক ব্যাপার দেখলাম।"

"কি?"

"শুনবেন?—তবে আসুন এই গাছতলায় বসি—ব'সে ব'সে সব বল্‌ছি—সে বড় মজার কথা।"

তিন জনে আমগাছের ছায়ায় ঘাসের উপর বসিয়া পড়িলেন। আবদুল্লাহ কহিল—"পশ্চিম পাড়ার ভোলানাথ বাবু এসেছিলেন একটা সুপারিশ ক'ত্তে।..."

আবদুল খালেক কহিল—"ওঃ বুঝেছি! মহেশ বোসের জন্যে তো!"

"হ্যাঁ তারই জন্যে—আপনি তা হ'লে জানেন সব?"

"কতক কতক জানি—ওস্‌মানের মুখে শুনেছি। দেখুন মামুজান আমার খালুজানের কাণ্ড, কোন দিনও হিসেব-পত্র দেখেন না, গোমস্তারা যা খুশী তাই করে। মহেশ বোস যে কতকাল থেকে টাকা লুঠছে, তার ঠিক নেই। এবার ওসমান ধ'রেছে, গেল বছরের হিসেবে আটশ' টাকারও ওপর তসরুফ হ'য়ে গেছে। এইবার মহেশটা জব্দ হবে।"

মীর সাহেব কহিলেন,—"সে তার কাজ গুছিয়ে নিয়েছে, এখন তাকে আর কি জব্দ ক'রবেন? না হয় টাকাটা ঘর থেকে আবার বার ক'রে দেবে, এই তো? তা সে কত টাকাই তো নিচ্ছে, না হয় এটাকাটা ফক্কেই গেল।"

আবদুল্লাহ্ কহিল—"না, না, ফুফাজান, তাও ফক্কায় নি। সে ব্যাটা গিয়ে ধরেছে ভোলানাথ বাবুকে, তিনি এসে একটু আমড়াগাছি ক'ত্তেই আর কি। কর্তা অমনি খশ খশ করে লিখে দিলেন—'মাফ'।"

আবদুল খালেক অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়া কহিল,—"মাফ ক'রে দিলেন,—সব?"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"সব"

এই কথায় আবদুল খালেক ক্রোধে ও ঘৃণায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। যদিও তাহারা সৈয়দ আবদুল কুদ্দসদিগের শরীক, তথাপি অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ায় তাহাকে অনন্যোপায় হইয়া সৈয়দ সাহেবের সেরেস্তায় কয়েক বৎসর গোমস্তাগিরি করিতে হইয়াছিল। ঘটনাক্রমে একসময়ে তাঁহার তহবিল হইতে আশীটা টাকা চুরি যায়; সৈয়দ সাহেব ঐ টাকাটা উহার বেতন হইতে কাটিয়া লইবার আদেশ দেন। সেই কথা মনে করিয়া আবদুল খালেক চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"দেখুন তো মামুজান, এঁদের কি অবিচার! আমার বেলায় সিকি পয়সা ছাড়লেন না, আর এ ব্যাটাকে একেবারে আট আট শো টাকা মাফ ক'রে দিলেন।"

মীর সাহেব কহিলেন,—"আস্তে কথা, আস্তে! এই টুকুতেই কি অতটা চ'ট্‌লে চলে! এই রকমই তো আমাদের সমাজে ঘটে আসছে, নইলে কি আর আমাদের এমন দুর্দশা হয়? তোমাকে মাফ কল্লে তো লোকের কাছে ওঁর মান বাড়ত না, শুধু শুধু টাকাগুলোই বরবাদ যেত। আর এ ক্ষেত্রে দেখ দেখি, বাবা, হিন্দুসমাজে ওঁর কেমন নাম চেতে গেল!"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"সে কথা ঠিক্ ফুফাজান। সেইখানেই ব'সে ব'সেই নবাব বংশ-টংশ ব'লে ওঁকে খুব তারিফ ক'রে গেল। যে ভোলানাথ বাবু ইচ্ছে কল্লে ওঁকে এক হাটে সাত বার বেচা-কেনা ক'ত্তে পারে, সে-ই ব'ল্‌তে লাগ্‌ল,—"আমরা তো আপনাদেরই খেয়ে মানুষ!" আর উনি তাই সব শুনে একেবারে গ'লে গেলেন!"

মীর সাহেব কহিলেন,—"সে তো ঠিকই ব'লেছে। ওঁদের খেয়েই তো মানুষ ওরা।"

"কি রকম? ওরা যে মস্ত টাকাওয়ালা লোক!"

"মস্ত টাকাওয়ালা আজ কাল হ'য়েছে; আগে ছিল না; সে সব কথা বোঝাতে গেলে অনেক কিছু ব'ল্‌তে হয়।—আবদুল খালেক বোধহয় জান কিছু কিছু..."

আবদুল খালেক কহিল,—"শুনেছি কিছু কিছু, কিন্তু সব কথা ভাল ক'রে জানিনে।"

আবদুল্লাহ সাগ্রহে, কহিল,—"বলুন না, ফুফাজান, শুনি।"

মীর সাহেব আবদুল্লাকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন,—" ভোলানাথের বাপ শিবনাথ তোমার পর-দাদাশ্বশুরের নায়েব ছিল। তিনি যখন মারা যান, তখন তোমাদের দাদাশ্বশুর সৈয়দ

আবদুস সাত্তার ছিলেন ছেলে মানুষ, এই ষোল আঠার বছর বয়স আর আবদুল খালেকের দাদা মাহ্‌তাবউদ্দীনও নিতান্ত শিশু—তাঁরও বাপ কিছু আগেই মারা গিয়েছিলেন। এঁরা দুইজন মামাত-ফুফাত ভাই ছিলেন, তা বোধহয় জান। এখন শিবনাথ দেখ্‌লে যে দুই শরীকের দুই কর্তাই নাবালক; কাজেই সে পাকে-চক্রে একটাকে দিয়ে আর একটার ঘাড় ভাঙতে আরম্ভ করলে। এর ভেতরে আরও একটু কথা ছিল। সেটুকু খুলে বল্‌তে হয়।"

"এঁদের সকলের পূর্বপুরুষ ছিলেন সৈয়দ আবদুল হাদি। তাঁর বিস্তর লাখেরাজ সম্পত্তি ছিল—আজ তার দাম লাখো টাকার উপর। তা ছাড়া ছোট বড় অনেক তালুক-টালুকও ছিল। যাক্ সে কথা—সৈয়দ আবদুল হাদির কেবল দুই মেয়ে ছিল, ছেলে ছিল না। তাদের বিয়ে দিয়ে তিনি দুটো ঘরজামাই পুষলেন। এই দুই পক্ষই হ'ল গিয়ে দুই শরীক...বড়টির অংশে হলেন গিয়ে তোমার শ্বশুর, আর ছোটটির হ'ল আবদুল খালেক।"

আবদুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে এক শরীক সৈয়দ হ'লেন, আর এক শরীক হ'লেন না কেন?"

মীর সাহেব হাসিয়া কহিলেন,—"ঠিক্ ধ'রেছ বাবা! মা সৈয়দের মেয়ে হ'লে ছেলে সৈয়দ সচরাচর হয় না বটে, কিন্তু কেউ কেউ সে ক্ষেত্রে সৈয়দ কওলান, কেউ কেউ কওলান না। আবদুল খালেকদের পূর্বপুরুষরা বোধ হয় একটু sensible ছিলেন, তাই তাঁরা সৈয়দ কওলাতেন না।"

"যা হোক্, এখন সৈয়দ আবদুল হাদি তাঁর বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত সমান দুই ভাগ ক'রে দুই মেয়েকে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। তিনি গত হ'লে মেয়েরা ভিন্ন হ'লেন—অবিশ্যি বাপের সেই রকমই হুকুম ছিল,—তা সত্ত্বেও দু'বোনের মধ্যে ভারী ভাব ছিল। বড়টি পৈতৃক বসত বাটী, পুকুর, বাগান, মসজিদ, সমস্ত ছোট বোনকে দিয়ে নিজে একটু স'রে গিয়ে নতুন বাড়ী ক'রে রইলেন!"

এদিকে ছোট বোনের একটি মাত্র ছেলে, তার বিয়ে হ'ল খালাত বোনের সঙ্গে। খালার ছেলে মাত্র একটি, তোমার পর-দাদাশ্বশুর তিনি। শিবনাথ ছিল তাঁরই নায়েব। দুই শরীকেরই নায়েব ব'লতে হবে, শুধু তাঁর কেন—কেননা ও শরীকের বিষয় দেখা-শুনার ভার ছিল তোমার পর-দাদাশ্বশুরের উপর। তিনি খুব কাজের লোক ছিলেন—তাঁর আমলে শিবনাথ কোন দিকে হাত চালাতে পারে নি। যা হোক্, তিনি আর তাঁর ভগ্নীপতি প্রায় এক সময়েই মারা গেলেন—রইলেন ও-ঘরে তোমার দাদাশ্বশুর, আর এঘরে আবদুল খালেকের দাদা—দুই মামাত-ফুফাত ভাই।"

"আগেই ব'লেছি আবদুল খালেকের দাদা তখন নিতান্ত শিশু। তাঁর বিষয়-আশয় দেখাশুনার ভার তোমার দাদাশ্বশুরকেই নিতে হ'ল। তিনিও একরকম ছেলেমানুষ, কাজেই শিবনাথের উপর ষোল আনা নির্ভর। আর তিনি বাপের আমলের নায়েব ব'লে শিবনাথকে মানতেনও খুব—আর ও দিকে বুদ্ধি-শুদ্ধিও খোদার ফজলে ছিল একটু মোটা, তাই সে যা ব'লত তাই শুনতেন, যা বোঝাত তাই বুঝতেন। এখন এঁদের সম্পত্তি খানিকটা এঁর ফুফুর সঙ্গে ও-ঘরে গিয়ে পড়াতে ওরা সম্পর্কে ছোট শরীক হ'য়েও কাজে বড় শরীক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, এইটেই শিবনাথ ভাল ক'রে আবদুল সাত্তারকে বুঝিয়ে দিলে। আর ওদের একটু খাটো করবার উপায়ও বাৎলে দিলে, মাহ্‌তাবউদ্দীনের বড় দুই বোন আছে, তার অন্ততঃ একটাকে বিয়ে করা আর যদ্দিন মাহ্‌তাব ছোট আছে, তদ্দিনের মধ্যে ওদের দু-চারটে মহালের খাজানা সেস্-টেস্ সব বাকী ফেলে ফেলে সেগুলো নীলেম করিয়ে বেনামীতে খরিদ করা।—তোমাকে ব'লে রাখি আবদুল্লাহ্ হয় তো তুমি জানও মাহ্‌তাবউদ্দীনের আর এক বোনকে তোমার দাদা নজির-উল্লাহ্ বিয়ে ক'রেছিলেন।"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"জি—হাঁ, তা জানি।"

মীর সাহেব কহিতে লাগিলেন,—"কিন্তু তিনি এক দম ফাঁকিতে পড়েছিলেন, বিষয়ের ভাগ, এক কাণা কড়িও পান্‌নি। যা হোক্‌, সৈয়দ আবদুস সাত্তার শিবনাথের পরামর্শ মতই কাজ ক'র্ত্তে লাগলেন—আর কাজ তো আসলে শিবনাথই ক'র্‌ত তিনি খালি হাঁ ক'রে ব'সেই থাকতেন। শেষটাতে বেচারা মাহ্‌-তাবউদ্দীনের অনেকগুলো লাখেরাজ সম্পত্তি শিবনাথ কতক নিজের নামে, কতক তার স্ত্রীর নামে খরিদ ক'রে ফেল্লে। আবদুস্‌ সাত্তার তার কিছুই জান্‌তে পারলেন না।

শেষটা মাহ্‌তাবউদ্দীন যখন বড় হ'য়ে দেখলেন যে, তিনি প্রায় পথে দাঁড়িয়েছেন, তখন মামাত ভাইয়ের নামে নালিশ কল্লেন। তখন শিবনাথও নাই, কিছু দিন আগেই মারা গেছে। মোকদ্দমা প্রায় তিন চার বচ্ছর ধ'রে চ'ল্ল, কিন্তু কোন পক্ষেই কিছু প্রমাণ হ'ল না, মাহ্‌তাব-উদ্দীন হেরে গেলেন। লাভের মধ্যে তাঁর যে টুকু সম্পত্তি অবশিষ্ট ছিল, তারও কতকটা মোকদ্দমার খরচ যোগাতে বিকিয়ে গেল।"

"এখন এই মোকদ্দমার সময় আর একটা মজার কথা প্রকাশ হ'য়ে প'ড়ল। শিবনাথ যে কেবল এ শরীকেরই সর্বনাশ ক'রে গিয়েছে, তা নয়, ওঁর নিজের মাথায়ও বেশ ক'রে হাত বুলিয়ে গিয়েছে! কিন্তু যা হোক্‌ সব নিতে পারেনি। বেচারা হঠাৎ মারা গেল কিনা, আর কিছু দিন বেঁচে গেলে ও শরীককেও হাতে মালা নিতে হ'ত।"

আবদুল খালেক কহিল,—"তারও বড় বেশী বাকী নেই, মামুজান। আমি ত' এদ্দিন কাজ ক'রে এলাম, সব জানি। তার ওপর আবার এই মসজিদ দেবার ঝোঁকে দেখুন না কি দাঁড়ায়।

আবদুল্লাহ্‌ কহিল,—"তা যাক্‌, এখন দেখছি ভোলানাথ বাবুরা এঁদের সম্পত্তি নিয়েই বড় মানুষ হয়েছেন।"

মীর সাহেব কহিলেন—"আর এঁরা হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন—তা এক রকম ভালই ব'ল্‌তে হবে।"

"কেন?"

"ও সম্পত্তিগুলো এদের হাতে থাক্‌লে নাস্তাখাস্তা হ'য়ে যেত এদ্দিন—দেখ না, যা আছে তারই দশা কি! আর দেখ তো ওদের দিকে চেয়ে যেমন আয়ও ঢের বাড়িয়েছে, তেম্‌নি সম্পত্তিও দিন দিন বাড়াচ্ছে,—ছেলেগুলো সব মানুষ করেছে, বড় বড় চাকুরী ক'চ্ছে।"

আবদুল্লাহ্‌ কহিল,—"সুদের জোরেই তো ওরা বাড়ে, আমাদের যে সেটা হবার জো নেই।"

"মানি, সুদের জোরে বাড়ে কিন্তু ছেলে-পিলে মানুষ হয়, সেও কি সুদের জোরে? এদিকে মহালের বন্দোবস্ত ক'রেও তো আয় বাড়ান যায়—তাই বা কই? এরা কি কিছু দেখেন শোনেন? নায়েব গোমস্তার হাতে খান, তারা যা হাতে তুলে দেয়, তাতেই খোশ্‌!—এমন জুৎ পেয়ে ব্যাটা নায়েব কি গোমস্তা শিবনাথের মত দু'হাতে না লোটে, সে নেহাৎ গাধা।"

এমন সময় সামু, "আব্বা, দাদাজানকে আর চাচাজানকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর মধ্যে আসুন" বলিতে বলিতে দৌড়িয়া আসিল। মীর সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন ভাইজান, আম্মা কি নাশ্‌তা করাবেন আমাদের।"

সামু কহিল,—"হ্যাঁ—হ্যাঁ। শীগ্‌গির আসুন" বলিয়া সে দাদাজানের হাত ধরিয়া টানিয়া উঠাইল। অতঃপর সকলে বৈঠকখানার দিকে চলিলেন।

১৫

এদিকে আসরের ওয়াক্ত হইয়া গিয়াছে দেখিয়া মীর সাহেব বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতে করিতে সামুকে ডাকিয়া কহিলেন,—"আম্মাকে বলগে, ভাইজান, আমরা নামায পড়ে যাচ্ছি।"

"জি আচ্ছা" বলিয়া সামু দৌড়িয়া মাকে বলিতে গেল।

নামায বাদে তিন জনে অন্দরে আসিলেন। শয়নঘরে বারান্দার ছোট একটি তক্তপোষের উপর ফরশ্ পাতা হইয়াছিল।

মীর সাহেব গিয়া তাহার উপর বসিলেন এবং আবদুল খালেক আবদুল্লাহকে ঘরের ভিতর লইয়া গেল।

আবদুল খালেকের পত্নী রাবিয়া মেঝের উপর বসিয়া পান সাজিতেছিল। আবদুল্লাকে দেখিয়া আঁচলটা মাথার উপর তুলিয়া দিয়া হাসি-হাসি মুখে রাবিয়া কহিল,—"বাঃ আজ কি ভাগ্যি। কবে এলেন, খোন্‌কার সাহেব?"

আবদুল্লাহ্ রাবিয়ার 'কদমবুসি' করিয়া কহিল,—"কাল সন্ধ্যে বেলায় এসেছি। আপনি ভাল আছেন তো ভাবী সাহেবা!"

"হ্যাঁ-ভাই, আপনাদের দোওয়ায় ভালই আছি..."

আবদুল খালেক ঠাট্টা করিয়া কহিল,—"আঃ ওর দোওয়াতে আবার ভাল থাক্‌বে! ও খোন্‌কার হ'লে কি হয়, খোন্‌কারী তো আর ও করে না, যে, ওর দোওয়াতে কোন ফল হবে।"

রাবিয়া কহিল,—"তা নাই বা ক'ল্লেন খোন্‌কারী, ভালবেসে মন থেকে দোওয়া কল্লে সবারই দোওয়াতে ফল হয়। বলুন না খোন্‌কার সাহেব।"

আবদুল খালেক আবদুল্লাকে লইয়া খাটের সম্মুখস্থ তক্তপোষের উপর বসিলে রাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাড়ীর সব ভাল তো ভাই? ফুফুআম্মা কেমন আছেন?"

"তাঁর শরীরটা ভাল নেই..."

"তা তো না থাক্‌বারই কথা; তা হালিমাকে আর বউকে এবার নিয়ে যান; ওরা কাছে গেলে ওর মনটা একটু ভাল থাক্‌বে।"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"তাই মনে ক'চ্ছি। কিন্তু আপনাদের বউকে হয়তো ওঁরা এখন পাঠাতে চাইবেন না।

"কেন?"

"তাঁকে নিয়ে যেতে চাইলে আমার শ্বশুর তো বরাবরই একটা ওজর করেন—আর আব্বার ব্যারামের সময়েই পাঠালেন না......"

রাবিয়া একটু বিরক্তির স্বরে কহিল,—"বাঃ তাই ব'লে বউকে আপনারা নিয়ে যাবেন না, বাপের বাড়ীতেই চিরকাল রেখে দেবেন?"

"তাই রেখে দিতে হবে, দেখতে পাচ্ছি। আর তাকে নিয়ে যাওয়াও তো কম হাঙ্গামার কথা নয়, সঙ্গে বাঁদী তো নিদেন পক্ষে জন-তিনেক যাবে—তা ছাড়া তার তো ন'ড়ে ব'স্‌তেই ছ'মাস—হাতে ক'রে সংসারের কুটোগাছটিও নাড়ে না। এখন তাকে নিয়ে গেলে কেবল আমারই খাটুনী বাড়ান হবে। তা ছাড়া আমাদের যে অবস্থা এখন, তাতে এতগুলো বাঁদী পোষা—ও পেরে ওঠা যাবে না! তার চেয়ে এখন ওর এই খেনেই থাকা ভাল।

রাবিয়া একটু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—"ও মেয়ে যে কখনও সংসার করতে পারবে, তা বোধ হয় না। আপনার কপালে অনেক দুঃখ আছে দেখতে পাচ্ছি, খোন্‌কার সাহেব!"

আবদুল্লাহ কহিল,—"তা আর কি ক'রব, ভাবী সাহেবা!"

আবদুল খালেক কহিল,—"এখন আর কিছু ক'রে কাজ নেই, চল নাশ্‌তাটা করা যাক।" এই বলিয়া সে আবদুল্লাকে বারান্দায় লইয়া গিয়া ফরশের উপর ছোট একটি দস্তরখান পাতিয়া দিল। রাবিয়া রেকাবিগুলি আনিয়া তাহার উপর সাজাইতে লাগিল।

নাশ্‌তার আয়োজন দেখিয়া আবদুল্লাহ্ কহিল,—"এ কি ক'রেছেন, ভাবী সাহেবা!"

মীর সাহেব কহিলেন,—"ও তোমার ভাবী সাহেবার দোষ নয়, বাবা। আমারই অত্যাচার।" তাহার পর একটু ভারী গলায় কহিতে লাগিলেন,—"আমার এই আম্মাটি ছাড়া আমাকে আদর ক'রে খাওয়াবার আর কেউ নেই! তাই যখন এখানে আসি, ফরমাশের চোটে আমার আম্মাকে হয়রান ক'রে দিই। খেতে পারি আর না পারি, আমাকে পাঁচ রকম ত'য়ের

ক'রে খাওয়ানর জন্য উনি হাসিমুখে যে খাটুনীটা খাটেন, তাই দেখেই আমার প্রাণটা ভ'রে যায়। আমার আম্মার আদরে সংসারের যত অনাদর-অবহেলা সব আমি ভুলে যাই। তাই ছুটে ছুটে আমার আম্মার কাছে আসি।"

মীর সাহেবের কথায় সকলেরই চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। রাবিয়া তাড়াতাড়ি পান আনিবার ছলে সরিয়া পড়িয়াছিল।

এই মেয়েটিকে মীর সাহেব ছেলে বেলা হইতেই অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ইহার মাতা তাহার একটু দূর সম্পর্কের চাচাত বোন, কিন্তু সম্পর্ক দূর হইলেও তিনি ইহাদিগকে আপনার জন বলিয়াই মনে করিতেন। তাই রাবিয়ার বিবাহের অল্পকাল পরেই যখন তাহার পিতার মৃত্যু হয় এবং তাহার মাতা শিশু-কন্যা মালেকাকে লইয়া অকূল সাগরে ভাসিলেন তখন মীর সাহেবই তাঁহাদিগের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিলেন। মীর সাহেবেরই চেষ্টায় অসহায় বিধবার এবং কন্যা দুইটির সম্পত্তিটুকু অপরাপর অংশীদারগণের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। সম্প্রতি তিনি মালেকারও বেশ ভাল বিবাহ দিয়া দিয়াছেন—জামাতা মঈনুদ্দীন একজন সব্‌ডিপুটি, তাঁহার ভ্রাতা মহীউদ্দীন ডিপুটি, পৈতৃক সম্পত্তিও ইহাদের মন্দ নহে। নূরপুর গ্রামের মধ্যে এই বংশই শ্রেষ্ঠ বংশ—পুরাতন জমিদার ঘর হইলেও নিতান্ত ভগ্নদশা নহে।

মীর সাহেবের এই সকল অযাচিত অনুগ্রহে রাবিয়া এবং তাহার মাতা ও ভগ্নী তাহার নিকট সর্বদা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য উৎসুক। উপকার করিয়া মীর সাহেব যদি কাহারও নিকট আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পাইয়া থাকেন তবে সে এখানেই।

নাশ্‌তার পর মীর সাহেব উঠিয়া বাহিরে গেলে আবদুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিল,—"তারপর ভাইজান, আপনার কাজ-কর্ম চলছে কেমন?"

আবদুল খালেক কহিল, "তা খোদার ফযলে মন্দ চলছে না। মামুজানের মেহেরবানিতে আমার দুখ্‌খু ঘুচেছে। আজ প্রায় তিন বছর আম্মার ইন্তেকাল হ'য়েছে এরই মধ্যে মামুজানের পরামর্শ মত চ'লে আমার অবস্থা ফিরে গিয়েছে। আহা এদ্দিন যদি মামুজানকে পেতাম, তবে কি আর শরীকের ঘরে গোলামী কত্তে যেতে হ'ত? তা আম্মা ওঁর ওপরে এমন নারাজ ছিলেন, যে, বাড়ীতে পর্যন্ত আস্‌তে দিতেন না।"

"কেন সুদ খান ব'লেই তো!"

"তা ছাড়া আর কি? কিন্তু এমন লোক আর দেখি নি! সকলেই চায় গরীব আত্মীয়-স্বজনের ঘাড় ভেঙে নিজের নিজের পেট ভ'রতে—কিন্তু ইনি গায়ে প'ড়ে এসে উপকার করেন। খালুজান যখন আমার মাইনে বন্ধ ক'রে দিলেন তখন উনিই তো এসে আমার সব দেনা পরিশোধ ক'রে আমাকে চাকরী থেকে ছাড়িয়ে আন্‌লেন, তারপর এই সব ক্ষেত-খামার জমি-জীরাত সব গুছিয়ে নিতেও তো আমাকে উনি কম টাকা দেন নি..."

আবদুল্লাহ্ কহিল, "ওর যে সুদের টাকা, ঐখানটাতেই তো একটু গোল র'য়েছে।"

আবদুল খালেক কহিল,—"তা থাক্‌লই বা গোল তাতে কিছু আসে যায় না। আর সুদ নিয়ে ওঁর যে গোনাহ্ হ'য় তার ঢের বেশী সওয়াব হ'চ্ছে পরের উপকার ক'রে। এতেই আল্লাহ্‌তা'আলা আখেরাতে ওঁর সব গোনাহ্ মাফ ক'রে দেবেন ব'লে আমার বিশ্বাস।"

এই কথাটি লইয়া আবদুল্লাহ্ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু কোন সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিল না। একটু পরে আবদুল খালেক আবার কহিতে লাগিল,—"দেখ ভাই, উনি যে শুধু টাকা দিয়েই লোকের উপকার করেন, তা নয়; সৎপরামর্শ দিয়ে বরং তার চেয়ে ঢের বেশী উপকার করেন। আজ-কাল যে আমি এই ক্ষেত-খামার গরু-ছাগল-হাঁস-মুর্গী—এই সব নিয়ে আছি, আগে কখনও স্বপ্নেও আমার খেয়ালে আসেনি যে, এ-সব ক'রে মানুষ সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। এই পানের বরজ একটা জিনিস, যাতে বেশ দু'পয়সা আয় হয়, এ তো বারুইদেরই একচেটে; কোন শরীফজাদাকে ব'লে দেখ পানের বরজ ক'র্তে অমনি সে আড়াই হাত জিভ বার ক'রে ব'লবে—"সর্বনাশ, ওতে জাত থাকে।" ক্ষেতি-টেতির

বেলাতেও সেই রকম ; তাতে যে একটু ন'ড়ে চ'ড়ে বেড়াতে হয়, সেই জন্যেই শরীফ-জাদাদের ও-সব দিকে মন যায় না। ঘরে ব'সে ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাং দিয়ে দু'মুঠো মোটা ভাত জুটলেই তাঁরা খোশ্ থাকেন। নিতান্ত দায়ে ঠেক্‌লে পরের গোলামী ক'রে জুতো-লাথি খাবেন তাও স্বীকার, তবু ও-সব ছোট লোকের কাজে হাত দিয়ে জাত খোয়াতে চান না। এই আমার কি দশা ছিল, দেখ না; বিষয় পেয়েছিলাম, তাতে তো আর সংসার চলে না। কি করি, গেলাম ওদের গোলামী ক'র্তে—জমি-জারাত যা ছিল, সেগুলো যে খাটিয়ে খাব, সে চিন্তাই মনে এল না! তার পর মামুজান এসে যখন পথে তুলে দিলেন, তখন চোখ ফুট্‌ল।"

আবদুল্লাহ্ তন্ময় হইয়া কথাগুলি শুনিতেছিল। শুনিতে শুনিতে প্রতি মুহূর্তে তাহার মনের ভিতর নানা প্রকার চিন্তা বিদ্যুতের ন্যায় খেলিয়া যাইতেছিল। আর পড়া কি চাকরী-বাকরীর দিকে না গিয়ে ভাইজানের পথ অবলম্বন করিবে—কিন্তু তাহার উপযুক্ত জমি তেমন নাই, নগদ টাকাও নাই, কেমন করিয়া আরম্ভ করিবে? ফুফাজানের সাহায্য চাহিবে? আব্বা তাতে নারাজ হইবেন। তবে কিছুদিন চাকরী করিয়া টাকা জমাইয়া ঐ সব কাজ শুরু করিয়া দিবে। সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল,—"আচ্ছা ভাইজান, আজ-কাল আপনি কি কি কাজ নিয়ে আছেন? আর কোন্ কোন্‌টায় বেশ লাভ হচ্ছে?"

আবদুল খালেক কহিতে লাগিল,—"হাত দিয়েছি তো ঢের, কাজে—তা কোনটাতেই লাভ মন্দ হ'চ্ছে না। আমার জমি বেশী নেই, ধান যা পাই, তাতে এক রকম ক'রে বছরটা কেটে যায়। তা ছাড়া আমার ক্ষেতগুলোতে হলুদ—এটাতে খুবই লাভ—আদা, মরিচ, সর্ষে কয়েক রকমই কলাই, তার পর পিঁয়াজ, রসুন, তরি-তরকারী—এ সব যথেষ্ট হয়, খেয়ে দেয়েও ঢের বিক্রী ক'রতে পারি। গোটা কয়েক বরজ করিছি, তাতেও বেশ আয় হ'চ্ছে। সুপুরী-নারিকেলের গাছ আমার বেশী নেই, আরও কিছু জমি নিয়ে বেশী ক'রে লাগাব মনে ক'চ্ছি। যে জমিতে এগুলো দেবো, সেখানে কলার বাগান করা যাবে, যদ্দিন ফসল না পাওয়া যায়, তদ্দিন কলা থেকেও কিছু কিছু আয় হবে। তার পর দেখ, মাছ তো আমাকে আর এখন কিন্‌তেই হ'চ্ছে না, কাজেই বাজার খরচ বলে একটা খরচ আমার এক রকম ক'র্তেই হয় না ব'ল্লে চলে। ছাগল, মুর্গী হাঁস এ-সব দেদার খেয়েও এ-বছর বেচেছি প্রায় শ' দেড়েক টাকার, ক্রমে আরও বেশী হবে। একটু ভেবে দেখলে এই রকম আরও ঢের উপায় বার করা যায়, কারুর গোলামী না ক'রে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটান যেতে পারে।"

এই সকল বিবরণ শুনিয়া আবদুল্লার মনে বড়ই আনন্দ হইল। সে কহিল,—"আচ্ছা, ভাইজান, চোখের উপর উপায় ক'রবার এমন এমন সুন্দর পন্থা থাক্‌তে কেউ যায় গোলামী কর্তে আর কেউ বা হাত-পা কোলে ক'রে ঘ'রে ব'সে আকাশ পানে চেয়ে হা-হুতাশ করে। কি আশ্চর্য!"

আবদুল খালেক কহিল,—"আমার নিজের জীবনে যা ঘটেছে, তাতে বুঝতে পারি যে, আমাদের শরাফতের অভিমান, দারুণ আলস্য, আর উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাব, এই তিনটে কারণে আমরা সংসারে সুপথ খুঁজে পাই নে। কোন রকম পেটটা চ'লে গেলেই "আল্লাহ্ আল্লাহ্ ক'রে জীবনটাকে কাটিয়ে দিই! আর নেহাৎ পেট যদি না চলে, তো ঝুলি কাঁধে নিয়ে সায়েলী ক'ত্তে বেরুই।"

এইরূপ কথাবার্তা কহিতে কহিতে মগরেবের সময় হইয়া আসিল দেখিয়া আবদুল্লাহ্ কহিল,—"তবে এখন উঠি, ভাইজান!"

আবদুল খালেক স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিল,—"ওগো, শুন্‌ছ, আবদুল্লাহ্ রোখ্‌সৎ হ'চ্ছে—একবার এদিকে এস।"

রাবিয়া রান্নাঘরে ছিল, তাড়াতাড়ি হাতের কাজ ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া কহিল,—"এখনই রোখ্‌সৎ হচ্চেন কি, খোন্‌কার সাহেব। আজ রাত্রে আমাদের বাড়ীতে খেতে হবে যে।"

আবদুল খালেক কহিল,—"না গো না, তার আর কাজ নেই। এখানে যে ও বেড়াতে এসেছে, তাতেই ওর শ্বশুর-বাড়ীতে কত কথা হবে এখন।"

আবদুল্লাহ্ সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন—কেন?"

আবদুল খালেক কহিল,—"আমাদের সঙ্গে যে ওঁদের আজ-কাল মনান্তর চ'লছে।"

"মনান্তর হ'ল কিসে।"

"ওই যে ক'টা তালুক খালুজান বিক্রী ক'ল্লেন, সে ক'টা মামুজান আমারই নামে বেনামী ক'রে খরিদ করেছেন কিনা, তাই।"

"হ্যাঁ তা তো শুনেছি। কিন্তু তাতে আপনার সঙ্গে মনান্তর হ'ল কেন?"

"খালুজানের ইচ্ছে ছিল কোন আত্মীয়-স্বজন কথাটা না জানতে পারে। বরিহাটির দীনেশ বাবু ওঁয়াদের উকিল কিনা, তাঁকে দিয়ে গোপনে বিক্রী ক'রবার বন্দোবস্ত ক'রেছিলেন। কিন্তু এ-দিকে দীনেশ বাবুর সঙ্গে মামুজানের খুব ভাব; তাই যখন মামুজান জানতে পেরে নিজেই নিতে চাইলেন, তখন দীনেশ বাবু আর আপত্তি ক'ল্লেন না। খালুজান কিন্তু মনে ক'রলেন যে, আমিই পাকে-চক্রে মামুজানকে সন্ধান দিয়ে খরিদ ক'রিয়েছি।"

আবদুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা, উনি যখন বেচ্‌লেনই, তখন আপনিই না হয় কিন্‌লেন, তাতে আপনার কি অপরাধ।"

আবদুল খালেক কহিল,—ওই তো কথা ঘোরে রে ভাই! অপরাধ যে আমার কি, সেটা আর বুঝলে না। ওদের গোলাম হ'য়ে, আর আজ কিনা দু'-পয়সা উপায় ক'চ্ছি, তার ওপর আবার ওঁদের তালুক কিনে ফেল্‌লাম, এতে আমার স্পর্ধা কি কম হ'ল?"

আবদুল্লাহ্ ব্যঙ্গ করিয়া কহিল,—"তা তো বটেই!"

"সেই জন্যেই তো ব'লছিলাম, তুমি আমাদের সঙ্গে মেলা-মেশা খাওয়া-দাওয়া ক'ল্লে তোমার শ্বশুর-বাড়ীতে কথা উঠবে।"

"তা উঠলোই বা! ওঁরা চট্‌লেন তো ভারী ব'য়েই গেল! এমনিই বড় ভালবাসেন কিনা..."

"আরে না, না। তুমি তো আজ বাদে কাল চ'লে যাবে, তারপর এর ঝক্কি সইতে হবে আমাদেরই।"

রাবিয়া এবং আবদুল্লাহ্ উভয়েই প্রায় সমবয়সী। আবদুল খালেকের বিবাহ হওয়া অবধি তাহাদের অনেকবার দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং স্বাভাবিক স্নেহশীলতা-গুণে রাবিয়া আবদুল্লাকে অত্যন্ত আপনার করিয়া লইয়াছে। আবদুল্লাও তাহাকে আপন ভগ্নীর ন্যায় ভক্তি করে এবং ভালবাসে : বিশেষতঃ রাবিয়ার নিপুণ হস্তের রন্ধন এবং পরিবেশন-কালে ততোধিক নিপুণ আদর-কুশলতা এমনি লুব্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে, ভ্রাতার প্রত্যাখ্যানে সে আজ বড়ই-মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া গেল। অগত্যা সে কহিল,—"তবে থাক্ এ যাত্রা ভাবী সাহেবা। আমি কিন্তু কা'ল ভোরেই রওয়ানা হব।"

রাবিয়া কহিল,—"সে কি, ভাই।—বাড়ী এসে কি একদিন থেকেই চ'লে যেতে আছে।"

"না ভাবী সাহেবা, এবার আর থাকতে পারছিনে। আম্মা ওদিকে পথ চেয়ে আছেন, পড়া-শুনার তো কোন বন্দোবস্ত এখনো হ'য়ে উঠলো না, অন্ততঃ কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা তো দেখতে হয়। মনটা বড় অস্থির হ'য়ে আছে। খোদা যদি দিন দেন, তবে কত আস্‌ব-যাব, আপনাকে বিরক্ত ক'রব। এখন তবে আসি।"

এই বলিয়া আবদুল্লাহ্ রাবিয়ার 'কদমবুসি' করিয়া বিদায় লইল।

বাহিরে আসিয়া মীর সাহেবের নিকট বিদায় লইবার সময় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে এখন তোমার পড়া-শুনার কি ক'রলে আবদুল্লাহ্?"

"কিছু তো ঠিক ক'রে উঠতে পাচ্ছিনে কি ক'রব। ভাবছি মাষ্টারী ক'রে প্রাইভেট প'ড়ব।"

"সে কি সুবিধে হবে? তা হ'লে 'ল'-টা আর পড়া হবে না...।"

"বছর দুই তিন মাষ্টারী ক'রে কিছু টাকা জমিয়ে শেষে 'ল' প'ড়তে পারি।"

"ও, সে অনেক দূরের কথা। তার কাজ নেই, 'আমিই তোমার পড়ার খরচ দেবো' তুমি কলকাতায় গিয়ে ভর্ত্তি হও!"

আবদুল্লাহ্ তাঁহার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া কহিল,—"তা হ'লে তো বড়ই ভাল হয়, ফুফাজান। কিন্তু আম্মাকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখতে হবে।"

"তা জিজ্ঞাসা ক'রবে বইকি।"

আবদুল্লাহ্ একটু ভাবিয়া কহিল,—"কিন্তু তিনি যদি আপনার টাকা নিতে না দেন?"

মীর সাহেব একটু চিন্তিত হইয়া কহিলেন,—"তাও তো বটে। আমার টাকা নিতে আপত্তি করা তাঁর পক্ষে আশ্চর্য নয়। না হয় তুমি তাঁকে ব'লো যে, টাকা কর্জ নিচ্ছ, পরে যখন রোজগার ক'রবে তখন শোধ দেবে!"

কিন্তু আবদুল্লার মনে খটকা রহিয়া গেল। তাহার মাতা যে সুদখোরের টাকা কর্জ লইতেও রাজী হইবেন, এরূপ সম্ভব না। একটু ভাবিয়া অবশেষে সে কহিল,—"আচ্ছা ব'লে দেখব। নিতান্তই যদি আম্মা রাজী না হন, তখন মাষ্টারীই ক'রতে হবে, আর কোন উপায় দেখছিনে!"

আবদুল খালেক কহিল,—"আরে তুমি আগে থেকেই এত ভাবছ কেন? ব'লে দেখ গে' তো! রাজী হবেন এখন। মামুজান তো কর্জ দিচ্ছেন, তাতে আর দোষ কি!"

মীর সাহেব কহিলেন,—"না, ভাববার কথা বই কি! এঁরা সব পাক্কা দীনদার মানুষ, আমার সঙ্গে এঁদের ব্যবহার কেমন, তা জান তো!

আবদুল্লাহ্ কহিল,"সেই জন্যেই তো আমি ভাবছি। তবু এক বার ব'লে দেখি। তার পর আপনাকে জানাব।"

এই বলিয়া আবদুল্লাহ্ বিদায় গ্রহণ করিল।

১৬

বড় দুইটি পুত্রের মধ্যে আবদুল কাদেরই একটু মানুষের মত দেখা গিয়াছিল বলিয়া সৈয়দ সাহেব তাহার উপর অনেক ভরসা করিয়া বসিয়াছিলেন। মালেক তো বাল্যকাল হইতেই বুদ্ধি-বিবেচনা বিষয়ে অভ্রান্ত স্থূলতা দেখাইয়া আসিতেছিল ; তাই তাহার দ্বারা কাজের মত কাজ কিছু একটা হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া তিনি পশ্চিম হইতে একজন 'কা'রী (সুষ্ঠুভাবে কোর-আন্ শরীফ পাঠে দক্ষ ব্যক্তি) আনাইয়া তাহাকে কোর-আন্ মজিদ 'হেফজ' (মুখস্থ) করিতে দিয়াছিলেন। তাহার পর মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর দিবারাত্র ঢুলিয়া ঢুলিয়া নানা সুরে নানা ভঙ্গীতে 'আয়েত' (শ্লোক) গুলি শতবার সহস্রবার আওড়াইয়া অবশেষে যখন আবদুল মালেক 'হাফেজ' (আদ্যন্ত কোর-আন্ মজিদ যাঁহার কণ্ঠস্থ) হইয়া উঠিল, তখন সৈয়দ সাহেব মনে করিলেন, যা হোক্ ছোঁড়াটার ইহকালের কিছু হোক্ না হোক্, পরকালের একটা গতি হইয়া গেল! এক্ষণে আবদুল কাদেরকে দিয়া কতদূর কি করান যায়, তাহার দিকে মনোনিবেশ করিলেন।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। আবদুল কাদের মাদ্রাসা পাশ করিয়া পশ্চিমে যাইবে ; সেখানকার বড় বড় আলেমগণের নিকট 'হাদিস' 'তফসীর' প্রভৃতি পড়িয়া 'দীনী-এল্‌ম'এর (ধর্মবিষয়ক শিক্ষা) একেবারে চরম পর্যন্ত 'হাসেল' (আয়ত্ত) করিয়া আসিবে, সৈয়দ সাহেব বহুকাল হইতে এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু সে যখন তাঁহাকে এমন করিয়া দাগা দিয়া এল্‌মে দীনের পরিবর্তে এল্‌মে দুনিয়ার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, তখন তিনি ভয়ানক চটিয়া গেলেন এবং তাহার পড়া-শুনা বন্ধ করিয়া দিয়া বাড়ীতে আনাইয়া বসাইয়া রাখিলেন। রাগের মাথায় স্পষ্ট করিয়া মুখে না বলিলেও, ব্যবহারে তাঁহার ঘোর বিরক্তি ও দারুণ অসন্তোষ পদে পদে প্রকাশ পাইতে লাগিল। এইরূপে বৎসরাধিক কাল কাটিয়া গেল।

আবদুল কাদেরের প্রকৃতি যে ধাতুতে গড়া তাহাতে অকর্মা হইয়া বসিয়া থাকা তাহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর! প্রথম প্রথম কিছুদিন সে কর্মচারীদিগের সেরেস্তায় গিয়া বসিয়া জমিদারীর কাজ-কর্ম দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমলারা দেখিল, মেজ মিঞা সাহেব যেরূপ উপদ্রব

আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে বেচারাদের চাকুরী বজায় রাখা দায় হইয়া উঠিয়াছে। অবশেষে তাহারা এক দিন খোদ কর্তাকে গিয়া ধরিয়া পড়িল ; কর্তা আবদুল কাদেরকে ডাকিয়া ধমকাইয়া দিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, আমলা-ফয়লার কাজ-কর্মে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া জমিদারপুত্রের পক্ষে সম্মানজনক নহে। পক্ষান্তরে ও সকল কাজের ভিতর গিয়া ডুবিয়া পড়িলে দীনদারী বজায় রাখা অসম্ভব হয় ; নহিলে কি তিনি নিজেই সব দেখা-শুনা করিতে পারিতেন না। ওই সব দুনিয়াদারীর ব্যাপার আমলাদের উপর ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তো তিনি নিশ্চিন্ত মনে খোদার নাম লইতে পারিতেছেন।

আবার বেকার বসিয়া বসিয়া কিছু কাল কাটিয়া গেল। অবশেষে এক দিন আবদুল কাদের পিতার নিকট গিয়া প্রস্তাব করিল, সে কোন একটা চাকুরীর সন্ধানে বিদেশে যাইতে চাহে। শুনিয়া সৈয়দ সাহেব একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। জমিদারের ছেলে চাকুরী করিবে—বিশেষ সৈয়দজাদা হইয়া! নাঃ, ছেলের আখেরাতের বিষয় আর উদাসীন হইয়া থাকিলে চলিতেছে না। অতঃপর সৈয়দ সাহেব প্রত্যহ দু'-বেলা তাহাকে কাছে বসাইয়া 'দীনী এল্‌ম'এর 'ফজিলাত' (গুণ) বয়ান (বর্ণনা) করিয়া, পুনরায় মদ্রাসায় পড়ার আবশ্যকতা বুঝাইবার জন্য নানা প্রকার 'নসিহৎ' (উপদেশ) করিতে আরম্ভ করিলেন।

আল্লাহ্-তা'লা মানুষকে দুনিয়ায় পাঠাইয়াছেন পরীক্ষা করিবার জন্য কে কতদূর দুনিয়াদারীর লোভ সামলাইয়া দীনদারীতে কায়েম থাকিতে পারে এবং তাঁহাকে 'ইয়াদ' (স্মরণ) করিতে পারে। যে গরীব, লাচার, যাহাকে অবশ্য সংসার চালাইবার জন্য খাটিতে হয়, খোদাকে 'ইয়াদ' করিবার সময় বেশী পায় না, তাহার পক্ষে দিন-রাত এবাদৎ না করিতে পারিলেও মাফ আছে। কিন্তু আল্লাহ্-তা'লা যাহাকে ধন-সম্পত্তি দিয়াছেন, সংসার চালাইবার ভাবনা ভাবিতে দেন নাই, তাহার পক্ষে পরীক্ষাটা আরও কঠিন করিয়াছেন। সে যদি দিন-রাত এবাদতে মশগুল না থাকে, তবে তাহার আর মাফ নাই। আর তেমন লোক যদি আবার দুনিয়াদারীতে মজিয়া পড়ে, তো সে নিশ্চয়ই জাহান্নামে যাইবে অতএব যখন আবদুল কাদেরের সংসারের ভাবনা আল্লাহ্‌'তা'লা নিজেই ভাবিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, তখন তাহার উচিত 'দীনে'র ভাবনা ভাবা' 'দীনী এল্‌ম' হাসিল করিয়া আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু এত নসিহতেও কোন ফল হইল না। 'আকবত'-এর ভয় দেখাইয়াও সৈয়দ সাহেব পুত্রের মন ফিরাইতে পারিলেন না। সে আর মদ্রাসায় পড়িতে চাহিল না। যদি পড়িতেই হয়, তবে সে ইংরেজী পড়িবে ; আর যদি তাহা পড়িতে নাও দেন, তাহা হইলে যে-টুকু সে শিখিয়াছে, তাহাতেই করিয়া খাইতে পারিবে। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া সৈয়দ সাহেব সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার ভয় দেখাইতে বাধ্য হইলেন। এইটিই তাঁহার হাতের শেষ মহাস্ত্র ছিল এবং মনে করিয়াছিলেন, এ মারাত্মক অস্ত্র ব্যর্থ হইবে না।

আবদুল কাদের নিতান্ত নির্বোধ ছিল না। সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, পিতার সম্পত্তি ভ্রাতা-ভগ্নীগণের মধ্যে বিভাগ হইয়া গেলে আর পায়ের উপর পা দিয়া বড়-মানষী করা চলিবে না ; বিশেষতঃ পিতা যেরূপ অবিবেচনার সহিত খরচ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তালুক বিক্রয় করিয়া মসজিদ দিতেছেন, তাহাতে শেষ পর্যন্ত সম্পত্তির যে কতটুকু থাকিয়া যাইবে, তাহা এখন বলা যায় না। এরূপ অবস্থায় পিতা তাহাকে যে-টুকু সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার ভয় দেখাইতেছেন, সে-টুকু থাকিলেও বড় লাভ নাই, গেলেও বড় লোকসান নাই। সুতরাং পিতার মহাস্ত্রের ভয়েও সে টলিল না, বরং জেদ করিতে লাগিল, তাহাকে এন্ট্রান্সটা পাশ করিতে দেওয়া হউক, নতুবা সে নিজের পথ দেখিবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়া যাইবে।"

সৈয়দ সাহেব অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া কহিলেন,—"তবে তুই দূর হ'য়ে যা—তোর সঙ্গে আর আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

আবদুল কাদের খুশী হইয়া ভাবিল,—সে তো তাহাই চাহে। মুখে কহিল,"জ্বি, আচ্ছা, তাই যাচ্ছি।"

তাহার পর সত্য সত্যই সে একদিন বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল।

গৃহত্যাগ করিয়া আবদুল কাদের বরিহাটির সদরে আসিয়া তাহার সহপাঠি ওয়াহেদ আলীর বাটীতে আশ্রয় লইল। ওয়াহেদ আলী তখন বাটীতে ছিল না ; কিছুদিন পূর্বে সে পুলিশের সব ইনস্পেক্টারী চাকরী পাইয়া ট্রেনিং-এর জন্য ভাগলপুরে চলিয়া গিয়াছিল। তাহার পিতা আকবর আলী আবদুল কাদেরের পরিচয় পাইয়া সযত্নে তাহাকে নিজবাটীতে স্থান দিলেন এবং চাকুরী সম্বন্ধেও তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

বরিহাটি জেলায় মোটের উপর মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অধিক হইলেও, শহরে মুসলমান বাশিন্দা বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। মুসলমান জমিদারগণের ভগ্নাবশেষ যে দুই চারি ঘর এখনও টিকিয়া আছেন, শহরে বাড়ী করিয়া থাকিবার আবশ্যকতাও তাঁহাদের নাই, আর ক্ষমতাও নাই বলিলে চলে। তাঁহাদের বিষয়-সংক্রান্ত কাজ-কর্ম নায়েব-গোমস্তা ও উকীল বাবুরাই করিয়া থাকেন। কৃচিৎ স্বয়ং হাজির হইবার দরকার পড়িলে নৌকায় আসেন এবং নৌকাতেই থাকেন। তাই বলিয়া মুসলমান বাশিন্দা যে একেবারে নাই, তাহা নহে! শহরের এক প্রান্তে কয়েক ঘর পেয়াদা ও চাপরাশী শ্রেণীর লোক বাস করে ; সেইটাই এখানকার মুসলমান পাড়া। আকবর আলী কালেক্‌টারীর এক জন প্রধান আমলা ছিলেন ; চাকুরী উপলক্ষে তাঁহাকে এখানে অনেক দিন হইতে বাস করিতে হইতেছে। কিন্তু অন্য কোথাও স্থান না পাইয়া তিনি এই মুসলমান পাড়াতেই বাসের উপযুক্ত খানকয়েক ঘর বাঁধিয়া লইয়াছেন।

যাহা হউক, মুসলমানদিগের মধ্যে হিন্দু মহলে যা কিছু খাতির তা 'একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি' গোছ আকবর আলীই পাইয়া থাকেন। কিন্তু সে খাতির টুকুর মূলে, তাঁহার কার্যদক্ষতার গুণে সাহেব-সুবার সুনজর ব্যতীত আর কিছু ছিল কি না, তাহা সঠিক বলা যায় না।

বিদেশে অপরিচিত স্থানে একাধারে এহেন আশ্রয় ও সহায় পাইয়া আবদুল কাদের কতকটা আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু কবে চাকুরী জুটিবে, তত দিন কেমন করিয়া নিজের খরচ চালাইবে, আর কত দিনই বা বসিয়া পরের অন্ন ধ্বংস করিবে, ইহাই ভাবিয়া সে উতলা হইয়া উঠিল। সে আকবর আলীকে কহিল যে, যতদিন তাহার চাকুরী না হয়, ততদিনের জন্য তাহাকে একটা প্রাইভেট টুইশন যোগাড় করিয়া দিলে বড়ই উপকৃত হইবে।

আকবর আলী তাহাকে বুঝাইয়া কহিলেন,—যদিও বরিহাটিতে অনেক শিক্ষিত লোকের বাস আছে, কিন্তু সকলেই হিন্দু ; তাঁহাদের বাড়ীতে টুইশন পাওয়া অসম্ভব ; কেন না, একে তো তাঁহারা স্বজাতীয় লোক পাইতে অপরকে কাজ দিতে রাজীও হইবেন না, তাহার উপর আবার হিন্দু গ্রাজুয়েট, আণ্ডার গ্রাজুয়েটের অভাব নাই, সুতরাং মাত্র এন্ট্রান্স পর্যন্ত পড়া মুসলমানের পক্ষে এ শহরে টুইশনের প্রত্যাশা করা ধৃষ্টতা বই আর কিছু নহে। তবে নিতান্ত যদি আবদুল কাদের বেকার থাকিতে অনিচ্ছুক হন, তবে আকবর আলী সাহেবের পুত্রটিকে মাঝে মাঝে লইয়া বসিলে তিনি বড়ই উপকৃত হইবেন।

এ প্রস্তাবে আবদুল কাদের সানন্দে সম্মত হইল এবং আকবর আলী সাহেবকে বহু ধন্যবাদ দিয়া সেই দিন হইতেই তাঁহার পুত্রের শিক্ষকতায় লাগিয়া গেল। তাহার আগ্রহ এবং তৎপরতা দেখিয়া আকবর আলী মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন এবং যাহাতে সত্বর বেচারার একটা চাকুরীর যোগাড় করিয়া দিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে মাস দুইয়ের মধ্যেই একটি এপ্রেন্টিস্ সবরেজিস্ট্রারের পদ খালি হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল। আকবর আলী অবিলম্বে আবদুল কাদেরকে লইয়া ম্যাজিস্ট্রেট করবেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। করবেট সাহেব লোকটি বড় ভাল, যেমন কার্যদক্ষ, তেমনি খোশ্ মেজাজ। অধীনস্থ কর্মচারীগণের উপর তাঁহার মেহেরবানির সীমা নাই। দরিদ্র প্রজার সুখ দুঃখও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারে না এবং তাহাদের কিঞ্চিৎ উপকারের সুযোগ পাইলে তিনি তাহার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আকবর আলী তাঁহার সম্মুখে নীত হইয়া যথারীতি সালাম করিলে সাহেব বলিয়া উঠিলেন,—"গুড্‌মর্নিং, মুন্সী খবর কি?"

আকবর আলী কহিলেন,—"থ্যাঙ্ক ইউ, সার, খবর ভালই। আজ একটা দরবার নিয়ে হুজুরে হাজির হ'য়েছি।"

বলাবাহুল্য, কথা-বার্তা ইংরেজীতেই হইতেছিল।

সাহেব কহিলেন,—"কেন, আপনার ছেলের চাকুরী তো সে দিন হ'য়ে গেল ; আবার কিসের দরবার?"

"আপনার দয়াতেই আমার ছেলের চাকরী জুটেছে, সে জন্যে কি ব'লে আমি আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাব, তা ভেবে পাইনে..."

"না না, মুন্সী, ও দয়া-টয়া কিছু নয়, তবে উপযুক্ত লোক পেলে আমি অবশ্যই চাকরী দিয়ে থাকি..."

"সেই ভরসাতেই আজ একজন দুঃস্থ মুসলমান উমেদারকে সঙ্গে ক'রে এনেছি, সার! যদি হুকুম হয়..."

"আচ্ছা, তাকে আস্‌তে বল, দেখি।"

আকবর আলী তৎক্ষণাৎ বাহিরে গিয়া আবদুল কাদেরকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। আবদুল কাদের সালাম করিয়া দাঁড়াইলেন, করবেট সাহেব তাহার নাম, যোগ্যতা প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন—"ওয়েল, মুন্সী, এ তো এণ্ট্রান্স পাশ করে নাই। পাশ না হ'লে আজকাল তো গভর্ণমেণ্ট আফিসে চাকরী হওয়া কঠিন—তবে বিশেষ ক্ষেত্রের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।"

আকবর আলী কহিলেন,—"ইনি আফিসে কোন চাকরী চান না সার। সবরেজিষ্ট্রারীর জন্যে এপ্রেন্টিসী প্রার্থনা করেন..."

সাহেব কহিলেন,—সে তো আরও কঠিন কথা! আজকাল যে সব গ্রাজুয়েট, আণ্ডার গ্রাজুয়েট এসে সব-রেজিষ্ট্রারীর জন্যে উমেদারী ক'চ্ছে...।"

এণ্ট্রান্স ফেলও তো আপনার কৃপায় পেয়ে যাচ্ছে, সার!"

সাহেব একটু হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ও! আপনি উমাশঙ্কর বাবুর ছেলের কথা ব'লছেন? সে যে খুব সম্ভ্রান্ত বংশের লোক..."

"ইনিও কম সম্ভ্রান্ত বংশের লোক নন, সার! একবালপুরের জমিদারেরা যে কেমন পুরাতন ঘর তা সারের জানা আছে..."

সাহেব কহিলেন,—"ওঃ আপনি একবালপুরের সৈয়দ বংশের লোক বটে?—আপনার সঙ্গে আজ পরিচয় হওয়ায় বড়ই সুখী হ'লাম। তা আপনাদের মত বড় ঘরের ছেলের চাকরীর দরকার কি?"

আবদুল কাদের কহিল,—"আমাদের ঘরের অবস্থা আর আজ-কাল তেমন ভাল নেই, সার। এখন অন্য উপায়ে উপার্জন ক'ত্তে না পাল্লে সংসারই চালান কঠিন হ'য়ে প'ড়বে। আপনি একটু দয়া ক'ল্লে সার; আমার কষ্ট দূর হ'তে পারে।"

সাহেব একটু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন,—"মুসলমান জমিদার-ঘরের ছেলে হ'য়ে আপনি এমন কথা ব'লছেন! আমি দেখেছি, আপনাদের শ্রেণীর মধ্যে এমন লোকও আছে যে, ক্রমে দুরবস্থায় পড়েও গুমোর ছাড়ে না। লেখাপড়া শেখা, কি কোন ব্যবসায় অবলম্বন করা, ছোট লোকের কাজ ব'লে মনে করে—শেষটা তাদের বংশাবলীর ভাগ্যে হয় ভিক্ষা, না হয় জাল-জুয়াচুরী ছাড়া আর কিছুই থাকে না।"

আকবর আলী কহিলেন,—"আমাদের ভিতরকার অবস্থা সম্বন্ধে আপনার চমৎকার বহুদর্শিতা আছে সার।"

"হ্যাঁ, আমি অনেক ঘুরে ঘুরে দেখেছি বটে। দেখে শুনে সত্যিই আমার মনে বড় দুঃখ হয় এদের জন্যে। কিন্তু যতদিন এরা লেখাপড়ার দিকে মন না দিচ্ছে, ততদিন কিছুতেই কিছু হতে পারবে না। দেখ হিন্দুরা লেখা-পড়া শিখে কেমন উন্নতি ক'রে ফেলেছে—আফিসে আদালতে কি ব্যবসায়-বাণিজ্যে, যেমন সেখানে দেশীয় লোক দেখিতে পাই, কেবল হিন্দু—ক্বচিৎ কালে-ভদ্রে একজন মুসলমান নজরে পড়ে। ক্রমে ওরাই দেশের সর্বেসর্বা হ'য়ে উঠবে, দেখতে পাবেন, আপনারা কেবল কাঠ কাট্‌বার জন্যে প'ড়ে থাক্‌বেন।"

আকবর আলী কহিলেন,—"আজ-কাল দুই একজন ক'রে লেখা-পড়া শিখতে আরম্ভ ক'রেছে, সার, এই তো একজন আপনার কাছে হাযির ক'রেছি..."

"ও, এক আধ জন একটু শিখলে তাতে তো ফল হয় না, আর ইনি তো পাশও ক'র্তে পারেন নি..."

"প্রথম অবস্থায় এইটুকুতেই একটু উৎসাহ না পেলে লেখা-পড়ার দিকে লোকের উৎসাহ বাড়বে কেন, সার? প্রথম প্রথম তো আমরা হিন্দুদের সঙ্গে সমান সমান হ'য়ে প্রতিযোগিতা ক'র্ত্তে পারব না, কাজেই গভর্ণমেন্টের একটু বিশেষ নযর এ গরীবদের উপর থাক্‌বে ব'লে ভরসা করি।"

সাহেব কহিলেন,—"কিন্তু একথা মনে রাখবেন,মুন্সী সাহেব, চিরদিন যদি আপনারা ওই বিশেষ নযরের ওপর নির্ভর ক'রে থাকেন, তবে কখনই উন্নতি ক'রে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমকক্ষ হ'তে পারবেন না।"

"সে কথা খুবই ঠিক, সার। তবে বর্তমানে লেখা-পড়ায় একটু কম থাকলেও, সার বোধহয় দেখেছেন, মুসলমান কর্মচারীরা কাজ-কর্মে নিতান্ত মন্দ দাঁড়ায় না..."

"তা দেখেছি বটে। আবার অনেক সময় বি-এ পাশ দেখে লোক নিযুক্ত ক'রে আমাকে ঠক্‌তে হ'য়েছে। অবশ্য কেবল পাশ' হ'লেই সে লোক যোগ্য হ'ল তা নয়, তবু গভর্ণমেন্টের পক্ষে বাছাই ক'রবার ওটা একটা সহজ উপায় বটে। সেই জন্যেই পাশটা আমাদের দেখতে হয়।"

"তবু সার, এর বেলায় আপনি একটু বিশেষ দয়া না ক'রলে ভদ্রলোকের মারা প'ড়বার দশা। লেখা-পড়া শিখবার এঁর খুবই আগ্রহ ছিল, কিন্তু এদিকে বয়সও বেড়ে চ'ল্‌ল, অবস্থাতেও আর কুলাল' না, কাজেই চাকরীর চেষ্টা ক'র্ত্তে হচ্ছে। গরীবের ওপর আপনার যেমন মেহেরবানি, তাতেই এঁকে আজ আন্‌তে সাহস করেছি..."

সাহেব কহিলেন,—"আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দেবেন—এপ্রেন্টিসী খালি হ'লে আপনার বিষয় বিবেচনা করা যাবে।—আর মুন্সী, আপনি একটু নযর রাখবেন, সময়-মত আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবেন।"

আকবর আলী কহিলেন,—"সম্প্রতি একটা এপ্রেন্টিসী খালি হ'বার কথা শুন্‌ছি, সার। যদি হুকুম হয়, তবে আজই দরখাস্ত পেশ করি..."

"আচ্ছা ক'রতে পারেন, আমি আফিসে সন্ধান নিয়ে দেখব, খালি হ'চ্ছে কি না। যদি খালি হয়, তবে হয় তো পেতেও পারেন, কিন্তু আমি কোন অঙ্গীকার ক'র্ত্তে পারি নে, মুন্সী।"

"আপনি আশা দিলেন সার, তারই জন্যেই আমরা কৃতজ্ঞ।"

"অল রাইট, মুন্সী, গুড্‌মর্নিং!" বলিয়া কিঞ্চিৎ ঘাড় নাড়িয়া তাঁহাদিগকে সাহেব বিদায়-সূচক সম্ভাষণ করিলেন। তাহারাও "থ্যাংক ইউ ভেরী মাচ, সার, গুড্‌মনিং!" বলিয়া এক সেলাম করিয়া বিদায় লইলেন।

বাহিরের বারান্দায় কয়েকজন ডেপুটি বাবু, পেশকার, উমেদার প্রভৃতি সাহেবের সহিত সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন। আকবর আলী তাঁহাদিগকে স্মিত মুখে সালাম করিলেন; কেহ কেহ সে সালাম গ্রহণ করিলেন কেহ কেহ করিলেন না। তাঁহারা চলিয়া গেলে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ আর এক ব্যাটা নেড়ে এলো কোত্থেকে হে?"

পেশকার বাবু কহিলেন,—"সব কোত্থেকে জোটাচ্ছে, কে জানে! এক নেড়ে যখন ঢুকেছে, তখন নেড়েয় মক্কা হ'য়ে যাবে দেখতে পাবেন ;—আর আজ-কাল মুন্সীর তো পোয়া বারো! সাহেবের ভারী সুনযর! এই দেখুন না, কারু সঙ্গে সাহেব দুই তিন মিনিটের বেশী আলাপ করেন না, আর মুন্সী প্রায় ঘণ্টাখানেক ধ'রে সাহেবের সঙ্গে খোশ আলাপ ক'রে এল!" অপর এক বাবু কহিলেন,—"তা হবে না? আজ কাল যে ওরা গভর্ণমেন্টের পুষ্যিপুত্তুর হ'য়ে উঠেছে।" চাকরী খালি হ'লে এখন নেড়েরাই পাবে। নেড়ে এ্যাপয়েন্ট না ক'রতে পারলে আবার কৈফিয়ৎও দিতে হবে!..."

এমন সময় বাবুটির তলব হইল ; তিনি তাড়াতাড়ি চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া পকেট হাতড়াইয়া রুমাল বাহির করিয়া এক হাতে মুখ মুছিতে মুছিতে এবং আর এক হাতে চাপকানের দামন্ পা'ট করিতে করিতে দরজার চৌকাঠে ছোট খাট একটা হোঁচট খাইয়া সেটা সাম্‌লাইতে সাম্‌লাইতে সাহেবের কামরায় গিয়া প্রবেশ করিলেন।

১৮

হালিমাকে সঙ্গে লইয়া আবদুল্লাহ্ যখন গৃহে ফিরিল, তখন মাতা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। বহুদিন তিনি কন্যাকে দেখেন নাই ; ইতিমধ্যে তাহার একটি পুত্রও হইয়াছে। স্বামীর মৃত্যুতে তিনিও দারুণ শোক পাইয়াছেন, এক্ষণে শোকের ও আনন্দের যুগপৎ উচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া কন্যাকে কোলে টানিয়া লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, আবার পরক্ষণেই তাহার পুত্রটিকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুসিক্ত মুখে হাসিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সে যখন তাহার অজস্র চুম্বনে অস্থির হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল, তখন তিনি তাহাকে ভুলাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কোলের উপর নাচাইয়া কাক, বিড়াল, মুর্গী, যাহা যেখানে ছিল, সব ডাকিয়া, এটা-ওটা-সেটা দেখাইয়া তাহাকে হাসাইয়া দিলেন।

কিন্তু এ আনন্দের মধ্যেও তাঁহার মনের কোণে দুইটি কারণে দুঃখের কুশাঙ্কুর বিঁধিয়া রহিল,—বউ আসে নাই, সে এক কারণ, আর আবদুল্লার পড়ার কোন বন্দোবস্ত হইল না, সেই আর এক কারণ। আবদুল্লার শ্বশুর তো সাহায্য করিতে রাজী হইলেন না ; মীর সাহেব যদিও সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া তিনি আবদুল্লার মুখে শুনিলেন, কিন্তু সে সাহায্য গ্রহণ করা তিনি ভাল বিবেচনা করিলেন না। সুতরাং আর কোন উপায় নাই; আবদুল্লাকে চাকুরীর সন্ধানেই বাহির হইতে হইবে। আবার বাহির হইতে হইলে কিছু খরচ-পত্র চাই, তাহারও যোগাড় করা দরকার ; এই সকল কথা ভাবিয়া মাতা বড়ই অস্থির হইয়া উঠিলেন।

কয়েকদিন ধরিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া টাকা সংগ্রহের কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া শেষে পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন,—"বিদেশে যাবি বাবা, কিছু টাকা তো হাতে রাখ্‌তে হয়! তা আমার যা দুই একখানা গয়না আছে সেগুলো বেচে ফেল।"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"কিই বা এমন আছে, আম্মা, ও-গুলো না হয় ঘর ব'লে থাক্। আমি যোগাড় ক'রে নেব'খন......।

"কোথা থেকে যোগাড় ক'রবি, বাবা?"

হালিমা কহিল,—"আমার হাতে কিছু আছে, ভাইজান, আমি দিচ্ছি।"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"না না, ও টাকা থাক্, সময়ে-অসময়ে কাজে লাগ্‌বে......"

হালিমা বাধা দিয়া কহিল,—"তা বেশ তো, আপনার অসময় পড়েছে, ভাইজান, তাইতো কাজে লাগাতে চাচ্ছি। কেন মিছি-মিছি ধার-কর্জ ক'ত্তে যাবেন। এই টাকাই নেন, তার পর খোদা যদি দিন দেন, তখন না হয় আবার আমাকে দেবেন।"

মাতাও হালিমার এই প্রস্তাবে মত দিলেন। অগত্যা তাহাকে ভগ্নীর নিকট হইতেই টাকা লইতে রাজী হইতে হইল।

স্থির হইল, সে প্রথম কলিকাতায় গিয়া তাহাদের পুরাতন মেসে বাসা লইবে এবং চাকুরীর সন্ধান করিবে। আবদুল্লাহ্ আশা করিয়াছিল, কলিকাতায় গেলে নিশ্চয়ই একটা কিনারা করিতে পারিবে। সে বিশাল নগরীতে শত-সহস্র লোক উপার্জন করিতেছে, চেষ্টা করিলে তাহারও কি একটা উপায় হইবে না! আশায় উৎসাহে সে কলিকাতায় যাইবার আয়োজন করিতে লাগিল।

এমন সময় বরিহাটি হইতে আবদুল কাদেরের এক পত্র আসিল। অনেক দিন পরে তাহার পত্র পাইয়া আবদুল্লাহ ক্ষিপ্রহস্তে খুলিয়া এক নিশ্বাসে পড়িয়া "আম্মা, আম্মা" "হালিমা হালিমা" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে বাড়ীর ভিতর ছুটিয়া আসিল। তাহার ব্যস্ততা দেখিয়া মাতা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি, কি আবদুল্লাহ্ কি হ'য়েছে?"

"আবদুল কাদেরের চাক্‌রী হয়েছে, আম্মা!"

"আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহ্! কি চাকুরী পেয়েছে বাবা?"

"সবরেজিষ্টার হ'য়েছে—এখন উমেদারী ক'চ্ছে, তাতেও মাসে কুড়ি টাকা ক'রে পাবে, এর পরে পাকা চাকরী পেলে মাসে একশ কি দেড়শও পেতে পারে।"

শুনিয়া মাতা খোদার কাছে হাজার হাজার "শোকর" করিতে লাগিলেন। হালিমা তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল ; আনন্দে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। শ্বশুরালয়ে একেবারেই তাহার মন টিকিত না ; এইবার খোদার ফযলে স্বামীর যখন চাকরী হইয়াছে, তখন নিজের সংসার গুছাইয়া পাতিয়া লইয়া পছন্দ-মত থাকিতে পারিবে, ইহাই মনে করিয়া সে মনে মনে বেশ একটা সোয়াস্তি অনুভব করিল।

মাতা একটু ভাবিয়া কহিল,—"তা তুইও ওই চাকরীর চেষ্টা কর্ না বাবা!

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"সেও তো তাই লিখেছে, আর আমাকে বরিহাটে যেতেও ব'লেছে। কিন্তু ওদিকে যে আর পড়া-শুনা করা যাবে না। আমার ইচ্ছে, মাষ্টারী ক'রে বি-এটা পাশ করি। বি-এ পাশ ক'ত্তে পাল্লে ও সবরেজিষ্ট্রারীর চাইতে ঢের ভাল চাকরী পাওয়া যাবে—আর না হ'লে ওকালতীও তো করা যাবে।"

সংসারের উপস্থিত টানাটানির কথা ভাবিয়া মাতা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন ; কিন্তু পুত্রের সঙ্কল্পের কোন প্রতিবাদ করিলেন না। কহিলেন,—"আচ্ছা বাবা, যা ভাল বোঝ, তাই কর। খোদা এক রকম ক'রে চালিয়ে নেবেন!"

এদিকে আবদুল্লাহ্ রওয়ানা হইবার সময় নিকট হইয়া আসিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি আবদুল কাদেরের পত্রের জবাব লিখিয়া ফেলিল। তাহাতে পিতার মৃত্যুর-সংবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার শ্বশুর-বাড়ীর ঘটনা এবং চাকুরীর সন্ধানে কলিকাতায় যাওয়ার বন্দোবস্তের কথা পর্যন্ত মোটামুটি লিখিয়া দিল এবং কলিকাতায় গিয়া কোথায় থাকিবে, কি করিবে না করিবে সে সকল বিষয় সেখানে গিয়া পরে জানাইবে, তাহাও বলিয়া রাখিল।

যাত্রাকালে মাতা কহিলেন,—"একটা খোশ-খবর দিয়ে যাত্রা করলি বাবা, খোদা বোধ হয় ভালই করবেন।" 'বিসমিল্লাহ্' বলিয়া আশায় বুক বাঁধিয়া আবদুল্লাহ্ রওয়ানা হইয়া গেল।

কিন্তু যে আশা ও উৎসাহ লইয়া আবদুল্লাহ্ কলিকাতায় আসিল, দু'দিনেই তাহা ভঙ্গ হইয়া গেল। কোন স্কুলেই মাষ্টারী জুটিল না। কলিকাতায় এক মাদ্রাসা ভিন্ন তখন আর কোন মুসলমান স্কুল ছিল না ; সেখানে একটা চাকরী খালি পাইয়াও, আর একজন বিহারবাসী উমেদারের বিপুল সুপারিশের আয়োজনের সম্মুখে সে তিষ্ঠিতে পারিল না।

এইরূপে কয়েক মাস বেকার কাটিয়া গেল। হালিমা যে কয়েকটি টাকা দিয়াছিল, তাহাও প্রায় ফুরাইয়া আসিল, অথচ উপার্জনের কোনই কিনারা হইল না। এদিকে আবদুল্লাহ্ কাহারও বাড়ীতে গৃহ শিক্ষকের কাজও খুঁজিতেছিল। কিন্তু মুসলমানদের ঘরে বড় জোর পাঁচ টাকায়

আম্‌পারা এবং উর্দু পড়াইবার কাজ মিলিতে পারে ; তাও আবার ইংরেজী পড়া লোক দেখিলে লোকে আমল দিতে চায় না। যাহা হউক, অনেক অনেক অনুসন্ধানের পর অবশেষে মৃজাপুরের জনৈক ধনী চামড়া-ওয়ালার বাড়ীতে আহার ও বাসস্থানসহ পনর টাকা বেতনে দুইটি বালকের শিক্ষকতা পাইয়া আবদুল্লাহ্ আপাততঃ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

কিন্তু গৃহ-শিক্ষকের কাজ করিয়া বি-এ পাশ করিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে না। প্রাইভেট দিতে হইলে কোন স্কুলে মাষ্টারী করা চাই ; আর কলেজে পড়িতে গেলে এ সামান্য বেতনে চালান কঠিন, তবে যদি ফ্রী ষ্টুডেন্ট হইতে পারে, তাহা হইলে ঐ পনরটি টাকা হইতে অন্ততঃ বারটি করিয়া টাকা মাসে মাসে মাকে পাঠাইতে পারিবে। কিন্তু এ-বৎসর আর সময় নাই ; এখন এইভাবেই চলুক ; আগামী গ্রীষ্মের বন্ধের পর কোন কলেজে ফ্রী পড়িবার জন্য চেষ্টা করা যাইবে। আর ইতিমধ্যে যদি একটা মাষ্টারী কোন স্কুলে জুটিয়া যায়, তবে তো কথাই নাই, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া প্রাইভেট পরীক্ষা দিতে পারিবে।

সৌভাগ্যক্রমে চাকুরীর জন্য আবদুল্লাকে অধিক দিন বসিয়া থাকিতে হইল না। কলিকাতায় আসার পর সে আবদুল কাদেরের সহিত রীতিমত পত্র ব্যবহার করিতেছিল। ইতিমধ্যে তাহার নিকট হইতে সংবাদ পাইল যে, বরিহাটির গভর্ণমেণ্ট স্কুলে একজন মুসলমান আণ্ডার গ্রাজুয়েট চাই, বেতন চল্লিশ টাকা। বিলম্বে ফস্কাইয়া যাইতে পারে, সুতরাং আবদুল্লাহ্ যেন পত্র পাঠ করিয়া আসে।

আবার আবদুল্লার মন আশার আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সেই দিন রাত্রের মেলে রওয়ানা হইয়া পর দিন বরিহাটিতে গিয়া উপস্থিত হইল। আবদুল কাদের তাহাকে দেখিয়া এত খুশী হইল যে, আবদুল্লাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া কহিল,—"ভাই, খোদার মরজিতে যদি তুমি এ চাকরীটা পাও, তবে আমরা দু'জনে এক জায়গাতেই থাক্‌তে পার্‌ব।"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"দাঁড়াও ভাই, আগে পেয়েই তো নিই। তুমি যে "গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল" গোছ ক'চ্ছ।"

"আরে না না, শুনলাম এবার নাকি ডিরেক্টর অফিস থেকে চিঠি এসেছে, একজন মুসলমান নিতেই হবে। আর ক্যাণ্ডিডেট কোথায়? থাক্‌লেও ভয় নেই খোদার ফযলে। আমাদের মুন্সী সাহেবের সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেটের খুব খাতির—আর তিনিই স্কুল-কমিটির প্রেসিডেন্ট কি না। ও এ্যাপয়ণ্টমেণ্ট তাঁরই হাতে। মুন্সী সাহেবকে সঙ্গে দিয়ে তোমাকে কালই ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি দাঁড়াও।"

আবদুল কাদেরের আশাপূর্ণ কথায় আবদুল্লাহ্ মনে মনে অনেকটা বল পাইল। সে ভাবিল,—চল্লিশ টাকা তাহার জন্যে এখন খুবই যথেষ্ট হইবে ; বাসা খরচ পনর টাকা করিয়া লাগিলেও পঁচিশ টাকা সে মাকে পাঠাইতে পারিবে—আর আবদুল কাদেরও হালিমাকে মাসে মাসে পাঁচটি করিয়া টাকা পাঠাইতেছে। ওঃ, খোদা চাহে তো সংসারের আর কোনই ভাবনা থাকিবে না।

এইরূপ কল্পনা-জল্পনা করিতে করিতে আবদুল্লাহ্ আহারাদি করিয়া একখানি দরখাস্ত লিখিয়া হেড মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করিতে চলিল। স্কুলে উপস্থিত হইয়া জনৈক ভৃত্যকে হেড মাষ্টারের কামরা কোথায় জিজ্ঞাসা করিল। সে একবার আবদুল্লার আপাদমস্তক ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া কহিল,—একখানা কাগজে নাম এবং কি জন্য দেখা করিতে চাহেন তাহা লিখিয়া দিতে হইবে। আবদুল্লাহ্ তাহাই লিখিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে ভৃত্যটি আসিয়া তাহাকে হেড মাষ্টারের কামরায় লইয়া গেল।

আবদুল্লাহ্ কামরায় প্রবেশ করিতেই হেড মাষ্টার চেয়ার হইতে উঠিয়া সবেগে তাহার সহিত করমর্দন করিলেন এবং হাত মুখ নাড়িয়া অদ্ভুত বিকৃত উচ্চারণে বলিয়া ফেলিলেন—"আইয়ে জনাব, বয়ঠিয়ে আপ কাহাঁসে আস্‌তে হাঁয়?"

আবদুল্লাহ্ বিনয়ের সহিত কহিল,—"সার আমি বাঙ্গালী, আমার সঙ্গে বাঙ্গালাতেই কথা বল্‌তে পারেন।"

হেড মাষ্টার একটু ঘাড় নীচু করিয়া তাঁহার নাসিকার মধ্যস্থিত চশমাটার উপর হইতে আবদুল্লার দিকে নেত্রপাত করিয়া কহিলেন,—"ওঃ হো! আপনি বাঙ্গালী? বেশ, বেশ, আপনার পোশাক দেখে আমি ঠাউরেছিলাম যে, আপনি দিল্লী কিংবা লাহোর না হোক, অন্ততঃ ঢাকা কিংবা মুর্শিদাবাদ অঞ্চল থেকে এসেছেন। সেখানকার নবাব ফ্যামিলির লোকেরা এই রকমই পোশাক পরেন কিনা!"

আবদুল্লাহ্ একটুখানি হাসিয়া কহিল,—"কেন, মুসলমানেরা সব জায়গাতেই তো এই রকম আচকান আর পায়জামা পরে..."

"কই মশায়, আমি তো দেখতে পাই এখানে কেউ টুপিটা পর্যন্ত পরে না। তা এরা সব—এই—ছোট লোক কিনা, চাষা—ভূষো; এ সব পোশাক ওরা কোত্থেকে পাবে।"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"হ্যাঁ, তা সম্ভ্রান্ত লোকমাত্রেই এই রকম পোশাক ব্যাভার করেন..."

"তা বই কি! তবে আপনার মত সম্ভ্রান্ত লোক এ অঞ্চলে ক'টিই বা আছেন।"

আবদুল্লাহ্ একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—"মশাইয়ের কাছে একটা দরবার নিয়ে এসেছিলাম..."

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি বুঝি এই পোষ্টটার জন্যে ট্র্যাও ক'র্ত্তে চান? তবে কি জানেন, এ-তে মাইনেও অতি সামান্য, প্রসপেক্ট ত' কিছু নেই, আ—পনাদের মত লোকের কি আর এসব চাকরী পোষাবে? আমি তাই ভাবছি।"

"আমাদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ সার। বি-এ প'ড়ছিলাম হঠাৎ আমার 'ফাদার' মারা গেলেন, কাজেই আর পড়া-শুনো হ'লো না, আর এখন চাকরী ছাড়া সংসার চালাবার উপায় নেই।"

"ওঃ বটে? তবে তো বড়ই দুঃখের বিষয়। তা আপনি একটু চেষ্টা ক'ল্লে খুব ভাল চাকরীই পেতে পারেন। ডেপুটি না হোক্ সাব্‌ডেপুটি তো চট্ ক'রে হয়ে যাবেন। কেন মিছি-মিছি এই সামান্য মাইনের চাকরী ক'রবেন, এতে না আছে পয়সা, না আছে ইজ্জৎ..."

"আমার তেমন মুরুব্বী নেই সার, আর ডেপুটি সাব-ডেপুটি ও সব বি-এ পাশ না হ'লে হয় না..."

"কে ব'লেছে আপনাকে? আপনাদের বেলায় ও-সব কিছুই লাগে না। একবার গিয়ে দাঁড়ালেই হ'ল। আজকাল যেসব গভর্ণমেন্ট সার্কুলার বেরুচ্ছে, মুসলমান হ'লেই সে চাকরী পাবে, তা কি আপনি জানেন না?"

"শুনেছি বটে, কিন্তু মুসলমান হ'লেই তো হয় না ; উপযুক্ত যোগ্যতা থাকা চাই, আবার যোগ্য লোকদের মধ্যেও 'কম্‌পিটিশন' আছে। যার ভাল সুপারিশ নেই, তার পক্ষে, যোগ্য হলেও ও-সব বড় চাকরীর আশা করা বিড়ম্বনা।"

হেড মাষ্টার বামপার্শ্বস্থ জানালার বাহিরে দৃষ্টিস্থাপন করিয়া টেবিলের উপর অঙ্গুলির আঘাত করিতে করিতে কহিলেন,—"ভুল ভুল! এম্‌নি ক'রেই আপনারা নিজেদের প্রস্‌পেক্ট মাটি করেন।"

তাহার পর আবদুল্লার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"আমি আপনার ভালর জন্যেই পরামর্শ দিচ্ছিলাম, একটু চেষ্টা ক'ল্লেই আপনি এর চেয়ে ভাল চাকরী পেতেন। সবরেজিষ্ট্রারীও তো মাষ্টারীর চাইতে অনেক ভাল। এই তো সেদিন আপনাদেরই জাতের একজন সবরেজিষ্ট্রারী পেয়ে গেল, সে তো ফোর্থ ক্লাস পর্যন্তও প'ড়েনি। এক কলম ইংরেজী লিখতে পারে না, কওয়া তো দূরের কথা। হাতের লেখাও একেবারে ছেলে মানুষের মত, তবু সাহেব কেবল মুসলমান দেখেই তাকে চাকরী দিয়েছেন......"

"আপনি কি আবদুল কাদেরের কথা ব'লছেন,—এই মাস তিন চার হ'ল এপ্রেন্টিস হ'য়েছে!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ তারই কথা বলছি আপনি তাকে জানেন তা হ'লে?"

"জানি একটু একটু।"

"তবে দেখুন দেখি, সে এই বিদ্যে নিয়ে চাক্‌রীটা পেলে, আর আপনি বি-এ পর্যন্ত প'ড়ে ডেপুটি হ'তে পারবেন না।"

"তার সম্বন্ধে বোধহয় আপনি ঠিক খবর পাননি সার। এণ্ট্রান্স পর্যন্ত পড়েছে, আর এণ্ট্রান্স পর্যন্ত পড়া অনেক হিন্দুই যখন সবরেজিষ্ট্রার হতে পেরেছেন, তখন সে হিসেবে আবদুল কাদেরকে তো অযোগ্য বলা যায় না। আর এ-দিকে সে ইংরেজীও খুব ভালই জানে, হাতের লেখাও চমৎকার! এই দেখুন, তার একখানা চিঠি আমার পকেটে ছিল, প'ড়ে দেখতে পারেন।"

হেড মাষ্টার চিঠি খানি পরম আগ্রহের সহিত হাত বাড়াইয়া লইলেন এবং ঘাড় উঁচু করিয়া দূর হইতে চশ্‌মার ভিতর দিয়া গভীর মনোযোগের সহিত চিঠিখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলেন। পরে চশ্‌মার উপর দিয়া আবদুল্লার দিকে তাকাইয়া কহিলেন,—"বটে? এ তো দেখছি বেশ লেখা! আর ইংরেজীও খাসা ; কে ব'লতে পারে এণ্ট্রান্স পড়া লোকের লেখা! একেবারে বি-এ পাশের মত ব'লেই বোধ হচ্চে! আমি নিশ্চয়ই আর কারুর কথা শুনেছিলাম। কি জানেন, আপনাদের নামগুলো সকল সময় মনে থাকে না, তাই কার কথা শুনি আর কাকে মনে করি। তা যাক্‌ আপনি তা হ'লে এই পোষ্টের জন্যেই এ্যাপ্লাই ক'রবেন, স্থির করেছেন।"

"হ্যাঁ, সার, এ্যাপ্লিকেশনও সঙ্গে এনেছি।" বলিয়া আবদুল্লাহ্ দরখাস্তখানি পেশ করিল। হেড মাষ্টার সেখানি এক নজর দেখিয়া লইয়া টেবিলের উপর চাপা দিয়া রাখিলেন এবং কহিলেন,—"বেশ, এখন রইল আপনার এ্যাপ্লিকেশন। এখনও এ্যাপয়েন্টমেন্টের দেরী আছে। সময় মত খবর পাবেন।"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"তবে এখন উঠি, সার। দয়া ক'রে মনে রাখবেন, এটা পেলে আমার বড্ড উপকার হবে..."

"তা নিশ্চয়ই—আপনাকে আর ও সম্বন্ধে কিছু ব'লতে হবে না, আমার যতদূর সাধ্য আপনার জন্যে চেষ্টা ক'রব।"

আবদুল্লাহ্ তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইল। সে দিন সন্ধ্যার পর আকবর আলীর বৈঠকখানায় আবদুল্লার উমেদারীর প্রথম অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল। হেড মাষ্টারের সঙ্গে তাহার যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল তাহা সবিস্তারে শুনিয়া আকবর আলী কহিলেন,— "আপনি খুব টিকে গিয়েছেন, যা হোক্।"

আবদুল্লাহ্ কৌতূহল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"টিকে গেলাম কেমন?"

"লোকটার চেষ্টা ছিল, আপনাকে খুব 'আমড়াগাছী' করে ও ছোট চাকরী যাতে আপনি নিতে না চান তাই করা। দেখুন না, প্রথমেই আপনাকে নবাব ফ্যামিলীর সঙ্গে তুলনা করে দিলে—তারপরে বল্লে মুসলমান হলে বড় চাকরী পায়, পাশ-টাশের দরকার হয় না—এই সব শুনে টুনে হয় তো আপনার মাথা ঘুরে যেত..."

"তা আমাকে ভোগা দিয়ে ওঁর কি লাভ? এ পোষ্টে তো মুসলমানই নেবে ব'লে এ্যাড্‌ভারটাইজ করেছে..."

"তা ক'রুক। যদি মুসলমান ক্যাণ্ডিডেট্ কেউ এ্যাপ্লাই না করে, তাহ'লে তো শেষটা হিন্দুই ওটা পাবে।"

আবদুল্লাহ্ এতটা তলাইয়া দেখে নাই। এক্ষণে আকবর আলী সাহেবের নিকট গূঢ়ার্থ অবগত হইয়া সে একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেল। রাত্রে শুইয়া শুইয়া সে অনেকক্ষণ ভাবিল, পরস্পর সহৃদয়তার এমন অভাব যেখানে সেখানে মানুষ শান্তিতে বসবাস করে কেমন করিয়া!

আর যদি সে এ চাকুরী পায়, তাহা হইলে এরূপ লোকের অধীনে কাজ করিয়া তা সুখ পাইবে না! যা হোক্, খোদা যা করেন, ভালই করিবেন, এটা বলিয়া সে আপাততঃ মনকে প্রবোধ দিল।

পরদিন আকবর আলী তাহাকে সঙ্গে লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। সাহেব কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে পারিলেন না, তবে যদি যোগ্যতর লোক না পাওয়া যায়, তাহা হইলে আবদুল্লার বিষয়ে বিবেচনা করিবেন বলিয়া ভরসা দিলেন। আবদুল্লাহ্ সেই রাত্রেই কলিকাতায় ফিরিয়া গেল।

যথাসময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠিতে কমিটির অধিবেশন হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং প্রেসিডেন্ট, হেড মাষ্টার সেক্রেটারী এবং একজন ডেপুটি, এক জন উকীল ও এক জন স্থানীয় জমিদার এই তিন জন বাকী মেম্বর। আবদুল্লাহ্ ব্যতীত আর এক জন মাত্র মুসলমান দরখাস্ত দিয়াছে সে লোকটি এফ-এ পাশ এবং কিছুদিন অন্যত্র মাষ্টারীও করিয়াছে। হেড মাষ্টার তাহাকেই উপযুক্ত বলিয়া পছন্দ করিলেন। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আবদুল্লাকেই অধিক যোগ্য বলিয়া মত দিলেন। হেড মাষ্টার কহিলেন—'উহার শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু ইহার নাই।' সাহেব কহিলেন,—"এ ব্যক্তি বি-এ পর্যন্ত পড়িয়াছে, সুতরাং ও ব্যক্তি অপেক্ষা কিছু বিদ্বান, এবং ইহার হাতের লেখাও সুন্দর, দেখিলে লোকটিকে বেশ দক্ষ বলিয়া ধারণা হয়।" তাহার পর তিনি মেম্বরগণের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন যে, তাঁহার মতের অপেক্ষা না করিয়া মেম্বরগণ স্বাধীনভাবে মত দিতে পারেন। অবশ্য যাহার পক্ষে ভোট অধিক হইবে, সেই চাকুরী পাইবে, তা সাহেব নিজে যাহাকেই পছন্দ করুন না কেন! ফলে কিন্তু মেম্বরত্রয় সাহেবের মতেই মত দিয়া ফেলিলেন। আবদুল্লাহ্ চাকুরী পাইল।

কুঠি হইতে বাহিরে আসিয়া পথে চলিতে চলিতে জমিদার বাবুটি হেড মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি সাহেবের বিরুদ্ধে ও লোকটার জন্যে এত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন কেন। হেড মাষ্টার কহিলেন,—"আরে মশায়, আপনারা কেউ আমার দিকে ভোট দিলেন না, তা আর কি ক'রব। আমারই ভুল হ'য়ে গেল। আর সাহেব যে ওর দিকে ঝুঁকে প'ড়বেন, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আগে থেকে আপনাদের যদি একটু ব'লে রাখি, তা হ'লে আজ ভোটে ঠিক মেরে দিয়াছিলাম মশায়। সাহেব লোক ভাল, মেম্বরদের মত দেখলে তিনি কখনই জেদ ক'স্তেন না।"

উকীল বাবুটি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তা ও দু'ব্যাটাই তো নেড়ে, ওর আবার ভাল মন্দ কি? একটা হ'লেই হ'ল।"

হেড মাষ্টার কহিলেন—"আরে না মশায়, এর ভেতর কথা আছে। এ লোকটা পি-এল্ লেক্‌চার কমপ্লান্ট ক'রেছে, এখন এক্‌জামিন দিয়ে পাশ কল্লেই চাকরী ছেড়ে দেবে আমি সঠিক খবর জানি। ছেড়ে দিলে একটা 'প্লী' হ'ত নেড়েগুলো 'ষ্টিক্' করে না তাতে কাজের বড্ড 'ডিস্‌লোকেশন' হয়। তার পর নিজেদের একটা লোক নেওয়া যেত।"

উকীল বাবুটি একটু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন,—"আপনি একটু আগে কেন বলেন নি? আমরা তো এর কিছুই জানিনে। জান্‌লে নিশ্চয়ই এর জন্যে ভোট দিতাম। বলা উচিত ছিল আপনার আগে।"

হেড মাষ্টার কহিলেন,—"কে জানে মশায়, এত গণ্ডগোল হবে। ভেবেছিলাম, আমি যাকে 'ফিট' ব'লে দেব, সাহেব তাতেই রাজী হবে। যাক্ ওর বরাতে আছে, আমি কি ক'রব!"

১৯

একবালপুরে সৈয়দ-বাড়ীতে আজ মহা ধুম পড়িয়া গিয়াছে। আবদুল মালেকের শ্বশুর শরীফাবাদের হাজী বরকত্ উল্লাহ্ সম্প্রতি মক্কাশরীফ হইতে ফিরিয়া বৈবাহিকের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন!

হাজী সাহেব বড় যে-সে লোক নহেন ; কি ভূসম্পত্তিতে, কি বংশ মর্যাদায়, বরিহাটি জেলায় আশরাফ সমাজে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ নাই। এমন কি আমাদের সৈয়দ আবদুল কুদ্দুসও তাঁহার সহিত কুটুম্বিতা করিতে পারিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন! করিবারই কথা ; কেন না হাজী সাহেবের পিতা শরীয়তুল্লাহ্ মাত্র পনের দিনের দারোগাগিরির দৌলতে যখন এক বিপুল সম্পত্তি খরিদ করিয়া দেশের মধ্যে এক জন গণ্যমান্য লোক হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরাফতের দরজাও অতিমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছিল এবং যদিও লোকে বলে যে পঞ্চদশ দিবসে ভোর বেলায় ওযু করিবার সময় এক মস্ত বড় ডাকাতি-ব্যবসায়ী জমিদার সদ্য-খুন করা লাশ সমেত তাঁহার নিকট ধরা পড়িয়া হাজার টাকা ঘুষ কবুল করিয়াছিল এবং টাকার তোড়া আনিবার জন্য যে লোকটিকে সে বাড়ীতে পাঠাইয়াছিল, সে দিশাহারা হইয়া টাকার পরিবর্তে মোহরের তোড়া আনিয়া নূতন দারোগা সাহেবকে দিয়া ফেলিয়াছিল এবং তাহারই বলে শরীয়তুল্লাহ্ পঞ্চদশ দিনের চাকুরীতে ইস্তাফা দিয়া হঠাৎ জমিদারী ক্রয় করিয়া বসিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার সাহেবজাদা বরকত্উল্লার পক্ষে বরিহাটি জেলায়, এমন কি বঙ্গদেশের মধ্যে একেবারে অতি আদি শরীফতম ঘর দ্বারা পরিচিত হইতে কোনও বাধা বিঘ্ন ঘটে নাই।

সুতরাং একে তো বরকতুল্লাহ্ মস্ত বড় মানী লোক, তাহার উপর আবার এক্ষণে হাজী হইয়া সমাজে তাঁহার সম্ভ্রম আরও বাড়িয়া গিয়াছে ; কাজেই তাঁহার শুভাগমনে সৈয়দ-বাড়ী আজ পবিত্র হইয়াছে এবং মনিব চাকর, ছোট-বড় সকলেই তাঁহার উপযুক্ত খাতির তোয়াজ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে।

বেলা প্রায় তিন প্রহরের সময় আহারাদি শেষ করিয়া সৈয়দ সাহেব বৈবাহিকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনিতে বসিলেন। হাজী সাহেব মক্কা মওয়াজ্জমা মদিনা মুনা'ওয়ারা, দামেশক্, বাগদাদ প্রভৃতি আরবের বহু পবিত্র স্থান দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন, একে একে সে সকলের বর্ণনা করিয়া তিনি সৈয়দ সাহেবকে চমৎকৃত ও ঈর্ষান্বিত করিয়া তুলিলেন। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে দান করিয়া তাঁহাদের জীবন ধন্য করিবার জন্য হাজী সাহেব পুণ্য ভূমি হইতে নানা প্রকার পবিত্র বস্তু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। বৈবাহিক তাহা হইতে বঞ্চিত হইলেন না ; হাজী সাহেব তোরঙ্গ খুলিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ শুকনা উটের গোশ্ত, একটুখানি জমজমের পানি এবং 'কাবা'র গেলাফের এক টুক্রা বাহির করিয়া দিলেন। সৈয়দ সাহেব এই সকল পবিত্র বস্তু পাইয়া যে কি অপার আনন্দ লাভ করিলেন, তাহা আর বলিয়া শেষ করিতে পারিলেন না। তিনি কহিতে লাগিলেন,—"ভাই সাহেব, আপনি এ গরীবের কথা মনে ক'রে যে কষ্ট ক'রে এ সব পাক চীজ ব'য়ে এনেছেন, তাতে আমি বড়ই সরফরাজ হ'লাম। কি ব'লে আর দোয়া ক'রব ভাই-জান, খোদা আপনার নসীব 'কোশাদা' করুন! খাস ক'রে এই যে গেলাফ পাকের কাপড়টুকু আপনি দিলেন, এতে আমাদের ঘর আজ পাক হ'য়ে গেল। এ চীজ যার ঘরে থাকে তার যত 'মসীবত' সব কেটে যায়। এমন চীজ কি আর দুনিয়াতে আছে, আহা' "হুচ্" বলিয়া তিনি কাপড়ের টুক্রাটিতে বহুত তাজিমের সঙ্গে 'বোসা' (চুম্বন) দিলেন, এবং উহা দুই চক্ষে, কপালে এবং বক্ষে ঠেকাইয়া অতি যত্নে তুলিয়া রাখিলেন।

তাহার পর জম্‌জমের পানি একটুখানি শিশি হইতে ঢালিয়া লইয়া পান করিলেন এবং দেহ ও মনে পরম তৃপ্তি ও এক অভিনব পবিত্রতা অনুভব করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন।

কিন্তু এক্ষণে উটের গোশ্তটুকু লইয়া কি করা যায়? উহা তো শুকাইয়া একেবারে হাড় হইয়া গিয়াছে ; খাওয়া যাইবে না। হাজী সাহেব কহিলেন,—"ইহা কোর্‌বানীর গোশ্ত ; খাস মক্কা মওয়াজ্জমাতেই কোর্‌বানী হ'য়েছিল, এর বরকতই আলাদা। এটুকু ঘরে রাখাই ভাল, কারুর ব্যারাম-পীড়ার সময় কাজে লাগবে।"

সৈয়দ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ক'রতে হয়?"

হাজী সাহেব কহিলেন—"কিছু না একটুখানি ব'সে, "বিস্‌মিল্লাহ্" ব'লে খাইয়ে দিলেই হ'ল।"

সৈয়দ সাহেব শুক্না মাংসখণ্ডটিও সযত্নে তুলিয়া রাখিলেন।

কথা-বার্তায় ক্রমে 'আসর'-এর আযান পড়িয়া গেল। উভয়ে ওযূ করিয়া মসজিদের দিকে চলিলেন। মসজিদটি এখনও অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে দেখিয়া হাজী সাহেব একটু আশ্চর্যান্বিত হইয়া কহিলেন,—"একি! আপনি এ কাজ এতদিন ফেলে রেখে দিয়েছেন?"

সৈয়দ সাহেব একটু বিষাদের সুরে কহিলেন,—"না, ভাই সাহেব ফেলে রেখে দিই নি, পেরে উঠছিনে।"

"বাঃ আপনার মত লোকের না পেরে ওঠার তো কথাই নয়। এতে যে আপনার গোনাহ্ হ'চ্ছে তা কি বুঝতে পাচ্ছেন না! খোদার কাজে হাত দিয়ে এমন ক'রে ফেলে রাখা—এতে যে 'হেকারত' করা হ'চ্ছে!"

"তা তো বুঝি, ভাই সাহেব ; আজ প্রায় তিন বৎসর হ'ল কাজে হাত দিইছি, বছর খানেক কাজ চালিয়ে এই পর্যন্ত ক'রে তুলেছি! কিন্তু গেল দুই বছর থেকে আমার যে কি দশা ধ'রেছে, কিছুতেই গুছিয়ে উঠতে পাচ্ছিনে। কি ব'লব ভাই সাহেব, এর জন্যে আমার রাত্রে ঘুম হয় না। এ দিকে ব্যারাম-পীড়ায় কাতর হ'য়ে পড়িছি, কেবল ভয় হয়, কোন্ দিন দম বেরিয়ে যাবে, এ-কাজটা খোদা আমার দ্বারা বুঝি আর করাতে দেবেন না—কি যে কেস্‌মতে আছে, তা সেই 'পরওয়ার দেগার'ই জানেন!"

হাজী সাহেব গম্ভীর হইয়া কহিলেন,—"আপনার মুখে এমন কথা শোভা পায় না, ভাই সাহেব। খোদা আপনাকে যা দিয়েছেন, তা যদি খোদার কাজেই না লাগালেন, তবে আখেরাতে কি জবাব দেবেন? বিষয় সম্পত্তিই বলুন, আর ধন-দৌলতই বলুন, কিছুই তো আর সঙ্গে যাবে না। ও-সব খোদার কাজেই লাগান উচিত।"

সৈয়দ সাহেব গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"ঠিক ব'লেছেন, ভাই সাহেব ; এতদিন আমি বড়ই গাফেলী ক'রেছি—আল্লাহ্ মাফ করনেওয়ালা—আমি আর দেরী ক'রব না, যেমন ক'রে পারি, কাজটা শেষ ক'রে ফেলব।"

আসরের নামায বাদ হাজী সাহেব মসজিদের ভিতরে দাঁড়াইয়া উহার কোথায় কিরূপ কাজ হইয়াছে, তাহার সমালোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি আরবে কোথায় কোন্ মস্‌জিদে কবে নামায পড়িয়াছিলেন, তাহার কোন জায়গাটিতে কিরূপ ধরনের কারুকার্যের বাহার দেখিয়াছেন, সে সকল তন্ন তন্ন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন এবং সৈয়দ সাহেব একাগ্রমনে শুনিতে শুনিতে সেই সকলের চিত্র মনের মধ্যে আঁকিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার পর বাহিরে আসিয়া বারান্দাটি কত বড় হওয়া উচিত, তাহার ছাদ কিরূপ হইবে এবং কয়টি থাম দিলে মানাইবে ; বারান্দার সম্মুখে বেশ কোশাদা রকম একটা রোয়াক দিলে ভাল হয়—এই রকমই তিনি অনেক ভাল ভাল জায়গায় মসজিদে দেখিয়া আসিয়াছেন—এইরূপ নানাপ্রকার মত প্রকাশ করিলেন।

বৈবাহিকের সহিত এই সকল বিষয়ের আলোচনার পর হইতে এই মসজিদটিই সৈয়দ সাহেবের একমাত্র চিন্তনীয় বিষয় হইয়া উঠিল। পর দিন হাজী সাহেব রওয়ানা হইয়া গেলে পরই তিনি আবদুল মালেককে ডাকিয়া কহিলেন, "বাবা মসজিদটা ত' আর ফেলে রাখা যায় না।"

আবদুল মালেক কহিল,—"তা কি ক'রবেন, এরাদা ক'রেছেন।"

"আরও গোটা দুই তালুক বেচা ছাড়া তো আর উপায় দেখ্‌ছিনে। ঐ রসূলপুরের তোমার আম্মার দরুন তালুকটা আর মাদারগঞ্জেরটা বেচব মনে ক'চ্ছি।"

আবদুল মালেক মনে মনে ভারী চটিয়া গেল। পিতা আর কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে তালুক-মুলুক সবই ছারেখারে যাইবে, তাহাদের জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। সে একটু হতাশভাবে কহিল,—"তা হ'লে ধরুন গে' আপনার থাক্‌বে কি?"

পিতা একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—"কেন? আমি আর কদ্দিন! এ কাজটা আমি শেষ ক'রেই যাব—বাকী খোদার মরজি।"

আবদুল মালেক আবার কহিল,—"যা আছে, তাই ধরুন গে' আপনার ভাগ হ'য়ে গেলে আমরা কিই বা পাব, তার ওপর আবার......"

পিতা অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিয়া কহিলেন,—"তোমরা খোদার ওপর 'তওয়াক্কল' রাখতে একেবারেই ভুলে যাও। সেই জন্যই তোমাদের মন থেকে ভাবনা ঘোচে না। তোমার ভাবনা কি বাবা? তোমার শ্বশুরের বিষয়-আশয়ের খবর রাখ কি? খোদা চাহে তো বড় বউ-মার বেটা পাওয়া যাবে, তাতেই তো খোশহালে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে! আর তোমার বোনেরা তো এক রকম পার হ'য়ে গিয়েছে...ছোট যে দু'টো আছে, আমি যদি বিয়ে দিয়ে না যেতে পারি, তবে তোমরাই দেখে শুনে দিও। তেমন ঘরে প'লে হয় তো তোমাদের সম্পত্তিতে হাত নাও প'ড়তে পারে—একটু বুঝে সুঝে সংসার কত্তে হয়, বাবা! আর তোমার ভাইদের...আবদুল কাদেরের কথা ছেড়ে দাও, সে তো সবরেজিষ্ট্রার হয়েছে, তার এক রকম চ'লে যাবে। আর ওই ছোট ছেলেগুলো র'য়েছে, তোমরা দেখে শুনে ওদের বিয়ে দিও, তা হ'লে আর কারুর কোন ভাবনা থাক্‌বে না, বাকী খোদার মরজি।"

পুত্রকে এইরূপে বুঝাইয়া, খোদার উপর 'তওয়াক্কল' রাখিয়া সংসার চালাইবার কৌশল শিখাইয়া দিয়া সৈয়দ সাহেব দুইটি তালুক বিক্রয়ের বন্দোবস্তে লাগিয়া গেলেন। এবার যাহাতে বিক্রয়ের পূর্বে জানাজানি না হয়, সেই জন্য তিনি ভোলানাথ সরকারকে গোপনে ডাকিয়া তাঁহারই হস্তে তালুক দুইটি ন্যস্ত করিবেন, স্থির করিলেন! তিনি মনে মনে আশা করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তালুক দুইটির মূল্য যে দশ হাজার টাকা হইবে, তাহাতে আর ভুল নাই। কিন্তু সরকার মহাশয় আসিয়া কাগজপত্র দেখিয়া সাত হাজার পর্যন্ত দিতে রাজী হইলেন। সৈয়দ সাহেব অনেক ঝুলাঝুলি করিলেন, কিন্তু ভোলানাথ সেই সাত হাজারই তাঁহার শেষ কথা বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

সৈয়দ সাহেব ভাবিতে লাগিলেন, আর কোন খরিদ্দারের সন্ধান করা কর্ত্তব্য কি না। তালুক দু'টি নিতান্ত মন্দ নহে ; বৎসরে প্রায় চার পাঁচ শত টাকা আয় আছে ; এত সস্তায় উহা ছাড়িয়া দিতে তাঁহার মন সরিতেছিল না। কিন্তু অন্যত্র খরিদ্দার দেখিতে গেলে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সহজেই জানাজানি হইয়া পড়িবে ; পাছে তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কৌশলে খরিদ করিয়া বসে, তাহা হইলে আর সৈয়দ সাহেবের মুখ দেখাইবার জো থাকিবে না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া-অবশেষে তিনতিনটি হাজার টাকার লোভ তাঁহাকে সম্বরণ করিতেই হইল এবং সাত হাজারেই সম্মত হইয়া দলিল রেজিষ্টারী করিবার জন্য তিনি ভোলানাথ সরকারকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং বরিহাটি রওয়ানা হইলেন।

সদরে সম্প্রতি একটি জয়েণ্ট আপিস খোলা হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহাদিগকে দলিল রেজিষ্টারী করিতে হইবে। যে দিন প্রাতে তাঁহাদের নৌকা বরিহাটির ঘাটে আসিয়া ভিড়িল, সেই দিনই বেলা সাড়ে দশটার সময় তাঁহারা দলিলাদি লইয়া জয়েণ্ট আপিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আপিসের আমলাগণ তাঁহাদিগকে চিনিল ; সুতরাং তাঁহারা এজলাসের এক পার্শ্বে দুইখানি চেয়ার আনাইয়া যত্ন করিয়া তাঁহাদিগকে বসাইল। সবরেজিষ্ট্রার তখনও আসেন নাই ; আসিবার বড় বিলম্বও নাই।

একটু পরেই সবরেজিষ্ট্রার আসিলেন। এজলাসে উঠিয়াই চেয়ারে উপবিষ্ট মূর্ত্তি দুইটি দেখিয়া তিনি একটুখানি থম্‌কাইয়া দাঁড়াইলেন ; পরক্ষণেই অগ্রসর হইয়া তিনি সৈয়দ সাহেবের 'কদমবুসি' করিয়া ফেলিলেন।

"কে কে! আবদুল কাদের? তুমি? তুমি এখানে?" অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া সৈয়দ সাহেব এই কথা কয়টি বলিয়া উঠিলেন।

ভোলানাথ সরকার কহিলেন, "বাঃ আপনি এখানে এসেছেন, তা তো আমরা কেউই জানিনে! কর্তাও তো জানেন না দেখতে পাচ্ছি!"

আবদুল কাদের কহিল,—"আমি আজ মাত্র তিন দিন হ'ল বদলি হ'য়ে এসেছি। আপনার 'তবিয়ত' ভাল তো, আব্বা?" কিন্তু আব্বার মনে এতক্ষণে একটা তুমুল আন্দোলন উঠিয়া পড়িয়াছে। আজ প্রায় তিন বৎসর পরে পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ হইয়াছে ; কুশল-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, তিনি ভয়েই অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। আবদুল কাদের ছেলেটি যেরূপ বেতরবো গোছের, তাহাতে হয় তো সে বিষয়বিক্রয় লইয়া একটা গণ্ডগোল উপস্থিত করিবে এবং তাহাতে অনর্থক একটা জানাজানি কেলেঙ্কারী ব্যাপার দাঁড়াইবে, এই ভাবিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন,—"আমাদের একটা কাজ ছিল ; কিন্তু কথাটা তোমাকে একটু নিরালা বলতে চাই, আগে......"

আবদুল কাদের কহিল,—"কাজটা কি আব্বা? কোন দলিল-টলিল রেজীষ্টারী ক'তে হবে কি?"

"হ্যাঁ, তাই বটে, তবে..."

"তা হ'লে আমার বাসাতেই চলুন..."

ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় বাসা?"

"এই কাছেই বোর্ডিং-এ আবদুল্লার ওখানে এখন আপাততঃ আছি, এখন বাসা ও পাইনি।"

"আচ্ছা আমি কর্তার সঙ্গে একটু পরামর্শ ক'রে পরে যাচ্ছি," এই বলিয়া ভোলানাথ সৈয়দ সাহেবকে বারান্দার এক প্রান্তে লইয়া গেলেন।

আবদুল কাদেরের সন্দেহ হইল, ইহার ভিতর এমন কোন কথা আছে, যাহা ইহারা তাহার নিকট প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। দলিল রেজিষ্টারী করিতে গেলে তো সব কথাই জানা যাইবে ; কিন্তু যদি ইহারা অতিরিক্ত ফী দিয়া অন্যত্র রেজিষ্টারী করিতে যান? সরকার মহাশয় বুঝি আব্বার সঙ্গে সেই পরামর্শই করিতে গেলেন। আবদুল কাদের এইরূপে চিন্তা করিতেছে, এমন সময় ভোলানাথ আসিয়া কহিলেন, "দেখুন মেজ মিঞা, কর্তার মত বদলে গিয়াছে। তিনি একখানা দলিল রেজিষ্টারী ক'রে এসেছিলেন বটে কিন্তু সেটা আর ক'রবেন না।"

"কেন?"

"এর ভেতরে অনেক কথা আছে, তা অন্য সময় ব'লব। এখন আমাকে নৌকায় ফিরে যেতে হ'চ্ছে—কর্তা চ'লে গিয়েছেন, তিনি আমাকে ব'লে গেলেন, এখনই নৌকো খুলতে হবে।"

"বাঃ এসেই অমনি চ'লে যাবেন। সে কেমন কথা!"

"বাড়ীতে অনেক জরুরী কাজ ফেলে এইছি—দলিলখানা রেজিষ্টারী হ'লেই আমরা নৌকো খুলতাম। এখন যখন রেজিষ্টারী হ'লই না, তখন আর দেরী করে ফল নেই ; যত শীগ্গীর বাড়ী পৌঁছুতে পারি' ততই ভাল।"

"আচ্ছা, তা যেন হ'ল ; কিন্তু হঠাৎ দলিল রেজিষ্টারী ক'রতে আসা আবার হঠাৎ মত ফিরিয়ে চ'লে যাওয়া, এর মানে তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে ; বোধ হয়, আমাকে দেখেই আপনারা মত ফিরিয়ে ফেল্লেন..."

সরকার মহাশয় তাড়াতাড়ি কহিলেন,—"আপনাকে দেখে কেন মত ফেরাব? তবে কি জানেন, কর্তার মতের ঠিক নেই..."

আবদুল কাদের বাধা দিয়া কহিল,—"না, নিশ্চয়ই এর ভেতর এমন কোন কথা আছে, যা আমাকে আপনারা লুকুচ্ছেন—কোন বিষয় বিক্রী টিক্রী নয় তো?"

এই কথায় ভোলানাথ একটু হাসিয়া উঠিলেন ; কিন্তু সে হাসির একান্ত শুষ্কতা উপলব্ধি করিয়া আবদুল কাদেরের মনে সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়া গেল। ভোলানাথ কহিলেন,—"আপনি মিছে সন্দেহ ক'চ্ছেন, মেজ মিঞা..."

"না না, মিছে নয়। সেবার কয়েকটা তালুক বিক্রী ক'রবার সময় আমি আব্বার সঙ্গে খুব এক চোট চটাচটি ক'রেছিলাম কি না, তাই বোধ হয় এবার আমার কাছ থেকে কথাটা লুকুচ্ছেন। নইলে বেশ ভাল মানুষটির মত দলিল রেজিষ্টারী ক'রবার জন্য আপিসে এসে ব'সে রয়েছেন, আর আমাকে দেখবামাত্রই যেন কেমন এক রকম হ'য়ে গেলেন, আর মতও ব'দলে গেল! আমি এখানে বদলি হ'য়ে এসেছি জানলে আপনারা কখনো এখানে আসতেন না। কেমন কি না, বলুন?"

সরকার মহাশয় একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া আমৃতা আমৃতা করিতে লাগিলেন। বিক্রী-ব্যবসায়ী ভোলানাথের সত্য গোপনের চেষ্টা আবদুল কাদেরের নির্ভীক সবল স্পষ্টবাদিতার সম্মুখে ব্যর্থ হইয়া গেল। তবু একবার শেষ চেষ্টা করিবার জন্য তিনি কহিলেন,—"আচ্ছা, আমার কথা আপনার বিশ্বাস না হয়, কর্তাকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখবেন।"

আবদুল কাদের তৎক্ষণাৎ কহিল—"তাই চলুন।"

ভোলানাথ কহিলেন,—"আপনি এগোন, আমি আসছি। নৌকা থানা ঘাটে আছে।"

সৈয়দ সাহেব আবদুল কাদেরকে এড়াইয়া সরিয়া পড়িতে চাহিয়াছিলেন। তাই আগে নৌকায় আসিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে প্রতি মুহূর্তে ভোলানাথের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার মনে মনে ভয়ও হইতেছিল, পাছে বা সঙ্গে সঙ্গে আবদুল কাদের আসিয়া পড়ে। পরে ভোলানাথের পরিবর্তে তাহাকেই নৌকায় উঠিতে দেখিয়া তাঁহার মন এমন বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল, যে, যখন আবদুল কাদের সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"আব্বা আপনি বুঝি আবার তালুক বিক্রী ক'চ্ছেন?"—তখন তিনি কি বলিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া কেবল না, হাঁ, তা, কি জান"—ইত্যাদি অসংলগ্ন দুই চারিটি শব্দ উচ্চারণ করিলেন।

আবদুল কাদের কহিতে লাগিল,—"আব্বা, আপনাকে একটা কথা বলি। সেবারে তালুক বিক্রী ক'রবার সময় আমি অনেক আপত্তি ক'রেছিলাম, তাতে আপনি আমার ওপর নারায হ'য়েছিলেন। কিন্তু তখন আমার বাধা দেবার কোন ক্ষমতা ছিল না—আপনার টাকার দরকার প'ড়েছিল, আমার যদি তখন সে টাকা দেবার উপায় থাকত, তবে কিছুতেই বিক্রী ক'র্তে দিতাম না। আর আপনারও বিক্রী ক'রবার দরকার হ'ত না। এখন খোদার ফজলে আমি কিছু কিছু রোজগার ক'চ্ছি—আমার যতদূর সাধ্য আপনাকে সাহায্য ক'রব, আপনি আর তালুক বিক্রী ক'রবেন না..."

সৈয়দ সাহেব কহিলেন,—"কি করি বাপ, ওই মসজিদটা প'ড়ে র'য়েছে, খোদার কাজ একবার আরম্ভ ক'রে যদি শেষ না ক'রে মরি, তবে আখেরাতে খোদার কাছে কি জবাব দেব?"

"সে মসজিদ এখনও শেষ হয় নি?"

"কই আর হ'ল। তিন বছরের বেশী হ'ল তুমি বাড়ী ছাড়া, সংসারের খবর তো আর রাখ না—টাকা পয়সা কোত্থেকে আসবে যে, কাজ শেষ ক'রব? তালুক বিক্রী ছাড়া আর উপায় কি?"

"মসজিদ শেষ ক'ত্তে আর কত টাকা লাগবে?"

"এখনও তো ঢের বাকী—বারান্দা আর সামনের একটা রোয়াক, বাইরের আস্তর উপরকার মিনারা..."

"তা কোন্ তালুকটা বিক্রী ক'চ্ছেন?"

"এই দেখ বাবা, দলিলটাই দেখ, তোমার কাছে আর লুকিয়ে কি হবে।"

দলিল দেখিয়া আবদুল কাদের আশ্চর্য হইয়া কহিল,—"এই দু'টো ভাল ভাল মহাল মাত্র সাত হাজারে ছেড়ে দিচ্ছেন আব্বা? আরও দু'টো গেলে থাকবেই বা কি।"

"তা কি করি, ভোলানাথ বাবু ওর বেশী আর দিতে চাইলেন না......"

"সাত হাজার টাকাই মসজিদে লাগবে?"

"তা লাগবে বই কি! মেঝেতে সঙ্গে মর্‌মর্‌' দেবার ইচ্ছে আছে, ভেতরেও কিছু পাথরের কাজ, উপরে মিনারা, বারান্দায় থাম পাথরের কাজ দিতে হবে, তাতে ক'রে অনেক টাকা প'ড়ে যাবে।

"এত না ক'রে তো চলে আব্বা..."

"না, না তাও কি হয় বাবা! 'নিয়ত্‌' যা ক'রিছি খোদার নামে, তা আদায় না ক'ল্লে যে খোদার কাছে বেইমানী হবে।"

"আমার মনে হয়, আব্বা, 'নিয়ত্‌' ক'ল্লেই যে সেটা সম্পূর্ণ আদায় ক'ত্তে হবে, তার কোন মানে নেই। যদি এখন সাধ্যে না কুলোয় তবে? যতটা পারা যায়, তাই ক'ল্লেই খোদা রাজী থাকেন। এখন আমি যদি 'নিয়ত' ক'রে বসি যে পাঁচ লাখ টাকা খরচ ক'রে মসজিদ দেবো, তা কি কখনও আদায় করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'তে পারে? মসজিদ দেওয়া আপনার 'নিয়ত্‌' ; এখন সাধ্যে যতদূর কুলোয়, তাই খরচ ক'রে ওটা শেষ ক'রে ফেলুন। আমি বলি—রসুলপুরের ওটা থাক্‌ ; মাদারগঞ্জেরটা বরং বন্ধক রেখে হাজার দুই টাকা নেন ; ও টাকা খোদা চাহে তো আমিই পরিশোধ ক'রব। আপনার কিছু ভাবতে হবে না ; খোদার ফজলে বিষয়েও আঁচ লাগবে না, আপনার মসজিদও শেষ হ'য়ে যাবে।"

সৈয়দ সাহেব একটু ভাবিয়া কহিলে,—"দু হাজার টাকায় কি হবে, বাবা?"

"যাতে হয়, তাই করুন ; বেশী আড়ম্বর ক'রে কাজ নেই, আব্বা। এই যে সরকার মহাশয়ও এসে প'ড়েছেন..."

সরকার মহাশয় উঠিতে উঠিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নৌকা এখন খোলা হবে না?"

সৈয়দ সাহেব কহিলেন,—"আবদুল কাদেরকে সব কথা খুলে ব'ল্লাম, ও তো বিক্রী কত্তে দিতে চায় না—আর আমার বড় ছেলেরও মত নয় যে বিক্রী করি। এখন ছেলেরা সব লায়েক হ'য়েছে, ওদের অমতে কাজটা করা ভাল দেখায় না, সরকার মশায়..."

ভোলানাথ কহিলেন,—"তা বেশ তো। বিক্রী নাই বা ক'ল্লেন। আমি তো আর জোর ক'রে কিনতে চাই নি..."

"নারায হবেন না, সরকার মশাই..."

"না, না, আপনার সম্পত্তি আপনি ইচ্ছে হয় বিক্রী করুন, ইচ্ছে হয় না করুন, তাতে আমি নারায হব কেন, সৈয়দ সাহেব!"

"কিন্তু আমার টাকার দরকার যে! আপনি মেহেরবানি ক'রে যদি বন্ধক রাখেন..."

"এ সাত হাজার টাকায়! সে কি হয়?"

আবদুল কাদের কহিল,—"না, না সাত হাজার টাকা কেন। আমরা কেবল মাদারগঞ্জের তালুকটা বন্দক রাখব ; আপনি মেহেরবানি ক'রে কেবল ঐটা রেখেই যদি দু'হাজার টাকা দেন..."

সৈয়দ সাহেব কহিলেন,—"না, না, দু' হাজারে আমার চ'লবে না তো! নিদেন পক্ষে তিন হাজার চাই যে।"

ভোলানাথ একটু ভাবিয়া কহিলেন,—"বন্ধক রেখে তিন হাজার দিতে গেলেও দু'টো তালুক চাই ; তা নইলে তিন হাজার দিতে পারব না।"

আবদুল কাদের অনেক আপত্তি করিল ; কিন্তু সৈয়দ সাহেব দু'হাজারে সন্তুষ্ট হইতে চাহিলেন না, এবং ভোলানাথও দুইটি সম্পত্তি না হইলে তিন হাজার দিতে রাজী হইলেন না। অবশেষে ভোলানাথেরই জয় হইল।

সেই দিনই দলিল লেখা-পড়া হইয়া গেল। সুদের হার লইয়া আবদুল কাদেরকে অনেক লড়ালড়ি করিতে হইয়াছিল ; অবশেষে ভোলানাথ বার্ষিক শতকরা ১২. টাকাতেই রাজী হইয়া গেলেন। বন্দোবস্ত হইল যে, আবদুল কাদের প্রতিমাসে সুদে-আসলে ৬০. টাকা করিয়া ভোলানাথকে পাঠাইতে থাকিবে। ইহাতে প্রায় ছয় বৎসরে সমস্ত টাকা পরিশোধ হইতে

পারিবে। কিন্তু ভোলানাথ আরও শর্ত করিয়া লইলেন, যে, কিস্তী কোন সময়ে খেলাফ হইলে, সুদের হার শতকরা ২৫ ্টাকায় দাঁড়াইবে এবং খেলাফ কালীন সুদ আসলে পরিণত হইয়া চক্রবৃদ্ধি হারে গণ্য হইবে।

সদর অফিসেই দলিল রেজিষ্টারী করা হইল। আবদুল্লাও তাহাতে এক জন সাক্ষী হইয়া রহিল। সৈয়দ সাহেব ও ভোলানাথ সেই দিনই সন্ধ্যার পর নৌকা খুলিলেন।

২০

বরিহাটি জেলা স্কুলে এত দিন মুসলমান ছাত্রদের কোন বোর্ডিং ছিল না। আবদুল্লাহ্ এখানে মাষ্টার হওয়ার পর অনেক চেষ্টা-চরিত্র করিয়া একটি মুসলমান বোর্ডিং স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং নিজেই তাহার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিযুক্ত হইয়া সেইখানেই বাস করিতেছে। আবদুল কাদের বরিহাটির জয়েন্ট আফিসে বদলি হইয়া আসা অবধি আবদুল্লার ওখানেই রহিয়াছে ; এখনও বাসা পায় নাই ; কিন্তু স্বতন্ত্র বাসা না করিলে তো চলিবে না। বোর্ডিং-এ বাহিরের লোক অধিক দিন রাখা যায় না ; সুতরাং আবদুল্লাহ্ এবং আবদুল কাদের উভয়েই বাসা খুঁজিতে লাগিয়া গেল।

বরিহাটিতে মুসলমান পাড়ায় চাপরাসী ও পেয়াদা শ্রেণীর লোকদের কয়েকখানি খ'ড়ো ঘর ছাড়া মুসলমানদের আর কোন বাড়ী ছিল না। সম্প্রতি নাদের আলী বলিয়া একজন সিভিল কোর্টের পেয়াদা নদীর ধারে একটুখানি জমি খরিদ করিয়া ছোট-খাট একটি পাকা বাড়ী তৈয়ার করিতেছিল। নাদের আবদুল্লার পিতার 'মুরীদ' ছিল ; সুতরাং তাহাকে বলিলে সে নিশ্চয়ই আর কাহাকেও ভাড়া দিবে না। এই মনে করিয়া আবদুল্লাহ্ নাদের আলীর বাড়ীতে গিয়া তাহাকে বিশেষ অনুরোধ করিল, যেন বাড়ীখানি আর কাহাকেও ভাড়া দেওয়া না হয় এবং কিছু অগ্রিমও দিতে চাহিল।

নাদের আলী কহিল,—"না, না হুযুর, আগাম নেব ক্যান্? আপনারা ভাড়া নিবেন, তার আবার কথা? বাড়ী আপনাগোরই থাক্‌ল ; শ্যাষ হ'তে আরও মাসখানেক লাগবে ; আল্লায় ক'রলি ভ্যাখন আপনাগোরই ভাড়া দেব।"

আবদুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিল,—"তা ভাড়া কত ক'রে নেবে, নাদের আলী?"

নাদের কহিল,—"আগে শ্যাষ ক'রেই তো নি, হুযুর, ভাড়ার কথা পাছে।"

"না, না, আগে থেকেই ওটা ঠিক ক'রে রাখা ভাল। তোমার বাড়ী প্রায় হ'য়েই রয়েছে ; তিন কামরা আর এক বারান্দা—এই তো! তবে ভাড়া ঠিক ক'ত্তে আর অসুবিধে কি?"

নাদের একটুখানি হাসিয়া কহিল,—"তা আপনারা যা দেবেন, হুযুর আমি তাই নেব। আপনাগোর কি আর দস্তুর ক'ত্তি পারি?"

"তবু তোমার কত হ'লে পোষাবে, মনে কর।"

"বাড়ী ভাড়া তো দেখ্‌তিইছেন হুযুর—বাবুরো সব বাড়ীর জন্যি খাই খাই ক'রে বেড়ায়। ড্যাক্ না ড্যাড়া ভাড়া দেও বাড়ী পায় না। না আপনাগোর কাছে আর বেশী নেব না হুযুর, কুড়ি টাকা ক'রে দেবেন।"

নাদের নিতান্ত অন্যায় ভাড়া চাহে নাই বুঝিয়া আবদুল কাদের তাহাতেই রাজী হইয়া গেল। ঠিক হইল যে, বাড়ী শেষ হইলে যে দিন 'আকামত' হইবে সেই দিনই আবদুল কাদের বাড়ী দখল করিবেন।

বিদায়ের পূর্বে নাদের আবদুল্লাকে কহিল,—"হুযুর, আকামতের দিন এট্টু মৌলুদ শরীফ পড়াতি চাই, তা আপনিরই এট্টু ক'ত্তি হবে..."

আবদুল্লাহ্ কহিল,—কি ক'র্তে হবে!"

"আপনিই এট্টু পড়বেন—আপনাগোর মুখির পড়ায় খোদায় 'বরকত দেবে।"

আবদুল্লাহ্ হাসিয়া কহিল,—"আচ্ছা আচ্ছা, পড়া যাবে।"

যাহা হউক, একটা বাসার বন্দোবস্ত হইয়া গেল মনে করিয়া আবদুল কাদের নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু নাদেরের বাড়ীখানি শেষ হইতে এখনও এক মাসের বেশী লাগিবে। এতদিন বোর্ডিং-এ থাকা উচিত হইবে না। তাই দুই জনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, যতদিন বাড়ী প্রস্তুত না হয়, তত দিন আবদুল কাদের আকবর আলী সাহেবের ওখানেই থাকিবে, খাওয়া-দাওয়ার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়া লইবে।

আকবর আলী কাদেরকে পুনরায় সাদরে নিজ বাটীতে স্থান দিলেন ; কিন্তু তাহার স্বতন্ত্র আহারের বন্দোবস্তে বিশেষ রকম আপত্তি করিতে লাগিলেন। আবদুল কাদের কিছুতেই শুনিল না; সে এখন খোদার ফজলে যথেষ্ট উপায় করিতেছে, এ ক্ষেত্রে নিজের একটা বন্দোবস্ত না করিয়া লওয়া ভাল দেখাইবে না বলিয়া সে জেদ করিতে লাগিল। অগত্যা আকবর আলীকে সম্মত হইতে হইল। তিনি বৈঠকখানা ঘরের বারান্দায় একধারে ঘিরিয়া উপস্থিত রান্নার কাজ চালাইবার মত একটু স্থান করিয়া দিলেন।

কিন্তু রাঁধিবার আর লোক পাওয়া গেল না। অবশেষে আবদুল কাদেরের চাপরাসী নিজেই কেবল খোরাক পাইয়া রাঁধিয়া দিতে রাজী হইল। কিন্তু তাহাকে বেশী রাঁধিতে হইত না। আকবর আলীর অন্দর হইতে প্রায়ই ডালটা, তরকারীটা আসিত এবং সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ তিন সন্ধ্যা আবদুল কাদেরকে বোর্ডিং-এর সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হইত।

এইরূপে প্রায় এক মাস কাটিয়া গেল। একদিন সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় বসিয়া আবদুল কাদের আবদুল্লার সহিত পরামর্শ করিতেছিল, বাড়ী প্রস্তুত হইয়া গেলে হালিমাকে আনা যাইবে কিনা। তাহার মাসিক আয় গড়ে এক শত টাকারও উপর। তাহা হইতে পিতার দেনা পরিশোধ বাবদ ৬০, টাকা করিয়া দিলে তাহার ৫০, টাকা আন্দাজ থাকিবে। তাহাতে জেলার উপর সপরিবারে খরচ চালান যায় কি না, দুইজনে তাহারই একটা হিসাব করিতেছিল, এমন সময় নাদের আলী সেখানে উপস্থিত হইয়া আভূমি মাথা নোয়াইয়া আদাব করিয়া দাঁড়াইল।

আবদুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিল,—"কি নাদের আলী, খবর কি? তোমার বাড়ীর আকামতের মৌলুদ প'ড়তে হবে কবে?"

নাদের আলী মুখে একটু বিষণ্ণতার ভাব আনিয়া কহিল,—"হযুর বড় এট্টা মুশ্‌কিলি পড়লাম, তাই এখন কি করি ভাবতিছি।"

"কেন, কেন, কি হ'য়েছে?"

"আমগোর মোক্তার বাবুর এক সুমুন্দি সব-ডিপুটি হ'য়ে আইছেন ; তা মোক্তার বাবু আস্যে আমারে ধ'রে পড়লেন ; আগাম টাকা নিতি চালাম না, তাও জোর ক'রে দশটা টাকা হাতে গুঁজে দ্যে গেলেন। ও বাড়ী তানার সুমুন্দিরে দিতি হবে। আপনাগোরে আগে কথা দিছি, সে কথা কত ক'রে কলাম, তা তানারা মোটেই শোনলেন না কি করি এখন..."

আবদুল্লাহ্ উষ্ণ হইয়া উঠিয়া কহিল,—"বাঃ আমাদের কথা দিয়ে রেখেছ আজ এক মাস হ'ল, এর ওপরেও আবার কি ক'রবে ভাবছ? তোমার কথার ওপর নির্ভর ক'রে আমি এদ্দিন ব'সে আছি, পরিবার আনবার বন্দোবস্ত ক'চ্ছি ; আর আজ কি না তুমি ফস্ ক'রে আর এক জনকে বাড়ী দিয়ে ফেল্লে? আমরা আগাম দিতে চাইলাম, তা নিলে না ; আর তোমার মুন্সেফ বাবু যেই এসে টাকা দিলেন, অমনি নিয়ে ফেল্লে! ছিঃ, নাদের তোমার একটু লজ্জাও হ'ল না আমাদের সুমুখে আসতে?"

নাদের মিনতি করিয়া কহিল,—"তা কি করি হযুর, তানারা মুনিব, তানাগোর কথা তো ঠেলতি পারি নে। তা আমি আপনাগোর আর এট্টা বাড়ী দেখে দেবো, আপনাগোর কোন কষ্ট হবে না..."

"আর কষ্ট হবে না। নাদের, তুমি তোমার নিজের বাড়ীর সম্বন্ধেই যখন কথা রাখ্‌তে পাল্লে না, তখন আর তুমি পরের বাড়ী দেখে দিয়েছ। আর তো বাড়ীই নেই, তা তুমি দেবে কোত্থেকে? হিন্দুর বাড়ী কি আর আমাদের দেবে?"

"কেন দেবে না হুযুর? ওই ওদ্দিকে বাবুর একখানা বাড়ী খালি আছে, তবে তার ভাড়াডা কিছু বেশী, তিরিশ টাকা..."

আবদুল কাদের কহিল,—"অত টাকা আমি দেব কোত্থেকে নাদের? কুড়ি টাকার মধ্যেই চাই।"

নাদের একটু ভাবিয়া কহিল,—"শোশি বাবুগোর একখান বাড়ী আছে দুই কামরা ১৫ টাকা। সেডা খালি হবার কথা শুনিছি। ওবোশিয়ের বাবু ছেলেন সে বাড়ীতি, তিনি বদলি হ'য়ে গ্যালেন। সেইডেই দেখি যদি হয়।"

আবদুল্লাহ্ হতাশ্‌ভাবে কহিল,—"তা দেখ। কিন্তু হবে ব'লে আমার বিশ্বাস হয় না।"

"তা য্যামন ক'রে পারি, আপনাগোরের এট্টা বাড়ী ক'রে দেবোই, আপনারা ভাবনা করবেন না।" এইরূপ আশ্বাস দিয়া নাদের চলিয়া গেল।

একটু পরেই আকবর আলী অন্দর হইতে বাহিরে আসিলে আবদুল কাদের নাদেরের বাড়ী সম্বন্ধে সকল কথা খুলিয়া বলিল। আকবর আলী একটু চিন্তিতভাবে কহিলেন,—"তবেই তো! ও বাড়ী যখন হাতছাড়া হ'য়ে গেল, তখন যে আপনি এখানে আর বাড়ী পাবেন, এমন বোধ হয় না। কোন হিন্দুই মুসলমানকে বাড়ী দেবে না।"

আবদুল কাদের একটু প্রতিবাদের সুরে কহিল,—"নাদের যেমন নিশ্চিত রকম ভরসা দিয়ে গেল, তাতে বোধ হয় বাড়ী পাওয়া যেতে পারে। যদি কেউই না দিত, তবে নাদের অমন জোর ক'রে বলতে পারত না যে, সে বাড়ী ক'রে দেবেই। যার বাড়ীর কথা ব'ল্লে, সে লোকটা হয় তো মুসলমানকে দিতে আপত্তি নাও ক'ত্তে পারে ব'লে থাক্‌বে..."

"কার বাড়ীর কথা ব'ল্লে সে?"

আবদুল্লাহ্ কহিল—"শশী বাবু, বোধ হয় উকীল শশী বাবু হবেন..."

আকবর আলী অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কহিলেন,—"ওঃ শশীকে আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি। ওর বাড়ী যদি আপনি পান, তবে আমি কি ব'লেছি..."

আবদুল কাদের কহিল,—"আচ্ছা দেখাই যাক্ না, নাদের কদ্দুর কি ক'ত্তে পারে। আর আমার বোধ হয়, এখন হিন্দুতে যখন মুসলমানের বাড়ী ভাড়া নিচ্ছে, তখন ওরা মুসলমানকে বাড়ী দিতে আর আপত্তি নাও ক'ত্তে পারে।"

আকবর আলী কহিলেন,—"আপনি ক্ষেপেছেন? মুসলমানের বাড়ী হিন্দুতে ভাড়া নিচ্ছে ব'লেই যে হিন্দুর বাড়ী মুসলমানকে দেবে, এর কোন মানে নাই। আমি যখন নবাবশাহীতে প্রথম চাকরী পাই, তখনকার এক ঘটনা শুনুন। এক জন মুসলমান রইস্ মারা গেলেন ; তাঁদের পারিবারিক অবস্থা ভাল ছিল না। ছেলেরা পুরানো বাড়ীটা বেচে ফেল্লে। বাড়ীখানা মন্দ ছিল না। এক হিন্দু ডাক্তার সেটা কিনেছিল ; সে একটু মেরামত-সেরামত ক'রে ভাড়া খাটাতে লাগ্‌ল। কিছুদিন পরে এক জন মুসলমান ডিপুটি নবাবশাহীতে বদলি হ'য়ে এলেন। তখনও বাড়ীটা খালি ছিল ; তিনি এত ঝুলে ঝুলি ক'ল্লেন, ভাড়া অনেক বেশী দিতে চাইলেন, কিছুতেই সে ডাক্তার দিলে না। সাফ ব'লেই দিলে, মুসলমানকে দেব না।"

আবদুল কাদের কহিল,—"বাঃ, বেশ তো। ওরা আমাদেরটা নেবে, আর আমাদের দরকার হ'লে ওদেরটা পাব না? মুসলমানের বাড়ী হিন্দুর কাছে বেচাও উচিত নয়, আর ভাড়া দেওয়া উচিত নয়।"

আবদুল্লাহ্ কহিল, "ভাই রে, বেচা উচিত নয় ব'লছ, কিন্তু মুসলমান খদ্দের পাবে ক'টা? আর ভাড়া না দিয়েই বা যাবে কোথা? ক'জন মুসলমান চাকুরে আছে, যে, সকল ভাড়া পাবে? তা ছাড়া ওরাই তো যত আফিস-আদালতের হর্তা-কর্তা, ওদের সঙ্গে আড়াআড়ি ক'রে কি

আমাদের চলে? এই দেখ না, নাদের বেচারা যদি মুন্সেফ বাবুর সম্বন্ধীকে বাড়ীটা না দিত ওর চা-্রী নিয়েই পরে টানাটানি প'ড়ত। যেমন আমাদের সমাজের অবস্থা, তাতে এ-সব স'য়েই থাক্‌তে হবে। অনর্থক চ'টলে কোন ফল নাই।"

আকবর আলী কহিলেন,—"সেই রকমই তো বোধ হ'চ্ছে। নিদেন পক্ষে এই পাড়াতেই একটু জায়গা নিয়ে ঘর বেঁধে থাক্‌বেন, আমি যেমন আছি। আর তো কোন উপায় দেখ্‌ছিনে।"

এইরূপ কথা-বার্তায় রাত্রি অধিক হইয়া উঠিল দেখিয়া আবদুল্লাহ্ বিদায় লইয়া বোর্ডিং-এ চলিয়া গেল। আবদুল কাদের রাত্রে শুইয়া আকবর আলী সাহেবের কথামত বাসা-বাটী নির্মাণের কল্পনা করিতে লাগিল।

পরদিন বৈকালের দিকে নাদের আলী আবদুল কাদেরের আপিসে আসিয়া কহিল, শশী বাবু তাঁহার বাড়ী দিতে রাজী হইয়াছেন, কিন্তু ভাড়া পাঁচ টাকা বৃদ্ধি করিয়া কুড়ি টাকা চাহিয়াছেন; আবদুল কাদের বাড়ী ভাড়া পাইবার আশা ছাড়িয়াই দিয়াছিল; এক্ষণে নাদেরের কথায় তাহার আবার ভরসা হইল। সে কুড়ি টাকাই দিতে রাজী হইয়া গেল।

নাদের কহিল,—"তবে চলেন হুযুর, শশীবাবুর সাতে একবার মোকাবেলা ঠিক-ঠাক ক'রে আসিগে। আমি তানারে ক'য়ে আইছি, আজই আপনারে ল'য়ে যাব। তানি সাজ বাদ যাতি কইছেন।"

"বেশ তো, সন্ধ্যার পরই যাব। তুমি আমাকে নিয়ে যেও। আপিসেই থাক্‌ব' খন—আজ কাজ অনেক।"

সন্ধ্যার পর নাদের আসিয়া আবদুল কাদেরকে শশীবাবুর বাড়ীতে লইয়া গেল। শশীবাবু তাঁহাকে পরম সমাদরে ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া একখানি চেয়ারে বসাইলেন এবং পান-তামাক প্রভৃতির ফরমাইশ করিলেন। তৎক্ষনাৎ পান আসিল, তামাক আসিলে শশীবাবু কিঞ্চিৎ সেবন করিয়া কলিকাটি নাদেরের হস্তে তুলিয়া দিয়া কহিলেন,—"দেও তো মিঞা, একটা কাগজের ঠোঙ্গা ক'রে সবরেজিষ্টার সাহেবকে তামাক খাওয়াও।"

অনভ্যস্ত বলিয়া আবদুল কাদের কাগজের ঠোঙ্গায় তামাক খাইয়া জুৎ পাইল না। তবু ভদ্রতার খাতিরে দুই-এক টান দিল এবং কাসিতে কাসিতে কলিকাটি ফিরাইয়া দিল।

শশীবাবু উপস্থিত আর একটি ভদ্রলোকের দিকে হুঁকাটি বাড়াইয়া দিয়া কহিলেন,—"নাদের আলী বল্‌ছিল আমার ওই নদীর ধারের বাড়ীটা আপনি ভাড়া নিতে চান।"

আবদুল কাদের কহিল,—"হ্যাঁ মশায়, যদি দয়া ক'রে দেন, তবে বড় উপকার হয়, বাড়ী পাচ্ছিনে।"

"তা বেশ তো; আমার বাড়ী নেবেন, তাতে আর কথা কি। তবে ভাড়াটা সম্বন্ধে একটু কথা ছিল, নাদের আলী বলেনি আপনাকে?"

"হ্যাঁ তা ব'লেছে। আপনি কুড়ি টাকা চান তো? আমি তাতেই রাজী আছি।"

"তা হ'লে আপনি আস্‌চে মাসের পয়লা থেকেই নেবেন। এর মধ্যে আমি চুণকাম-টুনকাম করিয়ে ফেলি। একটু আধটু মেরামত ক'ত্তে হবে। এ-ক'টা দিন দেরী হ'লে আপনার কোন অসুবিধে হবে না তো।"

"না, না, অসুবিধে কিছুই হবে না। আমি ক'টা দিন সবুর ক'ত্তে রাজী আছি। তবে আপনি কিছু অগ্রিম নিলে আমি পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।"

আবদুল কাদেরের এই প্রস্তাবে শশীবাবুর প্রতি তাহার অবিশ্বাসের ভাব প্রকাশ পাইলেও আবদুল কাদের যেন নিজেকেই তাঁহার নিকট বিশ্বাসী প্রতিপন্ন করিবার জন্য অগ্রিম দিতে চাহিতেছে এইরূপ ভাব দেখাইয়া শশী বাবু কহিলেন,—"সে কি মশায়! অগ্রিম-টগ্রিম আবার কেন? আপনার মত ভদ্রলোকের মুখের কথাই কি আমার কাছে যথেষ্ট নয়?"

ইহার উপর আর কথা চলে না। কাজেই আবদুল কাদেরকে কেবল মুখের কথার উপর নির্ভর করিয়াই বিদায় লইতে হইল।

আবদুল্লাহ্ আবদুল কাদেরের প্রতীক্ষায় আকবর আলীর বৈঠকখানায় বসিয়া তাঁহার সহিত গল্প করিতেছিল। এক্ষণে তাহাকে আসিতে দেখিয়া সে কহিল,—"কি হে, এত রাত্তির হ'ল যে?"

"গিয়েছিলাম শশীবাবুর ওখানে......"

"শশীবাবুর ওখানে?" কেন—বাড়ী ঠিক কর্তে?

"পেলে?"

আবদুল কাদের একটু বিজয়োল্লাসের সহিত কহিল,—"হ্যাঁ হ্যাঁঃ! তোমরা বল হিন্দুর বাড়ী মুসলমানে ভাড়া পায় না। ও একটা কথার কথা। এই তো আমি ভাড়া ঠিক করে এলাম। কুড়ি টাকা ক'রে, ও-মাসের পয়লা থেকে দেবে ; শশীবাবু এর মধ্যে মেরামত-টেরামত ক'রে ফেল্‌বেন।"

আকবর আলী এবং আবদুল্লাহ্ উভয়েই এই কথা শুনিয়া একটু আশ্চর্য বোধ করিলেন। আবদুল্লাহ্ কহিল,—"যদি বাস্তবিক দ্যায়, তো সে খুব ভাল কথা। এতেই পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বাড়বে ; নইলে পরস্পরের ব্যবহারে কেবল রেষারেষি তাচ্ছিল্য, ঘৃণা এসব থাক্‌লে কি আর দেশের কল্যাণ হ'তে পারে?"

বাসা একরূপ স্থির হইয়াছে বলিয়া আবদুল কাদের নির্ভাবনায় আপিস করিতেছে, এমন সময় একদিন শশীবাবু স্বয়ং আসিয়া দেখা দিলেন। আবুদল কাদের উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল এবং চেয়ার আনাইয়া বসিতে দিল। যথারীতি কুশল-প্রশ্নাদির পর শশী বাবু কহিলেন,—"দেখুন সবরেজিষ্টার সাহেব, আপনার কাছে এক বিষয়ে আমাকে বড়ই লজ্জিত হ'তে হ'চ্ছে, অথচ উপায় নেই। আশা করি মনে কিছু ক'রবেন না"...

আবদুল কাদেরের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল—বুঝি বাড়ীটা ফস্কাইয়া যায়! সে উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল,—"কেন, কেন?"

শশীবাবু গভীর দুঃখব্যঞ্জক সুরে কহিতে লাগিলেন,—"কি ক'রব, মৌলবী সাহেব, বাড়ীটা তো আপনাকে দেব ব'লেই ঠিক ক'রেছিলাম, কিন্তু ও-দিকে এক বিষম বাগড়া পড়ে গেল..."

ঔৎসুক্যে অধীর হইয়া আবদুল কাদের জিজ্ঞাসা করিল,—"কি রকম?"

"আমাদের বারের প্রেসিডেন্ট অতুল বাবু ঐ পাড়াতেই থাকেন কি না—তা তিনি এবং আরও পাঁচ জনে ব'ল্‌ছেন, ও-পাড়ায় ভদ্দর লোকের বাস, ওখানে মুসলমানকে বাড়ী দিলে সক্কলকারই অসুবিধে হবে, তা-ই ভাবছি—আবার এদিকে..."

ভদ্দর লোকের পাড়ায় 'মুসলমানকে' থাকিতে না দেওয়ার ইঙ্গিতে আবদুল কাদের বড়ই রুষ্ট হইয়া কহিল,—"তা ও-পাড়া যে ভদ্রলোকের পাড়া তা তো আপনার জানা ছিল, তবে আমার মত 'অভদ্র' অর্থাৎ মুসলমানকে কেন কথা দিয়েছিলেন মশায়?"

"না, না, মশায় কিছু মনে ক'রবেন না—আপনাকে কেন অভদ্র ব'লে মনে ক'ত্তে যাব..."

"ভদ্রলোকের পাড়ায় যাকে থাক্‌তে দেওয়া উচিত হয় না, সে অভদ্র নয় তো কি?"

"না না, মৌলবী সাহেব,—ওটা একটা কথার কথা বৈ তো নয়—যেমন ধরুন না, বাঙ্গালী ব'ল্লে আপনারা বাঙ্গালী হিন্দুকেই বোঝেন..."

"কই, তা তো বুঝিনে—আমরাও তো বাঙ্গালী......"

"আমি অনেক মুসলমানকে ব'লতে শুনিছি,—"মুসলমানেরা আজকাল ধুতি প'রে বাঙ্গালী সাজে। এর মানে কি?"

"এর মানে এই যে, অনেক মুসলমান ভিন্ন দেশ থেকে এসে এখানে বাস ক'চ্ছে কি না, তাই। আর এদেশের আসল বাশিন্দাদেরই বাঙালী বলে ; কিন্তু তাই ব'লে আপনারা হিন্দু ব'লেই যে 'ভদ্র' নামের একমাত্র অধিকারী, আর কেউ ভদ্রলোক নয়, এমন মনে করা কি ঠিক?"

"কি জানেন মৌলবী সাহেব, ওটা কথার কথায় দাঁড়িয়ে গেছে—তা আপনি কিছু মনে ক'র্বেন না। আমি ওঁদের আপত্তি মান্‌তাম না ; আসল কথা হ'চ্ছে কি জানেন, ও বাড়ীখানি ঠিক

আমার নয় কি না ; ওটা হ'চ্ছে আমার এক পিসিমার—তিনি বিধবা মানুষ—জানেনই তো আমাদের বিধবারা কেমন গোঁড়া। তো তিনি কিছুতেই দিতে রাজী হলেন না। ব'ল্লেন, ওইটুকুই তাঁর সম্বল আছে, ওতে অনাচার হ'লে তাঁর অকল্যাণ হবে। এমন কথা ব'ল্লে তো আর পীড়াপীড়ি করা যায় না। এখন কি করি। এ-দিকে আপনাকেও কথা দিয়ে রেখেছি, ও-দিকে পিসিমাকেও রাজী ক'ত্তে পাচ্ছি নে, আমি মহা মুশ্‌কিলে প'ড়ে গিইছি..."

আবদুল কাদের বিরক্তির সহিত কহিল,—"বাড়ী যখন আপনার নিজের নয়, তখন তাঁকে না জিজ্ঞেস ক'রে আপনার কথা দেওয়া উচিত হয় নি..."

"আমি তখন এতটা ভাবিনি মশায়—তিনি যে আপত্তি ক'ত্তে পারেন, এ-কথা আমার মনেই হয় নি। নইলে কি আর আপনাকে এমন ক'রে হয়রান করি? তা আপনি কিছু মনে ক'রবেন না মশায়। তবে এখন উঠি সেলাম।"

সন্ধ্যার পর আকবর আলী এবং আবদুল্লাহ্ তাহার মেঘাচ্ছন্ন মুখ দেখিয়া বুঝিলেন যে, একটা কিছু ঘটিয়াছে। আবদুল কাদের নিষ্ফল ক্রোধে ও ঘৃণায় উত্তেজিত হইয়া শশীবাবুর ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া কহিল,—"দেখুন তো, লোকটার আচরণ। এমন ক'রে আশা দিয়ে নিরাশ ক'ল্লে। এ কি মানুষের কাজ?"

আকবর আলী কহিলেন,—"তা আর কি ক'রবেন বলুন। ব্যাপারটা কি হ'য়েছে, তা আমি বুঝতে পেরেছি। ওর বাড়ীখানার ভাড়া বাড়াবার দরকার ছিল, সুযোগ পেয়ে আপনাকে দিয়ে বাড়িয়ে নিলে। আপনি ২০৲ টাকা দিতে রাজী হ'য়েছিলেন, এই ব'লে সে আর কারুর কাছে থেকে অন্ততঃ ১৮৲ টাকা তো আদায় ক'রবেই। যখন আপনার সঙ্গে কথা-বার্তা হয়, তখন হয় তো সে লোককেও সেখানে হাজির রেখেছিল ; আপনার মুখ থেকেই তাকে শুনিয়ে দিয়েছে যে, ভাড়া বেশী দিতে চেয়েছেন! আমি অনেকদিন থেকে ওদের সঙ্গে মেলা-মেশা ক'চ্ছি কি-না, ওদের কল-কৌশল আমার কিছু কিছু জানা আছে। দেখে নেবেন ক'দিন পরে।"

২১

১৯০৫ সালের বঙ্গবিভাগের দরুন দেশের সর্বত্র যে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল তাহারই ফলে রসুলপুরের হাইস্কুলে তুমুল স্বদেশী আন্দোলনের উদ্ভাবনা হয়। ছাত্রেরা বিদেশী দ্রব্যের ব্যবহার রহিত করিল, মাথায় করিয়া দেশী কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্য ফেরী করিতে আরম্ভ করিল এবং দল বাঁধিয়া বাজারে গিয়া বিলাতী দ্রব্যের বেচা-কেনা বন্ধ করিবার জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই প্রণোদিত করিতে লাগিল। ইহাই লইয়া পুলিশের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং কয়েকজন ছাত্র ধৃত হইয়া শাস্তিও পায়। তাহার পর শিক্ষাবিভাগ হইতে এই ব্যাপারের তদন্ত করিবার জন্য স্বয়ং বিভাগীয় ইনস্পেক্টর রসুলপুরে আসিলেন এবং ছাত্রগণকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য প্ররোচিত করার অপরাধে হেডমাষ্টার এবং তাঁহার কয়েকজন সহকারীকে বরখাস্ত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্কুলটি হইতে স্বদেশী আন্দোলনের বীজ সমূলে নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে উহাকে অস্থায়ীভাবে গভর্ণমেন্ট স্কুলে পরিণত করিবার জন্য উপরে লিখিয়া পাঠাইলেন।

এইরূপে রসুলপুরে স্কুলের গোলমাল মিটাইয়া ইনস্পেক্টর সাহেব বসিরহাটি জেলা স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিলেন। পূর্বেই সংবাদ দেওয়া ছিল ; হেডমাষ্টার মাষ্টার-ছাত্র সকলের উপর কড়া কড়া নোটিশ জারি করিতে লাগিলেন, যেন পরিদর্শনের দিন সকলের পরিধানে পরিষ্কার কাপড় থাকে ; সমস্ত শ্লেট-বহি, খাতা-পত্র প্রভৃতি আনিতে যেন কেহ না ভুলে, স্কুল-ঘরের ছাদ ও দেওয়ালের কোণগুলি হইতে মাকড়সার জালের রাশি বেশ করিয়া ঝাড়িয়া দরজা-জানালাগুলি ভিজা ন্যাকড়া দিয়া মুছিয়া এবং মেঝে ভাল করিয়া ধুইয়া তক্‌তকে করিয়া রাখা হয়। কয়দিন হইতে স্কুলের চাকর-বাকরগুলার খাটিতে খাটিতে প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হইল ; তথাপি

তাহাদের কার্য হেডমাষ্টারের মনঃপূত হইল না। দু'-বেলা তিনি সদলবলে আসিয়া তাহাদের উপর সচীৎকার 'তম্বি' করিতে লাগিলেন। খাজনা অপেক্ষা বাজনাই বেশী হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে "শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ সাহেব আসিবেন ; মাষ্টার-ছাত্র সকলেই সকাল-সকাল স্কুলে আসিয়া পড়িয়াছেন। কোন ক্লাসে সামান্য একটু গোল-মালের আভাস পাইলে পাঁচ সাত জন ছুটিয়া গিয়া চাপা গলায় "এই এই! চুপ্ চুপ্।" বলিয়া ধমক দিতেছেন। ছাত্রেরা কি একটা নিদারুণ বিভীষিকা আসন্ন হইতেছে মনে করিয়া, উদ্বেগে মুখ অন্ধকার করিয়া গুটি-গুটি মারিয়া বসিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছে।

লাইব্রেরী ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কয়েকজন মাষ্টার নিম্নস্বরে আলাপ করিতেছে—সাহেব আসিয়া কি বলিবে, কি করিবে, কাহার চাকুরী থাকিবে, কাহার যাইবে—এমন সময় চাপরাসী দৌড়িয়া আসিয়া খবর দিল—"সাহেব, সাহেব!" অমনি সকলে যে যার ক্লাসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যাহাদের ক্লাস ছিল না, তাঁহাদিগকে লইয়া হেড মাষ্টার গেটের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। এসিষ্ট্যান্ট-ইনস্পেক্টর, ডিপুটি-ইনস্পেক্টর, সব-ইনস্পেক্টর, ইনস্পেক্টিং পণ্ডিত প্রভৃতি সামন্তবর্গ পশ্চাতে লইয়া সাহেবের শুভাগমন হইল ; অমনি সকলে সপাগড়ী মস্তক আভূমি অবনত করিয়া সেলাম করিলেন। সাহেব হস্তস্থিত ক্ষুদ্র ছড়িখানির অগ্রভাগ হ্যাটের প্রান্ত পর্যন্ত উঁচু করিয়া সেলাম গ্রহণ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওয়েল হেড মাষ্টার, হাউ আর ইউ?"

"থাঙ্ক্ ইউ সার, আই এ্যাম কোয়াইট ওয়েল" বলিয়া হেড মাষ্টার সাহেবের সুদীর্ঘ পদক্ষেপের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে তাঁহার কামরায় আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

যথারীতি স্কুলের বিবরণাদি পরীক্ষা করিয়া ইনস্পেক্টর সাহেব ক্লাস পরিদর্শন করিতে উঠিলেন। সামন্তবর্গকে নিম্নতর শ্রেণীগুলির পরীক্ষার ভার দিয়া সাহেব উপরকার চারিটি ক্লাস দেখিবেন বলিয়া নোটীশ দিলেন। সকলে যে যার ক্লাসে গিয়া পরীক্ষা-কার্যে ব্যাপৃত হইলেন। খোদ সাহেব প্রথম শ্রেণীতে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

ছাত্রেরা যথাসাধ্য নীরবতার সহিত উঠিয়া দাঁড়াইল এবং শিক্ষক মহাশয় যথারীতি সেলাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। সাহেব কামরাটির উপর-নীচে চারিদিকে এক নজর দেখিয়া লইলেন। দেওয়ালগুলির উপর-নীচের দিকটায় স্থানে স্থানে এবং মেঝের প্রায় সর্বত্র কালির ছিটার দাগ একটু একটু দেখা যাইতেছে; ওদিকে সম্মুখের দিক্কার জানালার খিলানের কোণে খানিকটা ঝুল বাতাসে নড়িতেছিল। এই সকলের দিকে সাহেবের দৃষ্টি প্রথমে পড়িয়া থাকে; তাই তিনি একটুখানি টিটকারী দিয়া কহিলেন,—"ওয়েল হেড মাষ্টার, আপনি স্কুলঘরটি তেমন পরিষ্কার রাখিতে যত্ন করেন না মনে হইতেছে।"

যাহার জন্য চাকরদের সঙ্গে বকাবকি করিয়া গলা ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহারি জন্য সাহেবের কাছে অপ্রস্তুত হইতে হইল! হেড মাষ্টার মহাশয়ের মনে ভয়ানক ক্রোধের উদয় হইল ; তিনি সাহেবের একটু পশ্চাৎদিকে সরিয়া আসিয়া মুখখানা ভীষণ রকম বিকৃত করিয়া, চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটাইয়া একবার এ-দিক ও-দিক চাহিলেন। ভাগ্যে ভৃত্যদের কেহ সেখানে উপস্থিত ছিল না ; থাকিলে আজ নিশ্চয়ই ভস্ম হইয়া যাইত!

প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষা শেষ করিয়া সাহেব একে-একে অপরাপর শ্রেণীর পরীক্ষা লইলেন। পরীক্ষা শেষে তিনি মত প্রকাশ করিলেন যে, ছেলেরা পড়াশুনায় মন্দ নহে, কিন্তু ছেলেদের একটা ভয়ানক বদ অভ্যাস হইয়াছে—তাহারা লিখিবার সময় কলম ঝাড়িয়া মেঝে ও দেওয়াল নষ্ট করে। ভবিষ্যতে যেন হেডমাষ্টার এদিকে বিশেষ নজর রাখেন।

পরিদর্শন শেষ হইতে প্রায় চারিটা বাজিয়া গেল। সাহেব চলিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় একটি প্রিয়দর্শন সুবেশ ছাত্র ছুটির দরখাস্ত লইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। পশ্চাতে দপ্তরী দোয়াত-দান হাতে দাঁড়াইয়াছিল ; সাহেব দরখাস্তখানা হাতে লইতেই একজন শিক্ষক তাড়াতাড়ি একটা কলম তুলিয়া লইয়া দোয়াতে ডুবাইয়া একবার মেঝের উপর ঝাড়িয়া

সাহেবের দিকে বাড়াইয়া ধরিলেন। সাহেব একটু মুচকি হাসিয়া কলম লইলেন এবং দুইদিনের ছুটি মঞ্জুর করিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় হেডমাষ্টারকে বলিয়া গেলেন, যদি কোন শিক্ষকের বিশেষ কোন কিছু বলিবার থাকে, তবে আগামী কল্য প্রাতে ৮টা হইতে ৯টার মধ্যে ডাক বাঙ্গালায় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে পারেন। কে কে দেখা করিতে যাইবেন, তাহা যেন আজই সন্ধ্যার মধ্যে তাঁহাকে লিখিয়া জানানো হয়। তবে কেহ যেন অনর্থক তাঁহাকে বিরক্ত করিতে না যান, হেড মাষ্টার সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লিষ্ট প্রস্তুত করিলেন।

পরদিন প্রাতে হেড মাষ্টার মহাশয়ের প্রস্তুত লিষ্ট অনুসারে যে তিন জন শিক্ষক সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন, তাঁহারা আটটার পূর্বেই আসিয়া ডাক-বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলেন। একটু পরে আবদুল্লাহ্ও আসিয়া হাজির হইল! তাহাকে দেখিয়া একজন শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি যে, আপনার নাম তো হেডমাষ্টার লিষ্টে দেন নাই, সাহেব কি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন? আপনি কার্ড দিবেন না, অনর্থক সাহেব বিরক্ত হবেন, আর আমাদেরও কাজ নষ্ট হবে।"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"না মশায় ভয় নেই, আমি এখন কার্ড দিচ্ছিনে। আপনারা দেখা-টেখা ক'রে আসুন, তারপর আমি কার্ড দেবো ; তারপর সাহেব যা করেন!"

যথাসময়ে শিক্ষকত্রয়ের একে একে ডাক হইল। দশ-পনর মিনিটের মধ্যেই তাঁহাদের রাজদর্শন সমাধা হইয়া গেল। সাহেব মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন ; তাঁহারাও হাসি মুখে ভবিষ্যৎ প্রমোশনের কথা কল্পনা করিতে করিতে যে যাহার ঘরে গেলেন। আবদুল্লাহ্ কার্ড পাঠাইয়া দিল।

একটু পরে আবদুল্লার ডাক হইল। ঘরে ঢুকিবামাত্র সাহেব কহিলেন,"ওয়েল মৌলবী, আপনার নাম তো হেড মাষ্টার পাঠান নাই, তবে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন কেন?"

আবদুল্লাহ্ বিনীতভাবে কহিল,—"সার, আমি নিজের কোন কথার জন্যে আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে আসিনি, এখানকার আঞ্জুমানের তরফ থেকে প্রেরিত হ'য়ে এসেছি..."

"আঞ্জুমানের কি এমন বিশেষ কথা আছে?"

"সার, স্কুলে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা এখন ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠেছে। দু'-বছর আগে ছিল মাত্র তেইশটি, কিন্তু বর্তমানে আটত্রিশটি হ'য়েছে। অথচ ফারসী পড়াবার জন্য মৌলভী নেই। আঞ্জুমান প্রার্থনা করেন যে, একজন মৌলবী নিযুক্ত করা হোক।"

"এখানকার মুসলমান ছাত্রেরা তো সব সংস্কৃত পড়ে ; তবে মৌলবীর দরকার কি?"

"ফারসী প'ড়তে পায় না ব'লেই তারা সংস্কৃত পড়ে, সার। মৌলবী পেলে সকলেই ফারসী প'ড়বে এবং ভবিষ্যতে ছাত্রের সংখ্যা আরও বাড়বে ব'লে আঞ্জুমান মনে করে।"

সাহেব একটু ভাবিয়া কহিলেন,—"আচ্ছা, বেশ. আপনি আঞ্জুমানকে ব'লতে পারেন একটা Representation দিতে। আমি এ-সম্বন্ধে বিবেচনা ক'রব। আর কোন কথা আছে?"

"না সার, আমার আর কোন কথা নাই।"

আবদুল্লার ইংরেজী কথা-বার্তায়, তাহার সসম্ভ্রম অথচ নিঃসঙ্কোচ আলাপে এবং তাহার আদব-কায়দায় সাহেব তাহার দিকে বেশ একটু আকৃষ্ট হইতেছিলেন। তিনি একটু ভাবিয়া কহিলেন,—"এসিষ্ট্যান্ট ইনস্পেক্টারের মন্তব্যের মধ্যে দেখলাম আপনি দেশী খেলার বড় পক্ষপাতী ব'লে তিনি রিমার্ক ক'রেছেন—কেন, আপনি ফুটবল, ক্রিকেট, এগুলো পছন্দ করেন না?"

আবদুল্লাহ্ কহিল, "খুবই করি, সার। এ-গুলোতে শরীর মন উভয়ের স্ফূর্তি জন্মে এবং ছাত্রদের পক্ষে একান্ত উপযোগী। কিন্তু আমাদের ফিল্ড ছোট, স্কুলের সকল ছাত্র এক সঙ্গে খেলায় যোগ দিতে পারে না। সুতরাং অনেক ছাত্রই হয় বাড়ীতে চুপ ক'রে বসে থাকে, না হয় গল্প ক'রে বেড়ায়। আর খুব বেশী করে তো মাঠের একধারে ব'সে খেলা দেখে। তাই আমি তাদের জন্যে কতকগুলো দেশী খেলা চালিয়েছি, যার জন্য কোন বড় মাঠ দরকার হয় না, আরও

অনেকগুলো ছেলে এক সঙ্গে খেলতে পারে, এমন কি, রাস্তার ধারে একটু জায়গা পেলেও খেলা চলে।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কি খেলা আপনি চালিয়েছেন?"

আবদুল্লাহ্ তখন ডাণ্ডাগুলি, হাডু-ডুডু, কপাটি, গোল্লাছুট প্রভৃতি খেলার বিবরণ সাহেবকে বলিয়া বুঝাইয়া দিল। সাহেব শুনিয়া কহিলেন,—"এ-খেলাগুলো তো বেশ। কিন্তু তাই ব'লে ফুটবল, হকি, এ-গুলো একেবারে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।"

"না সার, ওগুলোও ছেলেরা খুব খেলে। প্রায়ই অন্যান্য স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে 'ম্যাচ' হয়, তাতে আমাদেরই বেশীর ভাগ জিত হয়।"

সাহেব কহিলেন—"খেলার দিকে আপনার এতটা ঝোঁক আছে, ভাল কথা। এ-সব থাকলে আর ছেলেরা বদ্ খেয়ালের দিকে যাবার অবসর পায় না। আপনার চাকরী কত দিনের হ'ল?

"এই প্রায় আড়াই বৎসর হ'য়েছে।"

"কোন গ্রেডে আছেন।"

"চল্লিশ টাকার গ্রেডে।"

"আপনি আণ্ডার গ্রাজুয়েট?"

"যখন চাকুরীতে ঢুকি তখন আণ্ডার গ্রাজুয়েট ছিলাম ; এই বৎসর বি-এ পাশ ক'রেছি। আরবীতে সেকেণ্ড ক্লাস অনার পেয়েছি।"

"ওঃ, বটে? বড়ই সুখের বিষয়। আশা করি, সত্বরই সার্ভিসে আপনার উন্নতি হবে।"

এই বলিয়া সাহেব চুপ করিলেন। আবদুল্লাহ্ বিদায় লইবার জন্য কিঞ্চিত মাথা নোয়াইয়া আদাব করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সাহেব আবার কহিলেন,—"আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে খুশী হ'য়েছি, মৌলবী। আপনার যাতে একটা বিশেষ সুবিধে হ'য়ে যায়, তার জন্য আমি চেষ্টা ক'রব—তবে এখন স্পষ্ট কিছু ব'লতে পাচ্ছি নে।"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"আপনার মেহেরবানিই আমার পক্ষে যথেষ্ট, সার।"

সাহেব একটু হাসিয়া কহিলেন,—"অল্ রাইট, মৌলবী, গুড মর্ণিং।"

আবদুল্লাহ্ আবার আদাব করিয়া বিদায় লইল।

২২

প্রায় চারি বৎসর পরে হালিমা শ্বশুর-বাড়ী আসিয়াছে। এবার সৈয়দ সাহেব নিজে উদ্যোগ করিয়া পীরগঞ্জে গিয়া তাহাকে লইয়া আসিয়াছেন। বরিহাটি হইতে দলিল-লেখা-পড়া করিয়া ফিরিয়া আসিয়াই তিনি মসজিদের কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু ভাল লোক অভাবে কাজ বড়ই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। তাই মসজিদটি শেষ করিয়া তুলিতে আট নয় মাস লাগিয়া গেল। মসজিদ শেষ হইয়াছে ; সৈয়দ সাহেব যেখানে যত আত্মীয়-স্বজন আছে, কেবল এক মীর সাহেব ছাড়া সকলকেই কোথাও আবদুল মালেককে পাঠাইয়া, কোথাও নিজে গিয়া, দাওৎ করিয়াছেন। রমযান মাসের ১লা তারিখেই আকামত হইবে। খুব একটা ধুমধামের আয়োজন হইতেছে। সে সময়ে পূজার ছুটিও হইবে এবং আবদুল কাদেরকেও বাড়ী আনা হইবে। তখন মৌলুদ শরীফ, খাওয়া-দাওয়া, ফকির খাওয়ান, এইসব করিতে হইবে।

বেহান কিন্তু প্রথমে হালিমাকে ছাড়িতে চাহেন নাই,—আজ প্রায় চারি বৎসর সে তাঁহার কাছে আছে, এখন হঠাৎ চলিয়া গেলে তিনি একলা কেমন করিয়া থাকিবেন, ইত্যাদি। কিন্তু সৈয়দ সাহেব কোন কথাই শুনিলেন না ; এমন কি বেহানকে শুদ্ধ লইয়া যাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। উভয় তরফের তর্কাতর্কির ফল এই দাঁড়াইল যে, হালিমা এক্ষণে একবালপুরে যাউক, পূজার ছুটির তো আর বেশী দেরী নাই, আবদুল্লাহ্ বাড়ী আসিলে তাহার মাতা সৈয়দ সাহেবের মসজিদ আকামতের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবেন। কিন্তু ফিরিবার সময় ছেলে, বউ, মেয়ে, জামাই, সব লইয়া আসিবেন।

পূজার ছুটি আসিল ; আবদুল্লাও বাড়ী আসিল। কয়েক দিন পরে আবদুল কাদের একবালপুরে আসিলে পীরগঞ্জে লোক পাঠান হইল। আবদুল্লাহ্ মাতাকে লইয়া শ্বশুর-বাড়ী আসিল।

ধুমধাম খুব হইল। এবার আত্মীয়-স্বজন কেহ কোথাও বাকী নাই। শরীফাবাদ, মজিলপুর, রসুলপুর, নূরপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় সকলেই মায় সওয়ারী 'তশ্‌রীফ' আনিয়াছেন। এমন কি, আবদুল খালেকও এবার সপরিবারে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

পহেলা রমযান 'বাদ মগরেব' (সান্ধ্য নামাযের পর) মসজিদে মৌলুদ শরীফ শুরু হইল। ঝাড়-ফানুসে মসজিদের অন্দর ও বারান্দা আলোকময় এবং শোভাময় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু লোক আর ধরিতেছে না—মসজিদ নিতান্ত ছোট নহে, ঢের লোক ধরিতে পারে ; কিন্তু যিনি আসিতেছেন, তিনিই মসজিদে প্রবেশ করিয়াই দরজার কাছে বসিয়া পড়িতেছেন, কেহই মসনদের কাছে ঘেঁষিয়া বসিবার বে-আদবীটুকু স্বীকার করিতে চাহিতেছেন না। সুতরাং আদব রক্ষা করিতে গিয়া জায়গার টানাটানি পড়িয়া গেল। অধিকাংশ লোককে বারান্দাতেই বসিতে হইল।

ক্রমেই যখন বারান্দা ভরিয়া গেল, তখনও গ্রামের নিমন্ত্রিতদের আসিতে বাকী। তাঁহারাও একে-একে আসিতে আরম্ভ করিলেন। এখন বসিতে দেওয়া যায় কোথায়? আবদুল মালেক তাড়াতাড়ি আসিয়া হুকুম করিলেন,—"ওরে বাইরে একটা বড় শতরঞ্চি পেতে দে!"

আবদুল্লাহ্ নিকটেই ছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাইরে কেন?"

আবদুল মালেক কহিলেন,—"তবে এঁরা ব'সবেন কোথায়? ভিতরে তো ধরগে' তোমার আর জায়গা নেই!"

"কেন থাকবে না? মসজিদের মধ্যে তো সব খালি প'ড়ে আছে!"

"তা সেখানে তো কেউ ব'সছে না, এখন ধরগে' তোমার করি কি?"

"আচ্ছা, আমি দেখছি, দাঁড়ান—বাইরে বসান কি ভাল দেখাবে?" এই বলিয়া আবদুল্লাহ্ অতি কষ্টে বারান্দার ভিড় ঠেলিয়া মসজিদের মাঝখানের দরজাটির কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং যাঁহারা দরজা ঘেঁষিয়া ঠাসাঠাসি করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে কহিতে লাগিল,—"আপনারা একটু এগিয়ে বসুন, জনাব!"

সকলেই ঘাড় ফিরাইয়া তাহার দিকে একবার চাহিল, কিন্তু কেহই নড়িয়া বসিল না।

আবদুল্লাহ্ আবার কহিল,—"ঢের জায়গা রয়েছে সুমুখে, আপনারা একটু এগিয়ে না ব'সলে যে অনেক লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।"

এই কথায় দুই এক জন একটু নড়িয়া কেহ আধ হাত, কেহ বা বড় জোর মুটুম হাত পরিমাণ অগ্রসর হইয়া বসিলেন। অনেক বলিয়া-কহিয়াও আবদুল্লাহ্ ইহাদিগকে আবার নড়াইতে পারিল না। দেখিয়া বাহিরে ফিরিয়া আসিল এবং যাঁহারা দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই ভিতরে বসাইবার জন্য ডাকিয়া আনিল।

কিন্তু তাহারাও দরজা পর্যন্ত আসিয়া থমকিয়া গেলেন! কি ভয়ে যে কেহ ভিতরের খোলা ময়দানের মত খালি জায়গায় গিয়া বসিতে চাহিতেছেন না তাহা আবদুল্লাহ্ ভাবিয়া পাইল না। অবশেষে বিরক্ত হইয়া সে বারান্দার ভিড়ের মধ্য হইতে ছোট ছোট ছেলেগুলোকে টানিয়া তুলিয়া ভিতরে ঠেলিয়া দিতে লাগিল। সে বেচারারাও ভিড়ের চাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিল, এদিকে বারান্দার নবাগতগিগেরও কিঞ্চিৎ স্থান হইয়া গেল।

মৌলুদ পাঠ শুরু হইা গেল। মৌলুদ খান সাহেব কলিকাতার আমদানী, সঙ্গে দুইজন চেলা। তাঁহার গলা যেমন দারাজ, তেমনি মিষ্ট ; তিনি প্রথমেই কোর্-আন মজিদ হইতে একটি সুরা এমন মধুর 'কেরাতে'র সহিত আবৃত্তি করিয়া গেলেন যে, সকলে শুনিয়া মোহিত হইয়া গেল। তার পর উর্দু কেতাব খুলিয়া সম্মুখস্থ বালিশের উপর রাখিয়া চক্ষু বন্ধ করিলেন এবং উর্দু

গদ্যে ও গজলে, কখনও বা দুই একটা ফারসী বয়েতে নানাসুরে, কখনো বা একা, কখনো চেলাদ্বয়ের সহিত একত্রে, 'রওআয়েতের'পর 'রওআয়েত' আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলেন। প্রথমেই পবিত্র মৌলুদ শরীফ শ্রবণের অশেষবিধ গুণের বর্ণনা করা হইল—কেমন করিয়া বোগ্দাদবাসিনী এক ইহুদী রমণী একদা স্বপ্নে স্বয়ং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে প্রতিবেশী মুসলমান বণিকের গৃহে শুভাগমন করিতে দেখিয়াছিল এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিল যে, যে বাটীতে মৌলুদ শরীফ পাঠ করা হয় হযরত স্বয়ং এই রূপে সদা-সর্বদা সেই বাটীতে অদৃশ্যভাবে যাতায়াত করিয়া থাকেন—আবু-লাহাবের বাঁদী তাহার প্রভুর নিকট হযরতের জন্ম-সংবাদ আনিয়া কিরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল এবং সেদিন সোমবার ছিল বলিয়া মৃত্যুর পর কাফের থাকা বশতঃ দোজখে গিয়াও কিরূপে প্রতি সোমবারে 'আযাব' (নরক-যন্ত্রণা) হইতে রেহাই পাইয়া আসিতেছে—যে ঘরে মৌলুদ শরীফ পাঠ করা হয় সে ঘরে কিরূপে ফেরেশতাগণের শুভাগমন হইয়া থাকে এবং তথায় কিরূপ অপূর্ব স্বর্গীয় আলোক প্রদীপ্ত হইয়া থাকে, পবিত্র হাদিস শরীফে তাহার কি কি প্রমাণ দেওয়া আছে—এসকল যথাযথরূপে বিবৃত হইল।

তাহার পর এই বিশ্ব-জগতের সৃষ্টির পূর্বের কথা আসিল। তখন কেবল আল্লাহ্-তা'লার পবিত্র নূর এবং সেই নূর হইতে তাঁহারই ইচ্ছায় সৃষ্টি আমাদের নবী-করিম সাল্লাল্লাহু আলায়-হেস্-সালামের পবিত্র নূর ভিন্ন আর কিছুই বিদ্যমান ছিল না। এই পবিত্র মোহাম্মদী নূর তখন এক পবিত্র স্থানে বহু আবরণের মধ্যে রক্ষিত ছিল—পরে উহা ঐ সকল আবরণ হইতে বহির্গত হইয়া নিশ্বাস লইলে সেই পবিত্র নিশ্বাস হইতে ফেরেশতাগণ, পয়গম্বরগণ এবং বিশ্বাসিগণের আত্মাসমূহ সৃষ্টি হইল। ইহার পর ঐ নূর দশ ভাগে বিভক্ত হইল এবং দশম ভাগ হইতে উৎপন্ন বস্তুর দৈর্ঘ্য চারি সহস্র বৎসরের পথের ন্যায় হইল, প্রস্থও তাহার অনুরূপ হইল। আল্লাহ্ যখন ঐ বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন উহা কাঁপিতে কাঁপিতে অর্ধেক জল ও অর্ধেক অগ্নিতে রূপান্তরিত হইয়া গেল। ঐ জল সমুদ্রে পরিণত হইল এবং সমুদ্রের তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে বায়ুমণ্ডলের উৎপত্তি হইয়া এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া দিল। তাহার পর সেই অগ্নির উত্তাপে সমুদ্রে ফেন ও বাষ্প এই দুইটি পদার্থ উৎপন্ন হইল ; ফেন হইতে জন্মিল মৃত্তিকা এবং বাষ্প হইতে হইল আকাশ। মৃত্তিকা তখন টলমল করিতেছিল সুতরাং তাহাকে স্থির করিবার জন্য ফেনের মধ্যে যেগুলি অত্যন্ত বৃহদাকার এবং শুভ্রবর্ণ ছিল, সেগুলিকে পর্বতরূপে পেরেকে পরিণত করিয়া মৃত্তিকায় ঠুকিয়া দেওয়া হইল। আবার পর্বতগুলির মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবেশ করিয়া খনির সৃষ্টি করিয়া দিল।

পরে যখন আল্লাহ্ তালা মানুষ সৃষ্টি করিলেন, তখন ঐ মোহাম্মদী নূর কিরূপে হযরত আদম আলায়হেস সালামের পৃষ্ঠে অর্পিত হইয়াছিল, এবং অর্পণকালে তিনি পশ্চাদ্দিকে কিরূপ সুমধুর ধ্বনি শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া গিয়াছিলেন ; কিরূপে হযরত আদমের বংশাবলীর মধ্যে পর পর কাহার কাহার পৃষ্ঠে ঐ নূর প্রকাশিত হইতে হইতে অবশেষে কোরেশ বংশের বনি হাশেম শাখার আবদুল্লার মুখমণ্ডলে আসিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহাই দেখিতে পাইয়া কিরূপে এক বুদ্ধিমতী ইহুদী সুন্দরী শেষ নবীর গর্ভধারিণী হইবার লোভে আবদুল্লার মনোহরণ করিয়া তাঁহার সহিত বিবাহিতা হইবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছিল ; যখন আমেনা খাতুনের সহিত আবদুল্লার বিবাহ হয়, তখন কিরূপে মক্কাবাসিনী দুই শত রূপসী যুবতি "রশ্ক ও হাসাদ্-সে" মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল ; যে রাত্রে আমেনা বিবির গর্ভসঞ্চার হয়, সে রাত্রে কিরূপে হযরত জিবরীল বেহেশ্‌ত হইতে সবুজ রঙ্গের পতাকা আনিয়া কাবার উপর স্থাপন করিয়াছিলেন, কিরূপে শয়তানের আকুল ক্রন্দনে আরবের উপত্যকাগুলি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিরূপে পৃথিবীর যেখানে যত দেব-দেবীর মূর্তি ছিল, সমস্তই মস্তক অবনত করিয়াছিল, কিরূপে পৃথিবীর জীব-জন্তুসমূহ বাকশক্তি পাইয়া হযরতের শুভাগমন বিষয়ের আন্দোলন জুড়িয়া দিয়াছিল—এ সকল ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হইতে লাগিল।

অবশেষে যখন আমেনা বিবির প্রসবকাল নিকটবর্তী হইল তখন তিনি দেখিলেন যে, সূতিকাগৃহে জ্যোতির্ময়ী রমণীবৃন্দের দ্বারা আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেই তাঁহারা কহিলেন যে, তাঁহারা বেহেশ্‌তের হুর, খোদা-তা'লা কর্তৃক আমেনা বিবির সেবা-শুশ্রূষার জন্য প্রেরিত হইয়াছেন। এমন সময় একটা বিকট শব্দ হইল—আমেনা চকিতা ও ভীতা হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ এক প্রকাণ্ড শ্বেতকায় পক্ষী আসিয়া আমেনার বক্ষঃস্থলে ডানা ঘষিয়া দিল, অমনি তাঁহার ভয় দূর হইয়া গেল। কিন্তু ভয়ের পরিবর্তে ভয়ানক পিপাসা বোধ হইতে লাগিল। হঠাৎ কোথা হইতে এক যুবক আসিয়া পড়িলেন এবং এমন এক পেয়ালা শরবৎ তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন, যাহা দুধ অপেক্ষা ও শুভ্র এবং মধু অপেক্ষাও মিষ্ট ছিল। আমেনা তাহাই পান করিয়া সুস্থ হইলেন—যথাসময়ে হযরত ভূমিষ্ঠ হইলেন।

এখানে মৌলুদ-খান সাহেবের ইঙ্গিত-মত মজলিসের সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত সুর মিলাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে "এয়া নবী সালাম আলায়-কা" ইত্যাদি সালাম পড়িতে লাগিলেন। মৌলুদ খান এক এক চরণ একা একা সুর করিয়া পাঠ করেন, আর চরণ-শেষে সকল একযোগে "এয়া নবী" ইত্যাদি কোরাস্‌ ধরিয়া সুরে-বেসুরে চীৎকার করিতে থাকেন। ক্রমে সালাম পাঠ শেষ হইলে আবার সকলে বসিয়া পড়িলেন।

মৌলুদ-খান এক্ষণে কিছুক্ষণ দরূদ শরীফ পড়িলেন এবং অনেকেই গুণ গুণ স্বরে তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। পরে হযরত রসুলে মকবুল আহ্‌মদ মোজ্‌তবা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহ আলয়াহেস সালামের শুভ জন্মগ্রহণ মুহূর্তে পৃথিবীর কোথায় কোথায় কি কি অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার বর্ণনা আরম্ভ হইল। হযরত মুসা আলায়হেস্‌ সালাম্‌ তাঁহার শিষ্যবর্গকে (ইহুদীগণকে) বলিয়া গিয়াছেন যে, আকাশের একটি বিশেষ নক্ষত্র স্থানচ্যুত হইলে দুনিয়াতে কোন নবীর আবির্ভাব হইবে। তদবধি ইহুদিগণ পুরুষপরম্পর সেই নক্ষত্রটি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল, অদ্য সহসা উহা খসিয়া পড়িল! শাম-প্রদেশস্থ একটি অতিথিশালার কূপ কয়েক বৎসর হইতে একেবারে শুকাইয়া গিয়াছিল, অদ্য হঠাৎ তাহা জলপূর্ণ হইয়া উঠিল! পারস্য দেশের সওয়া নামক প্রায় দশ ক্রোশব্যাপী হ্রদবিশেষ হঠাৎ শুকাইয়া গেল এবং সাম্‌ওআ নামক মরুভূমিটি এক জলপূর্ণ হ্রদে পরিণত হইল! পারসিক অগ্নি-উপাসকদিগের অগ্নিকুণ্ড সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া অবাধে জ্বলিয়া আজ হঠাৎ নিভিয়া গেল এবং পারস্যরাজ নওশেরোআনের প্রাসাদচূড়া চূর্ণ হইয়া ভূপতিত হইল! এবং পরিশেষে কাবা-মন্দিরের প্রতিমাগুলি মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া গেল!

এইরূপ বহু অলৌকিক ঘটনার বর্ণনার পর মৌলুদ সাহেব এক দীর্ঘ 'মুনাজাত' (প্রার্থনা) করিয়া মৌলুদ শরীফ সাঙ্গ করিলেন। সমস্তই উর্দু ভাষাতে কথিত ও গীত হইল ; অধিকাংশ লোকেই তাহার এক বর্ণও বুঝিল না ; কিন্তু তাহাতে কাহারও পুণ্যসঞ্চয়ের কোন বাধা হইল না।

যাহা হউক, মৌলুদ শেষে যথারীতি মিষ্টান্ন বিতরণের পর সকলে উঠিয়া পড়িলেন। প্রতিবেশী সাধারণ লোকেরা ঘরে ফিরিয়া গেল। দুই-চারিজন আত্মীয় রাত্রের আহারের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা রহিয়া গেলেন। সাধারণের নিমন্ত্রণ পর-দিন রাত্রে।

এইরূপে বিপুল সমারোহের সহিত নূতন মসজিদের 'আকামত'—পর্ব শেষ হইল। কয়দিন ধরিয়া বাটীর প্রভু-ভৃত্য সকলকেই ক্রমাগত খাটিয়া প্রাণান্ত হইতে হইয়াছে। কিন্তু অন্দরমহলে যাহা কিছু খাটুনী তিনটি প্রাণীর উপর দিয়া গিয়াছে। হালিমা তো বধু তাহাকে খাটিতেই হইবে, কিন্তু রাবিয়া ও তাহার বোন যে খাটুনীটা খাটিয়াছিল, যেরূপ বাঁদীর মত শ্রমে ও ভগ্নীর মত যত্নে সমাগতা বিবিগণের সেবা করিতেছিল, তাহাতে সেই বিবিগণের মধ্যে যাঁহারা উহাদিগকে চিনিতেন না তাঁহারা উহাদের আভিজাত্য-সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া এক দস্তরখানে বসিতে ইতস্ততঃ করিতে ছিলেন। এমন সময় মজিলপুরের এক বিবি, কয়েকজনকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া রাবিয়াদের পরিচয় দিয়া কহিলেন, রাবিয়ার পিতামহ দ্বিতীয়বার যে বিবাহ করিয়াছিলেন, সে

বিবি একটু নীচু ঘরের মেয়ে—রাবিয়ার পিতা তাঁহারই গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া শরীফাবাদের এক বিবি কহিলেন,"হুঁ, সে আমি চা'ল-চলন দেখে আগেই ঠাউরেছিলাম!" এবং সৈয়দ সাহেবের বড় বিবিকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বেয়ান সাহেব, রাবিয়ারা কি আমাদের সঙ্গে এক দস্তরখানে ব'সবে?"

বড় বিবি কহিলেন,—"না, না, ওরা কেন ব'সবে? ওরা খাদিমী ক'রবে 'খন।"

শরীফাবাদের বিবি কহিলেন,—"না, না, সেটা ভাল দেখাবে না। ওদের আলাদা ঘরে বসালেই হবে।"

শরীফাবাদের বেয়ান আবদুল মালেকের শ্বশুর হাজী সাহেবের বিবি এবং হাজী সাহেব হইলেন এ অঞ্চলের মধ্যে একেবারে অতি আদি শরীফঘর ; সুতরাং তাঁহার কথা রাখিতেই হইল।

কিন্তু হালিমা এ কথা শুনিয়া একেবারে মর্মাহত হইল। সে তাহার শাশুড়ীকে গিয়া কহিল,—"তবে আমিও ব'সব না, আম্মা ; ভাবী সাহেবদের সঙ্গে খাব 'খন।"

শাশুড়ী বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—"বাঃ সে কি কথা! তুমি হ'লে মেজ বউ, বড় বউ ব'সবে, আর তুমি ব'সবে না? এঁরা সব কি মনে ক'রবেন?

"আর ওঁরাই বা কি মনে ক'রবেন? আজ সারাটা দিন ওঁরা খেটে হয়রান হ'য়েছেন, আর তাদের না নিয়ে খাওয়া কি ভাল হবে, ওদের মনে যে দুঃখ দেওয়া হবে তা হ'লে।"

শাশুড়ী কহিলেন,—"তা দুঃখু হ'লে কি ক'রব বাপু! যে যেমন, তার তেমন ভাবেই চ'লতে হবে তো? শরীফাবাদের বিবিদের সঙ্গে ব'সবার যুগ্যি ওরা নয়?"

এ-দিকে দস্তরখান পড়িয়া গিয়াছে। বাঁদীরা শাশুড়ী-বধূকে ডাকিতে আসিয়া কহিল,—"বিবিরা সব ব'সে গেছেন।"

"চল বউ আর দেরী ক'র না" বলিয়া তিনি হালিমার হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন। দুয়ারের কাছে আসিয়া সালেহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলেন,-"রাবিয়াদের জন্যে ও-ঘরে দস্তরখান দিতে ব'লেছি, দিল কিনা দেখে এস।"

সকলে বসিয়া গিয়াছেন, বাঁদীরা সিলামচি (হাত ধোওয়াইবার পাত্র) লইয়া একে একে হাত ধোয়াইতেছে, এমন সময় সালেহা আসিয়া মাতাকে কহিল—"তাঁরা তো নেই! বেলার কাছে শুনলাম, এক্ষুণি তাঁরা পাছ দুয়ারে পাল্কী ডেকে চ'লে গিয়েছেন।" বলিয়া মাতার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল।

হালিমা কাছেই ছিল, শুনিয়া তাহার মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। বড় বিবি মৃদুস্বরে কহিলেন—"ওঃ, গোস্‌সা ক'রে বিবিরা চ'লে গিয়েছেন।"

বিবিরা খাইতে বসিলেন। কেহ বা নখে করিয়া এক আধটা দানা অতি আস্তে মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন, কেহ বা এক লোক্‌মা মুখে দিলেন তো আর এক লোক্‌মা কবে দিবেন তাহার ঠিকানা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। প্রায় এক ঘন্টা সকলে দস্তরখানে বসিয়া রহিলেন, কিন্তু সকলের রেকাবীতেই রাশীকৃত গোশ্‌ত ও পোলাও রহিয়া গেল! শরীফ ঘরের দস্তুর অনুসারে কেহ কেহ বাটি হইতে আহার করিয়াই আসিয়াছিলেন; তাঁহারা কেবল সম্মান রক্ষার জন্য একবার দস্তরখানে বসিয়াছিলেন মাত্র। যাঁহাদিগের সত্যই পেটে ক্ষুধা ছিল, তাঁহারাও লজ্জায় পার্শ্ববর্তী স্তুপীকৃত রেকাবীর স্তূপ অধিক ক্ষয় করিতে পারিলেন না।

যাহা হউক কোন ক্রমে আহার পর্ব খতম হইল। বাঁদীরা সিলামচী ও বদ্‌না লইয়া একে একে বিবিদের হাত ধোয়াইতে আরম্ভ করিল। সে হাত ধোওয়ানও এক বিষম ব্যাপার! বাঁদী বেচারীদের ঝুঁকিয়া থাকিতে থাকিতে কোমরে ব্যথা ধরিয়া যায়, তথাপি বিবি একবার এক কোষ পানি হাতে লইয়া আবার যে দ্বিতীয় কোষ এ-জীবনে লইবেন, বেচারারা এরূপ ভরসা করিতে সাহস পায় না।

হাত ধোওয়ার ব্যাপার চলিতেছে, এমন সময় রাবিয়া ও মালেকাকে বারান্দার উপর উঠিতে দেখিয়া একটি অল্পবয়স্কা অদূরদর্শিনী বিবি বলিয়া উঠিলেন,-"এই যে, বাঃ! এতক্ষণ কোথায় ছিলেন আপনারা আমরা তো খেয়ে উঠলাম!"

রাবিয়া বেশ একটু পরিষ্কার গলায় কহিল, "— আমাকে ভাই তাড়াতাড়ি একটু বাড়িতে যেতে হল-একটা মস্ত কাজ ভুলে এসেছিলাম, না গেলে হয় তো বড্ড ক্ষতি হয়ে যেত ......"

"কি এমন কাজ ছিল যে খাবার সময় তাড়াতাড়ি কাউকে না ব'লে চ'লে গেলেন?"

"খান কয়েক নোট বালিশের নীচে রেখেছিলাম, তখন তাড়াতাড়ি আসবার সময় তা তুলে রাখতে মনে হয়নি। হঠাৎ মনে পড়ে গেল ..... তা থাক্, আপনাদের খাওয়া হয়ে গেছে বেশ হ'য়েছে—আমরা তো ঘরেরই মেয়ে বউ, আমরা খেয়ে নে'ব খন।"

হালিমা সাড়া পাইয়া তাড়াতাড়ি কোন মতে হাত ধুইয়া ছুটিয়া আসিল—তাহার মনে হইতেছিল, বুঝি রাবিয়ার বড়ই অভিমান ও দুঃখ হইয়াছে! কিন্তু তাহার হাসি মুখ দেখিয়া হালিমার মনের ভার অনেকটা লঘু হইয়া গেল। রাবেয়া তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল,—"বাঃ বেশ তো! আমাদের ফেলে নিজেরা খেয়ে এলে! এখন চল আমাদের খাওয়াবে বসে।"

ইহারা চলিয়া গেলে বিবিদের মধ্যে একটা সমালোচনার গুঞ্জন উত্থিত হইল। কেহ কহিলেন,—যাক বাঁচা গিয়েছে।" আবার কেহ বা কহিলেন,"—হলে কি হয়? মেয়েটা খুব চালাক বটে! সব দিক বজায় রেখে গেল।"

২৩

মসজিদ আকামতের দিন দুই পরেই হালিমার জ্বর হইল। প্রথম দিন জ্বর তেমন বেশী হয় নাই, কিন্তু দ্বিতীয় দিনে জ্বরের বেগটা কিছু প্রবল দেখা গেল। তৃতীয় দিনও সেইভাবে কাটিল।

গ্রামে এক বৃদ্ধ কবিরাজ ছিলেন ; সচরাচর তিনিই এ বাটির চিকিৎসা করিতেন। তাঁহাকে ডাকা হইল। রোগিনী মশারীর ভিতর রহিল, তাহার পার্শ্বে একটা দোহারা মোটা রঙ্গিন কাপড়ের পর্দা লট্‌কান হইল। পর্দার ভিতরে হালিমার মাতা, শাশুড়ী এবং আরও দুই একজন স্ত্রী-পরিজন রহিলেন। কবিরাজ আসিয়া পর্দার বাহিরে বসিলেন এবং রোগিনীর অবস্থা সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আবদুল কাদের এক একটি প্রশ্ন শুনিয়া পর্দার ভিতর যায় এবং একটু পরে আবার বাহিরে আসিয়া উত্তরটি কবিরাজ মহাশয়কে শুনায়। এই রূপে মোটামুটি অবস্থা জানিয়া তিনি একবার রোগিনীর হাত দেখিতে চাহিলেন। আবদুল কাদের ভিতরে গিয়া পর্দার একপ্রান্ত সামান্য একটু উঁচু করিয়া ধরিল এবং কবিরাজ মহাশয়কে হাত বাড়াইয়া দিতে কহিল। কবিরাজ মহাশয় পর্দার ভিতর হাত বাড়াইয়া দিলেন ; আবদুল কাদের তাঁহার হাতের তিনটি আঙ্গুল ধরিয়া হালিমার বাম হস্তের কব্জির উপর ধরিয়া রহিল ; কবিরাজ তিন আঙ্গুলে নাড়ী টিপিয়া ধরিয়া যতটা সম্ভব উহার গতি অনুভব করিতে চেষ্টা করিলেন এবং একটু পরে পর্দার ভিতর হইতে হাত টানিয়া লইলেন।

নাড়ী পরীক্ষা হইয়া গেলে সকলে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন দেখলেন, কবিরাজ মশায় ?"

কবিরাজ কহিলেন,—"জ্বরটা প্রবল বটে ; বাত-শ্লেষ্মার ক্ষেত্র ব'লে সন্দেহ হচ্চে—তবে ভয়ের কোনই কারণ নেই, গোড়াতেই যখন চিকিৎসা আরম্ভ হচ্চে, তখন ওটা কেটেই যাবে।"

তাহার পর তিনি ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া একটি টাকা দর্শনী পাইয়া প্রস্থান করিলেন।

ঔষধ রীতিমত চলিতে লাগিল। সঙ্গে-সঙ্গে সৈয়দ সাহেবের দোয়া তাবিয ; পানি পড়া এবং মক্কাশরীফ হইতে আনীত কোরবানী করা উটের শুক্‌নো ঘষা প্রভৃতিও প্রয়োগ করা হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আরও দুই দিন কাটিয়া গেল কিন্তু রোগের কোনই উপশম দেখা গেল না।

এ দিকে আবদুল কাদেরের ছুটি ফুরাইয়াছে, আগামী কল্যই তাহাকে সদরে হাজির হইতে হইবে। স্ত্রীর এই অবস্থা ; এক্ষণে সে কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না। কবিরাজ বলিতেছেন, ভয় নাই ; কিন্তু আবদুল্লার মনের সন্দেহ ঘুচিতেছে না। সে কহিল,—"রোগটা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে বোধ হচ্ছে!"

আবদুল কাদের কহিল,—"তাই তো। এখন কি করা যায় ?"

"আমি বলি, ডাক্তার দেখান হোক্ ; ও কবিরাজ টবিরাজের কর্ম নয়।"

"ভাল ডাক্তার বা এখানে কই ?"

"কেন? সদর থেকে আনা যাক্।"

আবদুল কাদের কহিল,—"ডাক্তার দেখাতে কি আব্বা রাজী হবেন? ডাক্তারী ওষুধের তিনি নামই শুনতে পারেন না।"

"তা না শুনতে পাল্লে চল্‌বে কেন? রোগটা কঠিন তাতে সন্দেহ নেই ; চল, বরং তাঁকে বলি গিয়ে।"

কিন্তু সৈয়দ সাহেব ডাক্তারের কথা শুনিয়া প্রথমটা চটিয়াই উঠিলেন। কহিলেন, "হ্যাঁঃ! এই রমযান শরীফে শরাব-টরাব খাইয়ে এখন বউটার আখেরাতের সর্বনাশ কর আর কি। কেন কবিরাজ মশায় তো বেশ দাওয়া দিচ্ছেন..."

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"কিন্তু তাতে তো কোন উপকার হচ্চে না, জ্বরটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, তাইতে সন্দেহ হচ্চে..."

না, নাঃ! তোমরা অনর্থক সন্দেহ কচ্ছ, বাবা। আর সন্দেহ কিসের ? খোদা যদি হায়াত রেখে থাকেন তো এতেই রোগ সেরে যাবে। তার উপর আমি যে সব তদ্‌বির কচ্ছি, এতে দেখো আল্লাহ্ রহম দেবে নিশ্চয়। ও-সব নাচিজ আর খাইয়ে কাজ নেই।"

আবদুল্লাহ্ জেদ করিয়া কহিল,—"তা হুযূর তদ্‌বির কচ্ছেন, ভালই হ'চ্চে। কিন্তু দো'য়ার সঙ্গে দাওয়া কত্তেও তো আল্লাহ তালা হুকুম ক'রেছেন।"

"তা দাওয়া তো চলছেই, আবার কেন!"

"ও কবিরাজি দাওয়াতে বড় ফল হবে ব'লে বোধ হয় না। আর আজকাল ওরা সকল সময় রোগ চিনতেই পারে না—অবিশ্যি যেটা ধত্তে পারে, ওষুদের গুণে সেটাতে উপকার করায় বটে..."

সৈয়দ সাহেব বিরক্তির সহিত কহিলেন,—"আর ডাক্তার ব্যাটারা এলেই অম্‌নি রোগ ধ'রে ফেলে! তা হ'লে আর দুনিয়ায় কেউ মরত না।"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"সে কথা হচ্চে না ; ডাক্তারেরা কবিরাজদের চেয়ে অনেক বেশী রোগী নিয়ে নাড়াচাড়া করে কিনা, তাই রোগ সম্বন্ধে এদের জ্ঞান কবিরাজদের চেয়ে বেশী জন্মে। তা ওষুধ না হয় কবিরাজ মশায়ই দেবেন, একবার একজন ডাক্তার দেখিয়ে পরামর্শ কল্লে বোধ হয় মন্দ হ'ত না।"

সৈয়দ সাহেব যেন একটু নরম হইলেন! ভাবিয়া কহিলেন, "ডাক্তার দেখে আর কিই বা এমন বেশী বুঝবে—একটুখানি নাড়ী টিপে দেখা ছাড়া তো আর কিছু হবে না, সে তো কবিরাজও দেখ্‌ছে।"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"ডাক্তারেরা নাড়ীর উপর বড় বেশী নির্ভর করে না, আর সব লক্ষণ ধ'রে রোগ নির্ণয় করে।"

"তবে অবস্থা গিয়ে বল্লেই তো হয়, ডাক্তার দরকার কি ?"

"কি কি অবস্থায় কোন্ কোন্ বিষয়ে সে জান্‌তে চাইবে, তা আমরা কি ক'রে বুঝ্‌ব? ডেকে আন্‌লে সে যা যা জিজ্ঞাসা করবে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ব'ল্‌তে পারা যাবে..."

"কাকে ডাক্‌বে, ঠিক্ ক'রেছ ?"

"ঠিক এখনো করিনি ; আবদুল কাদের আজ শেষ রাত্রেই রওয়ানা হচ্চে, সে কাল সদর থেকে ভাল ক'রে জেনে শুনে একজনকে নিয়ে আসবে।"

"কাছারি খুল্‌বে যে কা'ল! কি ক'রে আস্‌বে ও!"

"ছুটি নেবে।—তা এক কাজ কল্লে হয়। নেওয়াজ ভাই সাহেবকে বর সঙ্গে দিলে হয়। আবদুল কাদের যদি নাই আসতে পারে, তা উনিই ডাক্তার নিয়ে আসবেন 'খন।"

অনেক চিন্তার পর সৈয়দ সাহেব এই প্রস্তাবেই মত দিলেন ; কিন্তু বার বার করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন, যেন ডাক্তারি ঔষধ খাওয়ানো না হয়। বরং তেমন বেগতিক দেখিলে কলিকাতা হইতে হাকিম গোলাম নবি সাহেবকে আনা যাইবে।

পরদিন সদরে পৌছিয়াই আবদুল কাদের কোন্ ডাক্তারকে পাঠান যাইবে সে সম্বন্ধে আকবর আলী সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিল। অবস্থা শুনিয়া আকবর আলী কহিলেন,—"এখানকার নতুন এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জন শুনিছি ডাক্তার ভাল..."

"কে? দেবনাথ বাবু ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—তাঁর বাড়ীতো আপনাদের ওই দিকে..."

"পশ্চিমপাড়ায়—ভোলানাথ বাবুর ছেলে। তা উনি গেলে তো ভালই হয়।"

"তা যাবেন বই কি, বেশী দূর তো নয়..."

"চলুন না একবার তাঁর কাছে..."

"এখনই? কাছারীর সময় হ'য়ে এল যে!"

"আচ্ছা কাছারী যাবার পথে?"

"তাই।"

বেলা প্রায় এগারটার সময় হাসপাতালে গিয়া তাঁহারা ডাক্তার দেবনাথ সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং সকল কথা তাঁহাকে খুলিয়া কহিলেন। ডাক্তার বাবু একটু ভাবিয়া কহিলেন, "আমার হাতে দুটো কেস র'য়েছে, সন্ধ্যের সময় দেখ্‌তে যাবার কথা..."

আকবর আলী কহিলেন—"অমূল্য বাবুকে ব'লে গেলে হবে না?" অমূল্য বাবুও একজন এল্‌-এম্‌, এফ্‌, স্বাধীনভাবে প্র্যাক্‌টিস্‌ করেন।

ডাক্তার একটু ভাবিয়া কহিলেন,—"আচ্ছা দেখি, সাহেবকেও একবার বল্‌তে হবে..."

আবদুল কাদের কহিল,—"কিন্তু আজই রওয়ানা হ'তে হবে—সন্ধ্যের পরেই পৌছান চাই—কাল সকালে অবস্থাটা দেখে দু'পহরের মধ্যে ফিরতে পারবেন।"

ডাক্তার বাবু কহিলেন—"আচ্ছা আমি দেখি..."

আকবর আলী কহিলেন, "শুধু দেখি বল্লে হবে না ডাক্তার বাবু—আপনাকে যেতেই হবে।"

"আচ্ছা আমি একবার সাহেবের সঙ্গে আর অমূল্য বাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি—ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আপনার অফিসে খবর পাঠাব 'খন"।

আবদুল কাদের কহিল—"নৌকো ত'য়ের আছে—যে নৌকোয় এসেছি, আপনি সেইটেতেই যেতে পার্‌বেন। আর দেখি যদি আমি ছুটির যোগাড় কর্তে পারি, তো আমিও যাব 'খন সঙ্গে।"

ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়া উঠিয়া পড়িলেন। একদিকে সৌভাগ্যক্রমে ডাক্তার সাহেব অনুমতি দিলেন এবং অমূল্য বাবুও কেস দুটি একবার দেখিয়া আসিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন ; কিন্তু অন্যদিকে দুর্ভাগ্যক্রমে আবদুল কাদের ছুটি পাইল না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নূতন, লোকটা সুবিধার নহে।

যাহা হউক, খোদা নেওয়াজ ডাক্তার লইয়া বেলা প্রায় দুইটার সময় রওয়ানা হইয়া গেল। খোদা নেওয়াজ মাল্লাদিগকে ডবল ভাড়া কবুল করিয়া জোরে বাহিবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিল। তাহারাও প্রাণপণে বাহিয়া সন্ধ্যার পরেই একবালপুরের ঘাটে নৌকা ভিড়াইয়া দিল।

যথাসময়ে ডাক্তার বাবুকে রোগিনীর ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। কবিরাজ মহাশয়কে যে উপায়ে হাত দেখানো হইয়াছিল, তাঁহাকেও সেই উপায়ে দেখানো হইল। তাহার পর তিনি থার্মোমিটার বাহির করিয়া আবদুল্লার হাতে দিলেন। আবদুল্লাহ্‌ টেম্পারেচার লইয়া আসিলে দেখা গেল, জ্বর ১০৪° ডিগ্রী উঠিয়াছে। নানারূপ জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ডাক্তার বাবু জানিতে পারিলেন যে, জ্বর বৈকালের দিকেই বাড়ে এবং সকালে একটু কম থাকে। নিদ্রা, কোষ্ঠ,

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, শরীরের কোন স্থানে বেদনা আছে কিনা, কাসি ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

তাহার পর একটু ভাবিয়া ডাক্তার বাবু কহিলে, "চেষ্ট্-টা একটু এক্জামিন করা দরকার!"

আবদুল মালেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ?"

আবদুল্লাহ্ বুঝাইয়া দিতেই তিনি চোখ্ মুখ্ উল্টাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "না, না, সে ধরণে' তোমার কেমন ক'রে হবে।"

ডাক্তার বাবু দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "তা নইলে তো আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে। না বুঝে চিকিৎসাও তো করা যায় না!"

আবদুল্লাহ্ কহিল, "তবে উপায় ?"

ডাক্তার বাবু কহিলেন, "এক কাজ করুন। ষ্টেথস্‌কোপটা কানে দিয়ে পর্দার কাছে বসি, আপনারা কেউ ওধারটা নিয়ে যেখানে যেখানে বসাতে বলি, ঠিক সেইখানে সেইখানে চেপে ধরুন।

এখন হালিমার বুকে ষ্টেথসকোপ বসাইতে যাইবে কে? সকলে এ উহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। আবদুল মালেক আবদুল্লার কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সালেহা পারবে না ?"

আবদুল্লাহ কহিল, "দেখুন ব'লে।"

আবদুল মালেক পর্দার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সালেহাকে ইশারা করিয়া ডাকিয়া, কি করিতে হইবে, ফিস্ ফিস্ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। ডাক্তার বাবু কলটি কানে দিয়া পর্দা ঘেঁষিয়া বসিলেন, এবং প্রথমেই বুকের যেখানটায় ধুক্ ধুক্ করে, সেইখানে বসাইতে বলিলেন।

কিন্তু কলকানে দিয়া মিনিট দুই বসিয়া থাকিয়াও তিনি কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না ; আবার কহিলেন, "ভাল ক'রে চেপে ধরুন।" তবু কোন ফল হইল না।

"নাঃ, আর কাউকে বলুন" বলিয়া ডাক্তারবাবু কান হইতে ষ্টেথস্‌কোপ নামাইয়া ফেলিলেন। ক্রমে বাড়ীর স্ত্রী-পরিজন বালক ইত্যাদি যে যেখানে ছিল, সকলকে দিয়া চেষ্টা করা হইল ; কোন ফল হইল না। যদিও বা এক-আধবার একটু-আধটু শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও মশারির, পর্দার কাপড়ের এবং 'ধরনেওয়ালার' হাতের ঘষায় সব গুলাইয়া যায়।

"নাঃ, কিছু হ'ল না" বলিয়া অবশেষে ডাক্তার বাবু উঠিয়া পড়িলেন, পরে আবদুল্লার দিকে চাহিয়া একটু বিরক্তির স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনিও কি পারেন না?"

আবদুল্লাহ্ মৃদুস্বরে ইংরেজিতে কহিল, "যতক্ষণ এ বাড়ীতে আছে ততক্ষণ পারি না।"

"শ্‌শশ্—ননসেন্স" বলিয়া ডাক্তার বাবু বাহিরে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বাহিরে আসিয়া আবদুল্লাকে একটু আড়ালে ডাকিয়া লইয়া ডাক্তার বাবু কহিলেন, "কেস্ সম্বন্ধে খুব ডেফিনিট্ কিছু বুঝতে পারা গেল না। তবে ভাবে বোধ হচ্ছে, নিউমোনিয়া সেট্-ইন করেছে।"

আবদুল্লাহ্ একটু ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে উপায়?"

"উপায় সাবধানে চিকিৎসা! কিন্তু এখানে রাখলে তো চিকিৎসা চলবে না—বরিহাটিতে নিয়ে যেতে হবে।"

"আপনি একটু দয়া করে আস্‌তে পার্‌বেন না কি?"

"আমি আসতে পারি, কিন্তু রোজ তো পার্‌ব না। অথচ এ রোগীকে দু'বেলা দেখা দরকার।"

"ও! তবে তো বড় বিপদের কথা হ'ল দেখি!"

"হ্যাঁ, তা এখানে রাখতে চাইলে বিপদের কথা বই কি!"

"দেখি একবার ব'লে ; কিন্তু এঁরা যে রকম গোঁড়া, তাতে যে ওকে সদরে নিয়ে যেতে দেবেন, এমন তো ভরসা হয় না।

"কেন? আপনি জোর ক'রে বলবেন ; যদি বাঁচাতে চান্, তবে কাল সকালেই নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত ক'রবেন। এর পরে কিন্তু ওঁকে রিমুভ করা আন্‌সেফ হয়ে পড়বে।"

"আচ্ছা দেখি কদ্দুর কি কত্তে পারি!"

"তবে আমি এখন বাড়ী চল্লাম। কাল সকালেই একবার দেখে রওয়ানা হব।" ভিজিটের টাকা লইয়া ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলেন।

হালিমাকে সদরে লইয়া যাইবার প্রস্তাবে বৃদ্ধ সৈয়দ সাহেব তো একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি বসিয়াছিলেন—একেবারে আধ হাত উঁচু হইয়া চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সে কি? মান-সম্ভ্রম তোমরা আর কিছু রাখবে না দেখ্‌ছি!"

আবদুল্লাহ্ বেশ একটুখানি প্রতিবাদের সুরে কহিল, "মান-সম্ভ্রমের কথা পরে, জান বাঁচানো আগে। ডাক্তার বাবু যেমন বল্লেন, তাতে এখানে রেখে চিকিৎসা চল্‌তে পারে না, অথচ রোগ কঠিন।"

সৈয়দ সাহেব বিরক্ত হইয়া কহিলেন,"নাঃ, এখানে তো আর কারও কোন দিন চিকিৎসা হয় নি, তোমরা খোদার উপর ভরসা করতে শেখনি—ওটা ইংরেজি পড়ারই দোষ! খোদা যদি হায়াত রেখে থাকেন, তবে যেখানেই থাকুক না কেন, চিকিৎসা হবেই। তক্‌দির কখনও রদ হবার নয়।"

"তাই ব'লে কি তদ্‌বির কত্তে খোদা মানা করেছেন?"

"না, তা মানা করবেন কেন? বেশ ত, তদ্‌বির কর। কবিরাজ মশায় দেখছেন, না হয় কল্‌কেতা থেকে হাকিম সাহেবকেও আনাও। তিনি আমাদের হজরতের ঘরেও দাওয়া করে থাকেন—আর আমাদের পীর ভাই—খুব যত্ন ক'রে দাওয়া করবেন।"

আবদুল্লাহ্ কহিল, "আজ কালকার-হাকিমদের চিকিৎসার উপর আমার বিশ্বাস নেই। তাদের সেই চৌদ্দ পুরুষের তৈরীকতকগুলো নোস্‌খা আছে, সেইগুলো আন্দাজে চালায়, যেটা খাটে সেটাতে রোগ সারে, আর যেটা না খাটে, তাতে কিছুই হয় না। হালিমার যে অবস্থা, তাতে হাকিমের হাতে দিতে আমার ভরসা হয় না। ডাক্তারি চিকিৎসাই করাতে চাই।"

"তা ডাক্তারি করাতে হয়, এই খেনেই করাও—ও সদরে যাওয়া হবে না। আর সেখানে নিয়ে গেলেই বা রাখ্‌বে কোথায়? বাড়ী দেবে কে তোমাকে?"

"কেন আকবর আলী সাহেবদের ওখানে..."

"কীহ্! আকবার মুন্সীর বাড়ী? তারা কোন্ কালের কুটম আমাদের যে বউমাকে সেখানে পাঠাবো? দুপাতা ইংরেজি পড়ে জ্ঞান বুদ্ধি সব ধু'য়ে খেয়েছ? কি ব'লে তুমি ওদের বাড়ী নিয়ে যেতে চাইলে! ওরা কে, তা জান? ওদের সঙ্গে যে তোমরা বসা-ওঠা কর, সেই ঢের, তার উপর আবার অন্দর নিয়ে সেখানে যাওয়া! এ কি একটা কথা হল?"

বৃদ্ধের ভাবগতিক দেখিয়া আবদুল্লাহ্ প্রমাদ গণিল। সত্যই তো সেখানে আর বাড়ী পাওয়া যাইবে না। এক আকবর আলীর আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন কোন উপায় নাই; কিন্তু সৈয়দ সাহেব তাঁহার আভিজাত্যের গর্বে হালিমাকে সেখানে লইয়া যাইতে দিবেন না। আবদুল্লাহ্ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে আবদুল্লাহ্ সেই রাত্রেই পশ্চিমপাড়ায় সরকার মহাশয়ের বাড়ীর দিকে চলিল। সেখানে উপস্থিত হইয়া ডাক্তার বাবুর সহিত দেখা করিতে চাহিল। দেবনাথ তখন আহারে বসিয়াছিলেন। সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর কি? এত রাত্রে যে!"

আবদুল্লাহ্ দুঃখিতচিত্তে কহিল, "খবর বড় ভাল নয় ডাক্তার বাবু, হালিমাকে তো বারিহাটিতে নিয়ে যেতে পাচ্ছিনে।"

"কেন, কর্তার বুঝি অমত?"

"অমত ব'লে অমত! শুনে একেবারে চটেই উঠেছেন। সেখানে এক আমাদের মুন্সী সাহেবের বাড়ী ছাড়া আর উঠবার জায়গা নেই, কিন্তু সেখানে তিনি কিছুতেই নিয়ে যেতে দেবেন না।"

"কেন?"

"তারা নাকি ছোট লোক!"

"ওঃ! তবে একটা বাড়ী ভাড়া নেবেন'খন।"

"বাড়ী কোথায় পাব? মুসলমানকে কেউ বাড়ী দেয় না।"

"বাঃ! কেন দেবে না? চেষ্টা কল্লে নিশ্চয়ই পাবেন। ভাড়া পাবে-বাড়ী দেবে না কেন?"

"চেষ্টা এর আগে ঢের ক'রে দেখা গেছে। কোন মতেই পওয়া গেল না। আবদুল কাদের তো আজ ক'বছর মুন্সি সাহেবদের বাড়ীতে কাটিয়ে দিলে।"

দেবনাথ একটু চিন্তা করিয়া কহিনে,- "আচ্ছা, আমার কোয়ার্টার ছেড়ে দিই যদি তা হ'লে আসতে পারবেন?"

আব্দুল্লাহ্ একটু আশ্চর্যন্বিত হইয়া কহিল,-"আপনার কোয়ার্টার ছেড়ে দেবেন ? আর আপনি?"

"আমার ফ্যামিলি তো এখন ওখানে নেই; স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দিতেপারব। আমি হয় বাইরের কামরাটায় থাকব'খন না হয় হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্টের ওখানে......"

"সত্যিই বল্ছেন ডাক্তার বাবু?"

বাঃ! সত্যি বলছিনে তো কি আর মিথ্যে বলছি? আমার ও-সব প্রেজুডিস্ নেই।"

আবদুল্লাহ্ আবেগভরে দেবনাথের হাত ধরিয়া কহিল, -"ডাক্তার বাবু কি ব'লে আপনাকে ধন্যবাদ দেব তা আমি ভেবে পাচ্ছি নে। বাস্তবিক আমি......"

"থাক্ থাক্। আপনি এখন যান; গিয়ে সব বন্দোবস্ত ঠিক ক'রে ফেলুন; কাল সকালেই রওয়ানা হ'তে হবে। দেরী হয়ে গেলে রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে দাঁড়াবে।"

২৪

ডাক্তার বাবুর কোয়ার্টারটি পাওয়া গিয়াছে শুনিয়াও সৈয়দ সাহেব প্রথমটা রাজী হন নাই। কিন্তু আবদুল্লাহও একেবারে নাছোড়বান্দা হইয়া জেদ করিয়া হালিমাকে পরদিন বেলা দেড় প্রহরের মধ্যেই নৌকায় তুলিয়া ফেলিল। কেবল যে হালিমাকে লইয়াই ছাড়িল, এমন নহে। প্রবল বাধা ও গুরুতর আপত্তি খণ্ডন করিয়া সে সালেহাকেও লইয়া চলিল। নহিলে রোগীর শুশ্রূষা করিবে কে? আবদুল্লার মাতাও সঙ্গে গেলেন।

মাঝিরা নৌকা খুব টানিয়া বাহিয়া লইয়া চলিল। আসরের পূর্বেই তাঁহারা বরিহাটির ঘাটে পৌঁছিলেন। নদীর তীরেই ডাক্তার বাবুর কোয়ার্টার। হালিমাকে সাবধানে পালকীতে করিয়া বাসায় উঠান হইল। ডাক্তার বাবু বলিয়া পাঠাইলেন, রোগীকে এখন একটু বিশ্রাম করিতে দেওয়া হউক ; যদি একটু নিদ্রা হয় ভালই, যদি না হয়, সন্ধ্যার পরেই তিনি একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবেন।

আবদুল কাদেরের নিকট সংবাদ দেওয়া হইল ; সে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিল ; এবং আবদুল্লাহ্ কেমন করিয়া এমন অসাধ্য সাধন করিল তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। সে হাসপাতালে গিয়া ডাক্তার বাবুকেও অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আসিল।

ডাক্তার বাবুর ঝি দ্বিপ্রহরে বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল ; সন্ধ্যার পূর্বে সে আসিল। পরিবার নাই: ডাক্তার বাবু ছোট ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে খান ; কাজেই ঝাট-পাট দেওয়া ছাড়া তাহার আজকাল বড় একটা কাজ নাই। সে ধীরে-সুস্থে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া লোক-জন দেখিয়া মনে করিল, বুঝি গিন্নি মা-রা আসিয়াছেন। তাই সে একগাল হাসিয়া ঘরে উঠিয়া গেল ; কিন্তু ঘরের ভিতর সব অপরিচিত মুখ দেখিয়া অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কারা গো?"

আবদুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন?"

"না তাই জিজ্ঞেস কচ্ছি, আপনাদের নতুন দেখ্নু কি না......"

এমন সময় হালিমা ক্ষীণ স্বরে কহিল,—"ভাইজান একটু পানি!"

ঝি দুয়ারের বাহিরে কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। হালিমার কথা শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি কপাট ছাড়িয়া দিয়া পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর করিয়া বলিয়া উঠিল,—"মা গো! এরা যে মোচন্মান! ডাক্তার বাবু কেমন নোক গো! মোচন্মান ঘরে এনেচে! আমি এই চন্নু, আর এস্‌ব নি এদের বাড়ী আর কাজ ক'র্‌বো নি। মা গো! কি হবে গো—এই সন্ধ্যে বেলা নাইতে হবে গিয়ে..."

এরূপ বকিতে বকিতে এবং ডিঙ্গী মারিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে সে উঠান পার হইয়া চলিয়া গেল।

ঠিক সন্ধ্যার সময় ডাক্তার বাবু আসিলেন।

আবদুল্লাহ্ তাড়াতাড়ি এফ্‌তার করিয়া বাহিরে গেল এবং আবদুল কাদের খাটের উপর একটা মশারি লট্‌কাইয়া তাহার উপর দুই পার্শ্বে দুইটি মোটা চাদর ফেলিয়া পর্দা করিয়া দিল। একখানি চেয়ার আনিয়া বিছানার পার্শ্বে রাখিল। আবদুল্লাহ্ ডাক্তার বাবুকে লইয়া ভিতরে আসিল।

আবার সেই পর্দার হ্যাঙ্গামা দেখিয়া ডাক্তার বাবু কহিলেন,—"এর ভেতর তো ষ্টেথস্কোপ ইউস্ করা যাবে না!"

আবদুল কাদের উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন?"

ডাক্তার বাবু একটু হাসিয়া কহিলেন,—"হার্ট আর লাংস-এর শব্দ অত্যন্ত মৃদু, খুব সাবধানে শুনতে হয়। এত কাপড়ের ভেতর থেকে ষ্টেথস্কোপের নল চালিয়ে দিলে কেবল কাপড়ের ঘষার শব্দই শুন্‌তে পাওয়া যাবে,—লাংসের অবস্থা কিছুই বোঝা যাবে না। বাড়ীতেও তো ওরকম করা হয়েছিল, জিজ্ঞেস করুন আপনাদের দুলামিয়াকে।

আবদুল কাদের চিন্তিত হইয়া কহিল,—"তবে উপায়!"

ডাক্তার বাবু কহিলে,—"ও-সব মশারি টশারি তু'লে ফেলুন, রোগীকে ভাল ক'রে দেখ্‌তে দিন। না দেখে কি আন্দাজে চিকিৎসা চলে? আপনারা এজুকেটেড হ'য়েও যে এ সব ওল্ড ফগিইজ্‌ম্ ছাড়তে পারেন না, এ বড় আশ্চর্য!"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"কি জানেন, ডাক্তার বাবু-পর্দার মারামারিটা আমাদের ভেতর এত বেশী যে, ওর একটু এদিক-ওদিক হলেই মনে হয় বুঝি এক্ষণি আকাশ ভেঙ্গে মাথায় বাজ পড়বে। কিন্তু দরকারের সময় পর্দার একটু-আধটু ব্যতিক্রম কল্লে যে সত্যি সত্যিই বাজ পড়েন না, সংসার যেমন চল্‌ছে, তেমনিই চল্‌তে থাকে এটুকু পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌বার সাহস কারুর নেই।"

ডাক্তার বাবু কহিলেন,—"তবে কি আমাকে আন্দাজেই চিকিৎসা কত্তে হবে?"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"না, তা কল্লে চ'ল্‌বে কেন? এক কাজ করা যাক ; রোগীর গায়ে আগাগোড়া একটা মোটা চাদর দিয়ে দি, আপনি কাপড়ের উপর থেকে ষ্টেথ্‌স্কোপ লাগিয়ে দেখুন। আবদুল কাদের কি বল?"

আবদুল কাদের আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিল। আবদুল্লাহ্ আবার দৃঢ়স্বরে কহিল,—"নেও ওসব গোঁড়ামি রেখে দাও। ডাক্তার বাবু আপনি মেহেরবানি ক'রে একটু বাইরে দাঁড়ান, আমি সব বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি।"

ডাক্তার বাবু বাহিরে চলিয়া গেলেন। আবদুল্লার মাতা অনেক আপত্তি করিলেন, আবদুল কাদেরও লোকে শুন্‌লে কি বল্‌বে, আব্বা ভয়ানক চ'টে যাবেন, ইত্যাদি অনেক ওজর করিতে লাগিল, কিন্তু আবদুল্লাহ্ কাহারও কথায় কান দিল না। অবশেষে হালিমাও ক্ষীণ স্বরে আপত্তি জানাইল, কহিল,—"ভাইজান, কাজটা কি ভাল হবে? সকলেই নারায......"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—" নে নে' তুই থাম্ ; আমি যা কচ্ছি তোর ভালর জন্যেই কচ্ছি....."

"উনি যে অমত কচ্ছেন ভাইজান!"

"হ্যাঃ, 'ওর আবার মতামত! ওকে আমি ঠিক্ ক'রে নেব, তুই ভাবিস্ নে। থাক্ পড়ে এই চাদর মুড়ি দিয়ে, নড়িস্-চড়িস্ নে। আম্মা আপনি ও ঘরে যান। আবদুল কাদের, ডাক ডাক্তার বাবুকে।"

আবদুল্লাহ্ এরূপ দৃঢ়তার সহিত কথা বলিয়া এবং কাজ করিয়া গেল যে, কেহ আর বাধা দিবার সুযোগ পাইল না। "কর বাবা যা ভাল বোঝ! এখন বিপদের সময়—খোদা মাফ্ করনেওয়ালা।"

ডাক্তার বাবু আসিয়া যথারীতি পরীক্ষাদি করিয়া কহিলেন, "একবার চোখ মুখের ভাবটা দেখ্‌তে পাল্লে ভাল হয়।"

আবদুল্লাহ্ কহিল,"আর কাজ নেই ডাক্তার বাবু ; আজ এই পর্যন্ত থাক্। এর পর যদি দরকার হয়, না হয় দেখবেন। লাংসের অবস্থা কেমন দেখলেন?"

"চলুন, বল্‌ছি" বলিয়া ডাক্তার বাবু বাহিরে আসিলেন। আবদুল কাদের ও আবদুল্লাহ্ পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। ডাক্তার বাবু কহিলেন, "নিউমোনিয়া!"

আবদুল্লাহ্ শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একধারে, না দুই ধারেই?"

"ডান দিকটায় তো খুব স্পষ্ট, বা দিকটাতেও একটু কন্‌জেশ্চান বোধ হ'চ্ছে।"

"তা হ'লে তো ভয়ের কথা!"

"হ্যাঁ, একটু ভয়ের কথা!"

"হ্যাঁ, একটু ভয়ের কথা বই কি! তবে শুশ্রূষা ভাল রকম চাই। ওষুধ তো চল্‌বেই ; সঙ্গে সঙ্গে বুকে পিঠে অনবরত পুলটিস দিতে হবে। ঠিক যেমন ব'লে দেব, তার যেন একটুও ব্যতিক্রম না হয়। নার্সিংএর উপরেই সমস্ত নির্ভর কচ্ছে! আর একটা কথা—ইন্‌জেকশন ট্রিটমেন্ট কত্তে পাল্লে ভাল হত......"

আবদুল কাদের জিজ্ঞাসা করিল,—"সে কি রকম?"

"এক রকম সিরাম বেরিয়েছে, সেটা চামড়া ফুঁড়ে পিচকারী ক'রে দিতে হয়। রোগের প্রথম অবস্থায় দিতে পাল্লে খুবই ফল পাওয়া যায়। এখনও সময় আছে,—কিন্তু সিরাম কলকেতা থেকে আনতে হবে। চিঠি লিখে সুবিধে হবে না ; কি তার করেও সুবিধে হবে না—কার দোকানে পাওয়া যায় না যায়, অনর্থক দেরী হয়ে যেতে পারে। কাউকে যেতে হবে—আজ রাত্রের গাড়ীতেই......"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"তা বেশ আমিই না হয় যাচ্ছি—এখনও ট্রেনের সময় আছে।"

"তাই যান্! আমি লিখে দিচ্ছি—স্মিথ্ কি বাথগেট কি আর কোন সাহেব বাড়ী থেকে নেবেন—ফ্রেশ পাওয়া যাবে। আর নিতান্তই ওদের ওখানে না পান, তো অগত্যা বটকৃষ্ণ পালের ওখানে দেখবেন। কালকের গাড়ীতেই ফেরা চাই কিন্তু—পরশু সকালেই ইন্‌জেক্‌শন দিতে হবে।"

ডাক্তার বাবু প্রেস্‌ক্রিপশন্ লিখিয়া এবং শুশ্রূষার বিষয়ে ভালরূপে উপদেশাদি দিয়া সব-এসিষ্ট্যান্ট সার্জনের বাসায় চলিয়া গেলেন। আবদুল কাদের কহিল,—"দেখ ভাই, তুমি থাক, আমিই কল্‌কেতায় যাই..."

আবদুল্লাহ্ একটু আশ্চর্য হইয়া কহিল—"কেন?"

"তুমি না থাক্‌লে আমার দ্বারা ও-সব হাঙ্গাম হ'য়ে উঠবে না ভাই—বড় ভয় হয়, কি কত্তে কি ক'রে বস্‌ব—আমি ও-সব বড় একটা বুঝি সুঝি নে......"

আবদুল্লাহ্ একটু ভাবিয়া কহিল,—"তুমি যাবে কি? ছুটি যদি না পাও!"

"কাল যে রবিবার!"

"ওহ্ হো! তাও তো বটে। আচ্ছা তুমিই যাও আমি থাক্‌ছি।"

পরদিন প্রাতে কলিকাতায় পৌঁছিয়া আবদুল কাদের বরাবর তাহার পিতার পীর সাহেবের বাড়ীতে গিয়া উঠিল এবং সাক্ষাতে যথারীতি তাঁহার 'কদমবুসি' করিয়া হালিমার অবস্থা এবং তাহার আগমনের কারণ সমস্ত আরজ করিল। শুনিয়া তিনি কহিলেন,—"আচ্ছা, বাবা, দাওয়া করো আওর দো'য়া-ভি করো! আর সুফীকো তোম্‌হারে সাথ ভেজ দেতাহুঁ, যো যো তদ্‌বির হা'য় বাতা দেউঙ্গা উওহ্ ঠিক্ ঠিক্ করে গা—এন্‌শা আল্লাহ্ আওর কোই খাওফ নেহিহ রহে গা!"

পীর সাহেব যাঁহাকে সুফী বলিয়া নির্দেশ করিলেন, তিনি তাঁহার একজন প্রধান মুরীদ! তাঁহার প্রকৃত নাম সফিউল্লাহ, কিন্তু ধার্মিক লোক বলিয়া সকলে তাঁহাকে "সুফী সাহেব" বলিয়া ডাকিত। পোশাক তিনি ঠিক সুফী ধরনেরই পরিতেন ; কখন রঙ্গিন লুঙ্গি, কখন ঢিলা পায়জামা, তাহার উপর আগুল্‌ফ-লম্বিত ঢিলা কোর্তা এবং সর্বোপরি ঘন-ঘুন্টি দেওয়া দ্বিতীয়ার চাঁদের মত গোল পকেটওয়ালা বেগুনী মখ্‌মলের সদ্‌রিয়া আঁটা, মাথায় কলপ দেওয়া রেশমী সূতার কাজ করা সাদা টুপী, পায়ে দিল্লিওয়ালা নাগ্‌রা—দেখিলে লোকে তাঁহাকে পরম সুফী বলিয়া ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিত না। লেখাপড়া বড় কিছু শেখেন নাই ; তবে মছলেকায় কোরান মজিদের পারা দশেক মুখস্থ করিয়া নিম-হাফেজ হইয়াছিলেন। দেশে তাঁহার বড় কিছু নাই— এইখানেই পড়িয়া থাকেন আর হযরতের হুকুম তামিল করেন। কলিকাতাতেই জনেক পীর-ভাইয়ের এক বিধবা আত্মীয়াকে পীর সাহেবের হুকুমেই বিবাহ করিয়াছেন। সংসারের কোন ভাবনা-চিন্তা নাই, নিশ্চিন্ত মনে এবাদত-বন্দেগী করেন আর পীর সাহেবের মজলিসে বসিয়া অবসর কাল কাটাইয়া দেন।

আবদুল কাদের ঔষধ ক্রয় করিতে যাইবার জন্য বাহির হইবে মনে করিতেছে এমন সময় তাহার খালাত' ভাই মজিলপুরের ফজলুর রহমান আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আবদুল কাদেরকে দেখিয়া কহিল, "বাঃ, ভাই সাহেব যে! কখন এলেন?" বলিয়া 'কদমবুসি' করিল।

আবদুল কাদের কহিল, "এই সকালে। তুমি এখানে কদ্দিন?"

"বল্‌ছি, থামুন"—বলিয়া ফজলুর রহমান আবদুল কাদেরকে পার্শ্ববর্তী কামরায় লইয়া গেল! সেখানে তক্তপোশের উপর বসিয়া ফজলু কহিতে লাগিল, "আমি এবার ডেপুটিশিপের জন্যে ক্যাণ্ডিডেট হয়েছি। বি-এটা পাশ কর্তে পাল্লে কোন কথাই ছিল না—তবে হযরত আশা দিচ্ছেন, বল্‌ছেন, চেষ্টা কর, খোদার মর্‌যিতে হ'য়ে যাবে। তা উনি যখন এতটা বল্‌ছেন তখন তো আমার খুবই ভরসা হয়—কি বলেন ভাই সাহেব?"

আবদুল কাদের কহিল, "সে তো বটেই—ওঁর দো'য়ার বরকতে কি না হতে পারে।"

"হ্যাঁ—ভাই, একবার চেষ্টা ক'রে দেখছি—অনেক সাহেব-সুবার সঙ্গে দেখাও ক'রেছি। সেদিন আমাদের কমিশনার ল্যাংলি সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রতে গিয়েছিলাম, তিনি খুব খাতির-টাতির ক'রলেন—উঠে দাঁড়িয়ে শেকহ্যাণ্ড করে বসালেন—উঠে দাঁড়িয়ে, বুঝলেন ভাই সাহেব?"

"তা হ'লে বোধ হয় তোমার চান্স আছে। ম্যাজিষ্ট্রেট নমিনেশন দিয়েছে?"

"কমিশনার সাহেব বল্লেন, আমার কেসে সে-সব লাগবে-টাগবে না—একেবারে গভর্ণমেণ্ট থেকে হয়ে যাবে বোধ হয়। তিনি আমাকে চীফ সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা কত্তে বল্লেন......"

"করেছ দেখা?"

"না ক'রব এই দুই এক দিনের মধ্যে। কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে এই পরশু কলকেতায় এসেছি। হযরত যে দিন যেতে বল্‌বেন সেইদিন যাব। উনি যখন দো'য়া কচ্ছেন, তখন হ'য়ে যাবে নিশ্চয়—কি বলেন ভাই সাহেব?"

"খুব সম্ভব হ'য়ে যাবে......"

"সম্ভব কেন! হবেই নিশ্চয়—আমার খুব বিশ্বাস।"

"বেশ তো হয় যদি খুব সুখের বিষয় হবে।"

ফজলুর রহমান জিজ্ঞাসা করিল,—"তা আপনি এখন কি মনে ক'রে?"

"তোমার ভাবীর বড্ড অসুখ?"
"কি—কি অসুখ?"
"নিউমোনিয়া......"
"বাপ্‌রে! নিউমোনিয়া! কে দেখছে?"
"ডাক্তার দেবনাথ সরকার—বরিহাটির এসিষ্ট্যান্ট সার্জন। বেশ ভাল ডাক্তার—আমাদের ওদিকেই বাড়ী—তিনি এই ওষুধ লিখে দিয়েছেন, আজই কিনে নিয়ে রাত্রের গাড়ীতে ফিরতে হবে।" আবদুল কাদের প্রেস্ক্রিপ্‌শন বাহির করিয়া দেখাইল।
"ওঃ—নিউমোনিটিক সিরাম্‌। হ্যাঁ, আজকাল সিরাম ট্রিটমেন্টই হচ্ছে। তা কোত্থেকে নেবেন?"
"কোন সাহেব বাড়ী থেকে নিতে হবে।"
"চলুন তবে বাথগেটের ওখান থেকে কিনে দেব'খন।"
"তা হ'লে তো ভালই হয়, আমি ও-সব সাহেব-টাহেবদের দোকানে কখন যাইনি,—তুমি সঙ্গে গেলে ভালই হয়।"
"আচ্ছা যাব'খন খেয়ে-দেয়ে দুপুর বেলা।"
দ্বিপ্রহরের আহারাদির পর দুইজনে ট্রামে চড়িয়া বাথগেটের দোকানে গেল। সেখান হইতে ঔষধ কিনিয়া, চাঁদনী হইতে আরও কিছু জিনিসপত্র সংগ্রহ করিয়া বাসায় ফিরিবার জন্য তাহারা ট্রামে চড়িল। ট্রাম চলিতে লাগিল ; কিন্তু কণ্ডাক্‌টর টিকিট দিতে আসিল না। ক্রমে যখন ট্রাম তাহাদের নামিবার স্থানের নিকটবর্তী হইয়া আসিল, তখন সে আসিল। আবদুল কাদের পয়সা বাহির করিতেছিল, কিন্তু ফজলুর রহমান তাড়াতাড়ি দু'য়ানি বাহির করিয়া কহিল,—"থাক্‌ থাক্‌ আমিই দিচ্ছি—"বলিয়া দু'য়ানিটা কণ্ডাক্‌টরের হাতে দিয়া একটু ইশারা করিল। কণ্ডাক্‌টর চলিয়া গেল।
আবদুল কাদের কহিল, "ও কি! টিকিট না দিয়েই চ'লে গেল যে?"
"যাক্‌—টিকিট নিতে গেলে আরও চারটে পয়সা দিতে হ'ত—ছ-পয়সা ক'রে কিনা। ও দু'আনা ওরই লাভ—আমাদেরও কম লাগল।"
"সেটা কি ভাল হল? ঠকানো হল যে!"
"ওঃ! আপনি পাড়াগাঁয়ে থাকেন কিনা? এমন ঠকানো তো সব্বাই ঠকাচ্ছে....." বলিতে বলিতে উভয়ে ট্রাম হইতে নামিয়া বাসার দিকে চলিল।
সন্ধ্যার পর খানা খাইবার সময় পীর সাহেব সুফী সাহেবকে হালিমার রোগের জন্য যে যে তদ্‌বির করিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। রাত্রি নয়টার সময় আবদুল কাদের তাঁহাকে লইয়া একখানি গাড়ী করিয়া ষ্টেশনের দিকে রওয়ানা হইল। ফজলুর রহমানও তাঁহাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য সঙ্গে আসিল।
গাড়ীর ছাদে একটা বড় গোছের ট্রাঙ্ক, প্রকাণ্ড একটা বিছানার মোট এবং কতকগুলি পোঁটলা-পুঁটলি দেখিয়া কুলিরা আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সকলে গাড়ী হইতে নামিলে একটা কুলি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কৌন কিলাসকে টিকিট মুন্সিজী?"
ফজলুর রহমান কহিল,—"ইন্টার।"
কুলি জিজ্ঞাসা করিল,—টিকট হায়, না করনা হোগা?" করনা হোয় ত' জল্‌দি কিজিয়ে, পয়লা ঘণ্টা হো গিয়া।"
"আচ্ছা, আচ্ছা হাম্‌ জান্‌তা হায়।" বলিয়া ফজলুর রহমান গাড়োয়ানকে জিনিস-পত্র নামাইতে কহিল। কুলি নিম্নস্বরে কহিল, "কেয়া বখ্‌শিশ মিলেগা কহিয়ে, বিনা ওজনকে চড়া দেগা।"
আবদুল কাদের কহিল,—"আরে নেই, নেই, হাম্‌ লোগ ওজন করা লেগা।"
ফজলুর রহমান কহিল,—"আপনি আসুন না ভাই সাহেব, আমি দিচ্ছি সব ঠিক করে। এই কুলি কেৎনা লেগা, বোলো।"

কুলি কহিল,—"একঠো রুপিয়া মিল যায়, নবাব সাব!"

"আরে নেই, আট আনা দেগা, চড়া দেও।"

"নেই সাব—আপ লোক আমীর আদমী, একঠো রুপিয়া দে দিজিয়ে গা।"

"তব্ নেহি হোগা, যাও......"

কুলি যাইতে যাইতে কহিল,—"যাইয়ে ওজন করাইয়ে, দো তিন রুপিয়া লাগ যাগা।"

আবদুল কাদের কহিল,—"তা লাগে লাগুক, ও-সব ঠকামি দিয়ে কাজ নেই।"

ফজলুর রহমান একটু অগ্রসর হইয়া কহিল,—"এই কুলি, আরে চলো, কুছ কম লেও......"

"বারে আনা দিজিয়ে গা?"

"আচ্ছা চলো।"

"নেই, ঠিক ঠিক কহ দিজিয়ে—বারে আনা পয়সা লেঙ্গে, ইস্‌সে কম্‌তি নেহি হোগা!"

"আচ্ছা, আচ্ছা, দেঙ্গে চলো। জারা ঠাহরো, হাম্ টিকিট লে আতেহেঁ।"

আবদুল কাদেরের রিটার্ন টিকিট ছিল, কেবল সুফী সাহেবেরই জন্য টিকিট কিনিতে হইবে। ফজলুর রহমান ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। তাহার পর প্রায় পনের মিনিট হইয়া গেল, তবু সে ফিরিতেছে না দেখিয়া আবদুল কাদের উদ্বিগ্ন হইয়া তাহাকে খুঁজিতে গেল। কিন্তু টিকিট ঘরে তাহাকে কোথাও দেখিতে পাইল না। এদিক ওদিক খুঁজিয়া না পাইয়া ব্যস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে, এমন সময় ফজলুর রহমান অন্য একদিক হইতে আসিয়া পড়িল। আবদুল কাদের কহিল, "এত দেরী হল? আমি আরও তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।"

"ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? গাড়ীর এখনও ঢের সময় আছে। চলুন।"

সুফী সাহেব "খ্যাক্—থু" করিয়া থুথু ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"টিকিট হো গিয়া, ফজলু মিয়া!"

"হ্যাঁ, চলিয়ে, দেতেহেঁ" বলিয়া ফজলু সকলকে লইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল। গেটের ভিতর দিয়া আসিবার সময় আবদুল কাদের জিজ্ঞাসা করিল, "কুলিরা কোথায় গেল?" ফজলুর রহমান তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "চুপ্, আসুন, তারা আস্‌চে।"

ইন্টার ক্লাস কামরার ধারে তাঁহারা দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় কুলিরা অন্য পথে প্লাটফর্মে ঢুকিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিল। জিনিস-পত্র তুলিয়া কুলি বিদায় করিয়া ফজলু নিম্নস্বরে কহিল, "দেখুন, একটা লোকের কাছে একখানা রিটার্ন হাফ পাওয়া গেল। আজ শেষ তারিখ। তার যাওয়া হল না। আট গণ্ডা পয়সায় দিয়ে ফেল্লে। বেচারার সবটাই মারা যাচ্ছিল, আমাদেরও প্রায় ডেট্টাকা বেঁচে গেল।"

সুফী সাহেব একবার "খ্যাক্—থু" করিয়া একগাল কাসিয়া কহিলেন,"ওঃ! ফজলু মিয়া, আপ তো বড়া চালাক হ্যায়! আপনে আজ বহুত পয়সা বাঁচা দিয়া।"

ঘণ্টা পড়িল। তাড়াতাড়ি দুইজনে গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন। ফজলুর রহমান বিদায় লইয়া গেল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

২৫

বরিহাটিতে ফিরিয়া আসিয়া আবদুল কাদের দেখিল তাহার পিতা আসিয়াছেন। দেখিয়াই তো তাহার চক্ষুস্থির! এক্ষণে হালিমার চিকিৎসার কি উপায় হইবে, তাহাই ভাবিতে গিয়া পিতার 'কদমবুসি' করিতে সে যেটুকু বিলম্ব করিয়া ফেলিল, তাহা নিতান্তই দর্শনকটু হইয়া উঠিল।

পিতা যথাসম্ভব ক্রোধ চাপিয়া কহিলেন,—"তোমরা বাকি কিছু রাখলে না, দেখছি!"

আবদুল কাদের জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন, আব্বা?"

"ডাক্তারকে নাকি দেখানো হ'য়েছে ?"

"হ্যাঁ, তা চাদর মুড়ি দিয়ে তো ছিল!"

"থাক্‌লই বা! কোন্ শরীফের ঘরের বউ-ঝিকে এমন ক'রে ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষে করা'তে দেখেছ! আর কি মুখ দেখাবার যো রইল ? আবার শুনছি গা ফুঁড়ে দাওয়াই দেয়া হবে—ঐ ডাক্তারের সাম্‌নে বউ-মা গা আল্‌গা ক'রে দেবেন ?"

"হাতের ওপরটা একটুখানি আল্‌গা করে......"

"তা হলে বে-আবরু হ'ল না? তোমরা কি জ্ঞান বুদ্ধি একবারে ধু'য়ে খেয়েছ? আমি যদ্দিন আছি বাবা, তদ্দিন এ সব বে-চাল দেখতে পা'রব না। যা হবার তা হ'য়ে গেছে—ও-সব ডাক্তারি-ফাক্তারির কাজ নেই, বাড়ী নিয়ে চল, আমি হাকিম সাহেবকে আনাচ্ছি—হযরতের কাছ থেকেও দো'য়া তাবিয আনিয়ে দিচ্ছি, খোদা চাহে তো তাতেই আরাম হ'য়ে যাবে।"

"তাঁর কাছে গিয়েছিলাম..."

"গিয়েছিলে? তবু ভাল! তা তিনি কি বল্লেন ?"

"সুফী সাহেবকে পাঠিয়ে দিয়েছেন..."

"সুফী সাহেবকে?—কই, কোথায় তিনি ?"

"বাইরের ঘরে আছেন।"

সৈয়দ সাহেব তাড়াতাড়ি সুফী সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে চলিলেন।

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"এখন উপায়?"

"তাই তো, কি করি!"

"চল ডাক্তার বাবুর কাছে যাওয়া যাক, দেখি তিনি কি বলেন ?"

ব্যাপার শুনিয়া ডাক্তার বাবু কহিলেন,—"কেসের এখনও প্রথম অবস্থা, কোন খারাপ টার্ন নেয় নি। তবে ভবিষ্যতের জন্যে সাবধান হওয়া দরকার। কেবল ওষুধেও ফল যে না হয় এমন কথা নয়—ওষুধ আর শুশ্রূষা। কিন্তু ইঞ্জেকশন্ কয়েকটা দিতে পাল্লে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।"

তাহার পর একটু ভাবিয়া তিনি আবার কহিলেন,—"এক কাজ কল্লে হয়। আপনারা কেউ দিতে সাহস ক'রবেন?"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"কি, ইঞ্জেকশন্ ?"

আবদুল কাদের তাড়াতাড়ি কহিল,—"না, না, তার কাজ নেই..."

ডাক্তার বাবু কহিলেন,—"কেন, ভয় কি ? ইঞ্জেকশন্ দেওয়া অতি সহজ। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"আমাদের হাতে আবার কোন বে-কায়দা না হ'য়ে পড়ে..."

"না, না, কিছু হবে না। আপনি বরং আমার হাতেই দিয়ে একবার প্র্যাকটিস ক'রে নেন!"

এই বলিয়া ডাক্তার বাবু যন্ত্র-পাতি বাহির করিলেন এবং সেগুলি যথারীতি পরিষ্কার করিয়া আবদুল্লাহকে কহিলেন,—"আসুন, আপনার হাতে একবার ফুঁড়ে দেখিয়ে দি।"

আবদুল্লার বাহুমূলে হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জের সূঁচটি ফুটাইয়া দিয়া ডাক্তার বাবু প্রক্রিয়াগুলি বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তাহার পর সেটি বাহির করিয়া আবার পরিষ্কার করিলেন এবং নিজের বাহুমূল বাহির করিয়া দিয়া কহিলেন,—"এখন দিন দেখি আমাকে একটা ইঞ্জেকশন্।"

আবদুল্লাহ্ নির্দেশ মত সাবধানে ডাক্তার বাবুর বাহুমূলে রীতিমত টিংচার আইওডিন মালিশ করিয়া সূঁচটি প্রবেশ করাইয়া দিল। তাহার পর যেই নলদণ্ডটি টিপিতে যাইবে, অমনি ডাক্তার বাবু বাধা দিয়া কহিলেন,—"থাক্ থাক্ ওটা আর এখন টিপে অনর্থক খানিকটা বাতাস ঢুকিয়ে দেবেন না।"

আবদুল্লাহ্ নিরস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ঠিক হয়েছে তো ?"

ডাক্তার বাবু একটু হাসিয়া কহিলেন,—"হ্যাঁ, হ'য়েছে, ওতেই চল্‌বে। আমার হাতে হ'লে ব্যথাটা কম লাগ্‌ত!"

যাহা হউক, ডাক্তার বাবুর প্রদর্শিত প্রণালীতে যথারীতি সতর্কতা অবলম্বন করিয়া আবদুল্লাহ্ হালিমার বাহুমূলে ইঞ্জেকশন্ করিয়া দিল।

ঔষধাদি রীতিমত চলিতে লাগিল। এদিকে সৈয়দ সাহেব এবং সূফী সাহেব উভয়ে পীরসাহেবের আদেশ মত তদ্‌বির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হালিমার গলায় এবং বাহুতে তাবিয বাঁধিয়া দেওয়া হইল এবং দুই বেলা পীর সাহেবের দো'য়া-লেখা কাগজ ধুইয়া ধুইয়া খাওয়ানো হইতে লাগিল।

কিন্তু রোগীর শুশ্রূষা যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িল। আবদুল্লার মাতা তো একে রুগ্না,; এই রমযানের সময় তিনি আর কতইবা খাটিতে পারেন। রান্নার কাজ প্রায় সব তাঁহাকেই করিতে হয়, নইলে রোগীর পথ্য পর্যন্ত প্রস্তুত হয় না। পুলটিশ দেওয়া যেরূপ বৃহৎ ব্যাপার তাহাতেই দুইজন লোককে ক্রমাগত নিযুক্ত থাকিতে হয় ; কিন্তু লোকাভাবে তাহা রীতিমত দেওয়া ঘটে না ; আবদুল কাদেরের কাজ অনেক, বেলা দশটা হইতে প্রায়-সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহাকে আপিসে থাকিতে হয়। সালেহার তো জায়-নামায আর তস্‌বিহ্ আছেই ; তাহার উপর সন্ধ্যার পর তারাবির নামাযে খাড়া হইলে আর তাহাকে পাওয়া যায় না ; সুতরাং পরিচর্যা চলিতে পারে না ; বাঁদীগুলা তো কেবল চীৎকার করা ছাড়া অন্য কোন কাজ জানেই না।

ভাবিয়া চিন্তিয়া আবদুল্লাহ্ আবদুল খালেকের নিকট পত্র লিখিল।

এদিকে রোগীর অবস্থার আর বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যাইতেছে না—কোন দিন জ্বরের বৃদ্ধি, কোন দিন কাসির বৃদ্ধি—কিন্তু ডাক্তার বাবু বলিতেছেন, ভয়ের এখনও কারণ নাই। তবু আর একবার ফুস্‌ফুসের অবস্থাটা দেখিতে পারিলে ডাক্তার বাবু নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন ; কিন্তু তাহার উপায় নাই। তিনি ক'দিন আর এ বাড়ীতে আসেনই নাই; আবদুল্লাহ্ গিয়া অবস্থা জানাইতেছে এবং তিনি শুনিয়া ও টেম্পারেচার চার্ট দেখিয়া ব্যবস্থা দিতেছেন।

সে দিন শুক্রবার। সূফী সাহেব জুমার নামায পড়িবার জন্য মসজিদে যাইতে চাহিলেন। মসজিদ বলিয়া একটা কিছু বরিহাটির সদরে নাই। তবে মুসলমান পাড়ায় নিষ্ঠাবান পিয়াদা-চাপরাসীরা আকবার আলী সাহেবের নেতৃত্বে চাঁদা তুলিয়া একটা টিনের জুমা-ঘর প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে। সৈয়দ সাহেব পিয়াদা-চাপরাসীদের সঙ্গে নামায পড়িতে যাইবার জন্য মোটেই উৎসুক ছিলেন না ; কিন্তু সূফী সাহেবের প্রস্তাবে অমত করিতেও পারিলেন না। সুতরাং তাঁহাকে বিরস মনেই যাইতে হইল।

জুমা-ঘরে পৌঁছিয়া তাঁহারা দেখিলেন, প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন লোক জমিয়াছে। কেহ "কাবলাল্ জুমা" পড়িতেছে, কেহ বা পড়া শেষ করিয়া বসিয়া আছে। সৈয়দ সাহেবকে অনেকেই চিনিত, তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা তটস্থ হইয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া গিয়া সম্মুখের কাতারে তাঁহাদিগের জন্য স্থান করিয়া দিল। তাঁহারা অগ্রসর হইয়া কাবলাল-জুমা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। আর আর সকলে পশ্চাতে বসিল, প্রথম কাতারে কেহই বসিতে সাহস করিলনা।

কিছুক্ষণ পরে আকবর আলী সাহেব এবং একজন পাগড়ীওয়ালা মৌলবী এবং আরও কয়েকজন মুসল্লি মসজিদে প্রবেশ করিতে করিতে উপস্থিত সকলকে মৃদুস্বরে সালাম-সম্ভাষণ করিলেন। অনেকেই ঘাড় ফিরাইয়া তাঁহাদিগকে দেখিল এবং যথারীতি প্রতি-সম্ভাষণ করিল। সৈয়দ সাহেবের কাবলাল-জুমা তখনও শেষ হয় নাই।

পাগড়ী-ওয়ালা মৌলবী সাহেব অগ্রসর হইয়া সৈয়দ সাহেবের পার্শ্ব দিয়া সম্মুখস্থ পেশ-নামাযের উপর গিয়া কাবলাল-জুমা পড়িতে লাগিলেন। আকবর আলী সঙ্গী কয়জনকে লইয়া সৈয়দ সাহেবের সহিত প্রথম কাতারে স্থান লইলেন। সৈয়দ সাহেব নামায শেষ করিয়া একমনে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া নীরবে দোয়া'-দরূদ পড়িয়া যাইতে লাগিলেন।

সানি আযান হইয়া গেল। এক্ষণে জুমার নামায শুরু হইবে। পাগড়ী-ওয়ালা মৌলবী সাহেব খোৎবা পাঠ করিবার জন্য কেতাব হাতে লইয়া, মুসল্লিগণের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সৈয়দ সাহেব তাঁহাকে এক নযর দেখিয়া লইবার জন্য মাথা উঁচু করিলেন।

সেই পাগড়ী-ওয়ালা মৌলবী সাহেবকে দেখিবামাত্র সৈয়দ সাহেবের চেহারা ভয়ঙ্কর রকম বদ্‌লাইয়া গেল! ঘৃণায় ও রাগে কাঁপিয়া কাঁপিয়া "কেয়া হায়, এত্তা বড় বাৎ!" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

না জানি কি ঘটিয়াছে মনে করিয়া অনেকেই সেই সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল। আকবর আলী সাহেব ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি, কি, সৈয়দ সাহেব, কি হ'য়েছে?"

সৈয়দ সাহেব ক্রোধে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এত বড় আস্পর্ধা ওর! ব্যাটা জোলা, পাগড়ী বেঁধে এমামতি কত্তে এসেছে?"

আকবর আলী দৃঢ়স্বরে কহিলেন,—"কেন, তাতে কি দোষ হ'য়েছে? উনি তো দস্তুরমত পাশ করা মৌলবী, ওঁর মত আলেম এদেশে কয়টা আছে, সৈয়দ সাহেব?"

"এঃ! আলেম হ'য়েছে! ব্যাটা জোলার বেটা জোলা আজ আলেম হ'য়েছে, ওর চৌদ্দ পুরুষ আমাদের জুতো ব'য়ে এসেছে, আর আজ কিনা ও আমাদের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এমামতি ক'রবে, আর আমরা ওই ব্যাটার পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়ব?"

পাগড়ী-ওয়ালা মৌলবী সাহেব ধীরভাবে কহিলেন,—"এটা আপনার বাড়ী নয়, সৈয়দ সাহেব, এটা মস্‌জিদ, সে কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন।"

সৈয়দ সাহেব রুখিয়া উঠিয়া কহিলেন,—"চুপ রহ, হারামজাদা! আভি তুঝ্‌কো জুতা মারকে নেকাল দেঙ্গে!"

মুসল্লিগণের মধ্যে হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন—"উনি কোহান কার লাট সাহেব গো? আমাগোর মৌলবী সাহেবের গাল-মন্দ দিতি লাগলেন যে বড়! এ আমরাগোর জুমা-ঘর, দেন তো দেহি কেমন ক'রে ওনারে বার ক'রে দিতে পারেন উনি।"

আর একজন কহিল,—-ওনারেই দেও বার ক'রে—ওসব স'য়েদ-ফ'য়েদের ধার আমরা ধারিনে..."

আকবর আলী তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া কহিলেন,—"সৈয়দ সাহেব, এটা আপনার অন্যায়। কেতাব মত ধত্তে গেলে মুসলমানের সমাজেই উঁচু-নীচু বিচার নেই ; তাতে আবার এটা খোদার ঘরে..."

সৈয়দ সাহেব বাধা দিয়া কহিলেন,—"তাই বলে জোলা-তাঁতি-নিকেরী যে, সে জাতের পেছনে দাঁড়িয়ে নামায প'ড়তে হবে? ভাল চাও তো ওকে এক্ষুণি বেরক'রে দাও, ওর পেছনে আমরা নামায পড়ব না।"

সমবেত লোকের মধ্য হইতে একটা প্রতিবাদের কলরব উঠিল। একজন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"উনি না পড়েন উনিই বেরিয়ে যান্ না কেন? আমরা মৌলবী সাহেবকে দিয়ে নামায পড়াবই।"

"চ'লে আইয়ে সূফী সাহেব। জোল্‌হা-লোগ যাঁহা মৌলভী বন্‌কে ইমাম হোতা হায়, ওহাঁ ভালা-আদমীকা রাহ্‌না দোস্তর নেহী।" এই বলিয়া সৈয়দ সাহেব সূফী সাহেবকে টানিয়া বাহিরে লইয়া আসিলেন। সূফী সাহেব বাহিরে আসিয়া একবার "থ্যাক-থু" করিলেন এবং সৈয়দ সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেলেন। অতঃপর নির্ব্বিবাদে জুমার নামায শুরু হইয়া গেল।

গরম মেজাজে বাসায় আসিয়া সৈয়দ সাহেব যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মেজাজে একেবারে আগুন লাগিয়া গেল। তিনিও ঘরে ঢুকিতেছেন ডাক্তার বাবুও ষ্টেথস্‌কোপ গুটাইয়া পকেটে ভরিতে ভরিতে বাহির হইতেছেন। পশ্চাতে আবদুল্লাহ্ এবং বারান্দায় খোদা নেওয়াজ।

সৈয়দ সাহেব থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া চক্ষু লাল করিয়া একবার প্রত্যেকের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। ডাক্তার বাবু বরাবর বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

"তোমাদের নিতান্তই কপাল পুড়েছে, আমি দেখছি! যা খুশী তাই কর তোমরা—কিন্তু আমি এখানে আর এক দণ্ডও নয়। খোদা নেওয়াজ যাও, নৌকা ঠিক কর গিয়ে। সওয়ারি যাবার নৌকা চাই।"

খোদা নেওয়াজ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"সওয়ারি কেন, হুযুর ?"

সৈয়দ সাহেব চটিয়া উঠিয়া কহিলেন,"যা বলি তাই কর, কৈফিয়ৎ তলব ক'রো না।"

খোদা নেওয়াজ চলিয়া গেল। সৈয়দ সাহেব গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে আবদুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিল,—"এদের সকলকে কি নিয়ে যাবেন ?"

সৈয়দ সাহেব কহিলেন,—"না। কেবল সালেহাকে নিয়ে যাব। তোমাদের এ সব বে-পরদা কারবারের মধ্যে ওকে আমি রাখতে চাইনে। বউমাকে নিয়ে তোমরা যা খুশী তাই কর। ছেলেই যখন অধঃপাতে গেছে তখন বউ নিয়ে কি আমি ধুঁয়ে খাব ?"

আবদুল্লাহ্ বলিতে যাইতেছিল যে, তাহার স্ত্রীকে সে যাইতে দিবে না। কিন্তু আবার ভাবিল, তাহাকে রাখিয়াও যে বড় কাজের সুবিধা হইবে, এমন নয়; বরং তাহাকে ধরিয়া রাখিতে গেলেই শ্বশুরের সঙ্গে একটা মনোবিবাদের সৃষ্টি হইয়া যাইবে এবং স্ত্রীরও মনে কষ্ট দেওয়া হইবে। সুতরাং সে স্থির করিল, বাধা দিয়া কাজ নাই।

এক্ষণে আবদুল কাদেরকে সংবাদ দেওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া আবদুল্লাহ্ তাড়াতাড়ি আপিসের দিকে চলিল। পথেই আবদুল কাদেরের সহিত তাহার দেখা হইল। খোদা নেওয়াজ তাহাকে আগে খবর দিয়া পরে নৌকা ঠিক করিতে গিয়াছিল।

আবদুল কাদের ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আব্বা নাকি সকলকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন?"

"কেবল সালেহাকে।"

"তাকে তুমি নিয়ে যেতে দেবে ?"

"তা যাক্ না সে, সে তো কোন কাজেই লাগছে না। আর ছোট তরফের ভাইজানকেও চিঠি লিখেছি ; তিনিও হয় তো এসে প'ড়বেন—নেওয়াজ-ভাইকেও ব'লে দেব'খন তাঁকে শিগ্‌গির পাঠিয়ে দিতে। তোমার আর এখন বাসায় গিয়ে কাজ নেই—অনর্থক একটা বকাবকি মন কষাকষি হবে। উনি যে যাচ্ছেন, এটা খোদার তরফ থেকেই হচ্চে : থাকলে কেবল হাঙ্গামা কর্তেন বই নয়।"

আবদুল্লার পরামর্শ মত আবদুল কাদের আবার আপিসে চলিয়া গেল। খোদা নেওয়াজ নৌকা ঠিক্ করিয়া আসিল। বৈকালেই সৈয়দ সাহেব সালেহাকে লইয়া রওয়ানা হইলেন। যাইবার সময় আবদুল্লার মাতা আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু আবদুল্লাহ্ তাঁহাকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিয়াছিল। সুফী সাহেব রহিয়া গেলেন।

ঠিক সন্ধ্যার সময় আবদুল খালেক আসিয়া পৌছিলেন। সঙ্গে স্ত্রী রাবিয়া, পুত্র এবং মালেকা, এলেম মামা এবং একজন চাকর।

২৬

রাবিয়া আসিয়া যখন হালিমার শুশ্রূষার ভার লইল, তখন সে বেচারীর দুঃখ ঘুচিল। আবদুল্লার মাতাও রান্নাঘর হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন—রাবিয়ার মামা সেখানে তাঁহার স্থান গ্রহণ করিল।

ডাক্তার বাবু এক্ষণে প্রত্যক্ষ আসিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে এখনও নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। ফুস্‌ফুসের অবস্থা আর বেশী খারাপ হয় নাই ; খুব সম্ভব একুশ দিনে জ্বর ছাড়িতে পারে। কিন্তু সেই দিনটাই সঙ্কটের দিন। যদি ভালয় ভালয় কাটিয়া যায় তবেই রক্ষা। ক্রমে কয়েকদিনের মধ্যে ডাক্তার বাবু আরও দুইবার ইঞ্জেকশন দিলেন।

আবদুল খালেক দুই দিন পরেই চলিয়া গেলেন—বাড়ীতে কেহই নাই, একজন না থাকিলে সেখানকার কাজ-কর্ম নষ্ট হইয়া যাইবে। যাইবার সময় বার বার করিয়া বলিয়া গেলেন, যেন

প্রত্যহ পত্র লেখা হয় এবং সময় পাইলেই সত্বর অন্ততঃ একদিনের জন্যও একবার আসিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

আবদুল্লাহ্ বা আবদুল কাদের কাহাকেও আর এখন রোগীনীর শুশ্রূষা সম্বন্ধে কিছুই দেখিতে হয় না। তাহারা ঔষধাদি আনিয়া দিয়া এবং ডাক্তার বাবুর আদেশগুলি শুনাইয়া খালাস। রাবিয়া ও মালেকা পালা করিয়া রাত্রি জাগে! আবদুল্লাহ্ একবার রাত্রি জাগরণের ভার লইতে চাহিয়াছিল ; কিন্তু রাবিয়া তাহাকে আমল দেয় নাই। বলিয়াছিল—"মেয়ে মানুষের শুশ্রূষা কি পুরুষ মানুষ দিয়ে হয়?"

একুশ দিনের দিন ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"আজ বড় সাবধানে থাকতে হবে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় খবর দিবেন। রাত্রে আমার এইখানেই থাকা দরকার হ'তে পারে।"

বৈকালের দিকে একটু একটু ঘাম দিয়া জ্বর কমিতে আরম্ভ করিল। সন্ধ্যার পর দেখা গেল, জ্বর ১০০° ডিগ্রীর নীচে নামিয়াছে। ডাক্তার বাবুকে খবর দেওয়া হইল। তিনি তাড়াতাড়ি আহারাদি সারিয়া ব্যাগ হাতে করিয়া আসিলেন এবং একবার হালিমার অবস্থা নিজে দেখিতে চাহিলেন। গিয়া দেখিলেন, হাত পা বেশ একটু ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। জ্বর আরও কমিয়াছে এবং বেশ একটু ঘামও হইতেছে। কহিলেন,—"একটু পরেই জ্বর একেবারে ত্যাগ হইবে ; কিন্তু যদি টেম্পারেচার বেশী নামে, তবেই বিপদ। দেখা যাক, কি হয়। যদি বেশী ঘাম হয়, তবে তৎক্ষণাৎ আমাকে ডাকবেন।"

সে রাত্রে আর কাহারও ঘুম হইল না। দারুণ উৎকণ্ঠায় সকলে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় একটার সময় হালিমার অত্যন্ত ঘাম হইতে লাগিল এবং শরীর এলাইয়া পড়িল। ডাক্তার বাবুকে ডাকা হইল। তিনি কহিলেন,—"যা ভেবেছিলাম—কিন্তু ভয় নেই, ও ঠিক হ'য়ে যাবে খন। আর একটা ইঞ্জেকশন্ দিতে হবে।"

নূতন একটা ইঞ্জেকশন্ দেওয়া হইল! কিছুক্ষণ পরে রোগীর অবস্থা একটু ফিরিল, শরীরের উত্তাপ বাড়িল, হাত পা বেশ গরম হইয়া উঠিল, ঘাম বন্ধ হইল। সকলের মনে আশা হইল, এ যাত্রা হালিমা বাঁচিয়া যাইবে।

কিন্তু শেষ রাত্রের দিকে আবার ঘাম ছুটিল। ডাক্তার বাবু আবার ইঞ্জেকশন্ দিলেন। ব্যাগ হইতে একটা তীব্র ঔষধ বাহির করিয়া একটু খাওয়াইয়াও দিলেন এবং কহিলেন,—"ওঁকে এখন চুপ করে পড়ে থাকতে দিন, যদি একটু ঘুম হয়। আর ভয় নেই, হার্টের অবস্থা ভাল।"

যাহা হউক, উদ্বেগ দুর্ভাবনায় রাত্রিটা এক রকম কাটিয়া গেল। ভোরের দিকে হালিমার বেশ গাঢ় নিদ্রা হইল। ডাক্তার বাবু কহিলেন, "আর কোন ভয় নেই, এ যাত্রা উনি রক্ষা পেয়ে গেলেন। এখন ওঁর সেবা শুশ্রূষার দিকেই একটু বেশী নজর রাখতে হবে।"

পরদিন হইতে হালিমার অবস্থা ভালই দেখা যাইতে লাগিল। কিন্তু শরীর এত দুর্বল যে কথা কহিতে কষ্ট হয়। কাসিও একটু রহিয়া গেল। ডাক্তার বাবু বলকারক ঔষধের এবং দু'বেলা মুরগীর শুরুয়ার ব্যবস্থা করিলেন। রাবিয়া এবং মালেকার সযত্ন ও সস্নেহ শুশ্রূষায় হালিমা দেখিতে দেখিতে সুস্থ হইয়া উঠিল। আগের দিন ডাক্তার বাবু তাহাকে অন্ন-পথ্য করিবার অনুমতি দিলেন।

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"ডাক্তার বাবু, কাল আমাদের ঈদ,বড়ই আনন্দের দিন। তার উপর আমার বোনটি ঈশ্বরেচ্ছায় আর আপনার চিকিৎসার গুণে বেঁচে উঠেছে, কাজেই আমাদের পক্ষে ডবল আনন্দ যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে,তবে......"

"তবে কি ?"

"আপনাকে নেমন্তন্ন কত্তে চাই।"

ডাক্তার বাবু অতি মাত্রায় খুশীতে বলিয়া উঠিলেন,—"বাঃ! তা হ'লে ত দেখছি ত্রে-ডবল আনন্দ।

আবদুল্লাহ্ একটু দ্বিধার সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—"খেতে আপনার আপত্তি নাই ত'?"

"কিছু নাঃ! আমার ওসব প্রেজুডিস্ নেই, বিশেষ করে আপনাদের ঘরের পোলাও-কোর্মা, কোফ্‌তা-কাবাব—এইসবের কথা মনে উঠলে সব প্রেজুডিস গগার পার হয়ে যায়!"

আবদুল্লাহ্ আহ্লাদিত হইয়া কহিল,—"তবে কাল দুপর বেলা আমাদের এখানে চাট্টি নুন-ভাত খাবেন......"

ডাক্তার বাবু যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, "নুন-ভাত ? সে কি মশায়! আপনাদের বাড়ী শেষটা নুন ভাত খেয়েই জাতটা খোয়াব ?"

আবদুল্লাহ্ হাসিয়া কহিল,—"তা খোয়ালেন যখন, তখন না হয় গরীবের বাড়ির নুন ভাত খেয়েই এবার খোয়ান।"

"না, না, সে সব হবে না, 'মুরগী-মুসাল্লাম চাহিয়ে।' একবার যা খেয়েছিলাম মশায়......" বলিয়া ডাক্তার বাবু কবে কোন মুসলমান বাড়ীতে কি কি খাইয়েছিলেন তাহার ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে রায় দিয়া ফেলিলেন, "মাংসটা আপনাদের ঘরে খাসা রান্না হয়—অমন আমাদের ঘরে হয় না।"

এমন সময় পাশের বাড়ীতে একটা চীৎকার, ছুটাছুটি, গোলমাল শুনা গেল। ব্যাপার কি, জানিবার জন্য সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়া বৈঠকখানা হইতে নামিয়া বাহিরে আসিলেন। ডাক্তার বাবুর বাসাটি হাসপাতালের হাতার এক প্রান্তে অবস্থিত। হাতার বাহিরে ছোট একটি বাগান তাহার পর জনৈক উকীলের বাসাবাটি। সেইখানেই গোলমাল হইতেছিল। একজন চাকর "হেই হেই দূর দূর" রবে চীৎকার করিতে করিতে বাগানের দিকে ছুটিয়া আসিল। ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটা ঝি এবং তাহার পশ্চাতে ছোট ছোট কয়েকটা ছেলে মেয়ে ঢিল হাতে দৌড়াইয়া আসিতেছে। একটা মুরগী "কট্‌কট্-কটাআপ" রবে ক্রন্দন করিতে করিতে তাহাদের সম্মুখে উড়িয়া হাসপাতালের হাতার মধ্যে আসিয়া পড়িল। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হয়েছে রে রামা ?"

রামা নামক চাকরটি হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল,—"হবে আর কি বাবু, মুরগী ঢু'কেছে বাড়ীতে......"

"তারই জন্যে এত চেঁচামেচি ? আমি বলি বুঝি বা ডাকাত প'ড়েছে!"

ঝি কহিল,—"বাঃ, রান্নাঘরের দোরে গে' উঠল যে! ভাত তরকারী সব গেল! বাবুর কাছারী যাবার সময় হ'ল, কখন আবার রাঁধবে ? না খেয়েই বাবুকে কাছারী যেতে হবে। আর তাও বলি, আপনিই বা কেমন ধারা মানুষ বাপু, বাড়ীতে মুরগী পুষেছে, তা কিছু বলচো না! আমাদের বাবু কত বকাবকি করে..."

আবদুল্লাহ তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর গিয়া মামাটার উপর তম্বি করিতে লাগিল। "এত ক'রে বলি, এ হিন্দুপাড়া মুরগীগুলো বেঁধে রাখতে, তা কেউ সে কথা কানে করে না......"

মামা কহিল,—"বাঁধাই তো ছিল ঠ্যাঙ্গে দড়ি দে'। কন্নে দে যে খুলে পালায়ে গেছে তা ঠাওর কত্তি পারিনি।"

"তা নেও, এখন ওটাকে ধ'রে ভাল ক'রে বেঁধে রাখ। আমাদের জন্যে ডাক্তার বাবুকে পর্যন্ত কথা শুনতে হ'চ্চে। ভদ্দর লোক মনে ক'রবে কি ?"

বাহিরে আসিয়া আবদুল্লাহ্ বলিল,—"ডাক্তার বাবু আপনাকে তো অনেক কষ্ট দিলেমই, তার উপর আমাদের জন্যে আপনাকে অপদস্থ পর্যন্ত......"

"আরে রামঃ! ওসব কথা কি গ্রাহ্য কত্তে আছে ? আপনি বুঝি ভেবেছেন এ বাড়ীতে মুরগীর চাষ এই প্রথম? তা নয় ; আমারই এক পাল মুরগী ছিল। এদ্দিন ওরা কিছু বলতে সাহস করে নি—এখন আপনারা র'য়েছেন কিনা, তাই একবার ঝালটা ঝেড়ে নিলে। আচ্ছা আমি এটা বুঝতে পারিনে, কাক ঢুকলে হাঁড়ি মারা যায় না, মুরগী ঢুকলে যায় কেমন ক'রে ? কাকে তো খায় না এমন ময়লাই নেই!"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"মুরগী যে আপনাদের সাংঘাতিক রকম অ-খাদ্য..."

"গোমাংসের চেয়েও ?"

"তা না হতে পারে, কিন্তু অপবিত্র তো বটে!"

আর কাকটা বুঝি ভারী পবিত্র হ'ল? ওসব কোন কথাই নয়। আমার মনে হয়, এর মূলে একটা বিদ্বেষের ভাব আছে। তা মরুক গে' যাক—অপবিত্র হোক্ আর অখাদ্যই হোক্, কাল কিন্তু ওটা চাই, নইলে সহজে জাত খোয়াচ্ছি না......"

এই বলিয়া ডাক্তার বাবু হাসিতে হাসিতে বিদায় লইলেন।

বৈকাল হইতেই রাবিয়ার পুত্র আবদুস্ সামাদ চাঁদ দেখিবার জন্য নদীর ধারে গিয়া দাঁড়াইল। কাছারীর ফেরতা পিয়াদা-চাপরাসীরাও নদীর ধার দিয়া আকাশের দিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছেন। সন্ধ্যার একটু পূর্বেই ঈদের ক্ষীণ চন্দ্র-লেখা পশ্চিম আকাশের গায়ে ফুটিয়া উঠিল। দেখিতে পাইয়াই সামু ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া সকলকে ডাকিয়া কহিতে লাগিল, "আম্মা, চাঁদ উঠেছে, ঐ দেখুন!"

"কই? কই?" বলিতে বলিতে সকলে বাহিরে আসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া চাঁদ খুঁজিতে লাগিলেন। হালিমাও রাবিয়ার কাঁধে ভর করিয়া আস্তে আস্তে বাহিরে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিল।

রাবিয়া প্রথমেই দেখিতে পাইল এবং ফুফু-আম্মাকে দেখাইবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল। চাঁদ এত ক্ষীণ যে কিছুতেই তাঁহার নজরে আসিল না। অবশেষে তিনি দুঃখিত চিত্তে কহিলেন,—"আর মা! সে চোখ কি আর আছে, যে দেখতে পাব ? তোমরা দেখেছ, তাইতে আমার হ'য়েছে।"

অতঃপর যে যাহার গুরুজনের 'কদমবুসি' করিল। আবদুল্লাহ্ এবং আবদুল কাদেরও বাড়ীর ভিতরে আসিয়া মুরুব্বিগণের 'কদমবুসি' করিয়া গেল। আবদুল্লার মাতা সকলকে দো'য়া করিতে লাগিলেন,—'খোদা চিরদিন তোমাদের ঈদ মোবারক করুন!"

হালিমা 'কদমবুসি' করিতে আসিলে মাতা গদগদ কণ্ঠে কহিলেন,—"থাক্ থাক্, ব্যারাম নিয়ে আর সালাম করিস্‌নে। এ ঈদে যে তুই আবার সালাম করবি, এ ভরসা ছিল না মা! শোকর তোর দরগায় খোদা!" এই বলিয়া তিনি অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

সন্ধ্যার পরেই আকবর আলী সাহেব আসিয়া কহিলেন,—"সাব-রেজিস্ট্রার সাহেব, কাল নামাযে ইমামতি কত্তে হবে আপনাকে।"

আবদুল কাদের জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন, আপনাদের সে মৌলবী সাহেব কোথায় গেলেন!"

আকবর আলী কহিলেন,—"তিনি তো সেদিনকার সেই গোলমালের পর থেকে আর এ-মুখো হন নি! সৈয়দ সাহেব সে দিন বেচারাকে সক্কলের সাম্‌নে যে অপমানটা করলেন, অমন কোন ভদ্রলোক করে না। বেচারার বড্ড চোট লেগেছে!

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"আহা লাগবারই কথা! আমার শ্বশুরের ওটা ভারি অন্যায় হ'য়ে গেছে। তিনি মস্ত বড় শরীফ, এই অহঙ্কারেই তিনি একেবারে অন্ধ।"

আকবর আলী কহিলেন,—"সে মৌলবী সাহেবকে তো আর পাওয়া যাবে না ; এখন আপনাদের একজনকে ইমামতি কত্তে হচ্ছে। আপনার ওয়ালেদ সাহেবই যখন তাঁকে তাড়িয়েছেন, তখন আপনারই উচিত ক্ষতিপূরণ করা, সাবরেজিষ্টার সাহেব।"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"ক্ষতিপূরণ ও ভাবে কল্লে তো হবে না—সেই মৌলবী সাহেবকে ডেকে যদি আমরা সকলে তাঁর পিছনে নামায পড়ি, তবে কিছুটা হয় বটে।"

আবদুল কাদের জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি থাকেন কোথায় ?"

আকবর আলী কহিলেন,—"বেশী দূর নয়, ওপারে নিকারিপাড়ায়।"

"তবে তাঁকে খবর দিন না, কাল ঈদের নামাযে ইমামতি কত্তে।"

"আমি গত জুমায় তাঁর কাছে লোক পাঠিয়েছিলাম, তা তিনি আস্‌লেন না।"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"তবে এক কাজ করি না কেন ? আমরা নিজেরা গিয়ে তাঁকে অনুরোধ ক'রে আসি......"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"দোষ কি ? কয়েকজন একসঙ্গে দু-তিনটে হেরিকেন নিয়ে যাব 'খন।"

আকবর আলী কহিলেন,—"নিতান্তই যদি যেতে চান্, তবে আমি কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান। কিন্তু একথা সৈয়দ সাহেব জানতে পারলে আপনাদের আর আস্ত রাখবেন না......"

আবদুল্লাহ্ বাধা দিয়া কহিল,—"কি ক'রবেন আমাদের ? ওঁর ও ফাঁকা আওয়াজের আমরা আর বড় তোআক্কা রাখি নে।"

সেই রাত্রেই আবদুল্লাহ্ এবং আবদুল কাদের ওপারে নিকারি-পাড়ায় গিয়া উপস্থিত হইল। মৌলবী সাহেব যে বাড়ীতে ছিলেন, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে বেশী বেগ পাইতে হইল না! তাহারা ঘরে উঠিয়া সালাম-সম্ভাষণ করিতেই মৌলবী সাহেব যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! বলিয়া উঠিলেন, "একি আপনারা! এখানে!......"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"জি হ্যাঁ, আমরাই, আপনারই কাছে এসেছি।"

মৌলবী সাহেব কহিলেন,—"আপনাদের মত লোকের আমার কাছে আসাটা একটু তাজ্জবের কথা বটে। কি মনে ক'রে আপনাদের আসা হ'য়েছে?"

"কাল ঈদের নামায পড়াবার জন্যে আপনাকে বরিহাটি যেতে হবে।"

মৌলবী সাহেব আশ্চর্য হইয়া কহিলেন,—"আমাকে পড়াতে হবে ? আবার ?"

"সে কথা মনে করে আর কষ্ট ক'রবেন না, মৌলবী সাহেব। যা হবার তা হ'য়ে গেছে। বুড়ো মানুষ—শরাফতের গুমোর ওঁদের হাড়ে মাংসে জড়িয়ে আছে—ওঁর কথা ছেড়ে দিন। আমরা আছি—ওঁর মেজ ছেলে এই সাবরেজিষ্টার সাহেবও আছেন—আমরাই আপনাকে অনুরোধ কচ্ছি, মেহেরবানি করে এসে আমাদের জমাতে ইমামতি করুন।"

মৌলবী সাহেব চুপ করিয়া রহিলেন। আবদুল্লাহ্ আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বলেন, মৌলবী সাহেব ?"

মৌলবী সাহেব হাত দুটি জোড় করিয়া কহিলেন,—"আমাকে মাফ করুন। আমরা ছোটলোক হ'লেও একটা মান-অপমান জ্ঞান তো আছে ? ধরুন, আপনাকেই যদি কেউ কোন খানে অপমান করে, সেখানে কি আর আপনার যেতে ইচ্ছা করবে ? তার উপর এরা আবার আমাকে যত্ন ক'রে রেখেছে—এদের ফেলে তো যাওয়া যেতেই পারে না।"

এ কথার কি জবাব দেওয়া যায় ? অথচ এ-বেচারার উপর যে অত্যাচারটা হইয়া গিয়াছে, তাহার একটা প্রতিকার করিবার জন্য আবদুল্লাহ্ উদ্বিগ্ন হইয়া রহিয়াছে। সে ভাবিতে লাগিল।

হঠাৎ আবদুল্লার মাথায় একটা খেয়াল আসিল। সে বলিয়া উঠিল, "তবে আমরাই আসব আপনাদের সঙ্গে নামায প'ড়তে......"

মৌলবী সাহেব যেন একটু সঙ্কোচের সহিত কহিলেন,—"আপনারা অতদূর আস্‌বেন কষ্ট করে......"

"কষ্ট আর কি, মৌলবী সাহেব এই রাত্রে যখন আস্‌তে পেরেছি, তখন দিনে এর চেয়েও সহজে আস্‌তে পারব। কি বল, আবদুল কাদের?"

আবদুল কাদের কহিল,—"তা তো বটেই! আমরা ঠিক্ আসব।" মৌলবী সাহেব একটু আমতা আমতা করিয়া "তা—তবে—" ইত্যাদি কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন! আবদুল্লাহ্ বাধা দিয়া কহিল,—"আপনি মনে কিছু দ্বিধা ক'রবেন না, মৌলবী সাহেব। আমাদের কোন কু-মতলব নেই। সরল ভাবেই বলছি, আপনি একজন আলেম লোক ব'লে আমরা আপনাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করি—আপনার পিছনে নামায পড়া আমরা গৌরবের কথা ব'লেই মনে ক'রব।"

মৌলবী সাহেব যাহার বাড়ীতে ছিলেন, সে লোকটা নিকারিদের মোড়ল। সেও সেখানে উপস্থিত ছিল। সে বলিল,—"বেশ তো আপনারা যেতি আমাগোর সাতে নামায পড়তি আসেন, সে তো ভালো কতা।"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"কেন আসবো না? আমরা সব্বাই মুসলমান, ভাই ভাই! যত বেশী ভাই মিলে একসঙ্গে নামায পড়া যায়, ততই সওয়াব বেশী হয়। ঈদের নামায যেখানে বড় জমাত হয়, সেইখানেই গিয়ে পড়া উচিত—কি বলেন, মৌলবী সাহেব?"

মৌলবী সাহেব কহিলেন,—"সে তো ঠিক কথা!"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"ওপারে জমাত ছোট হয়। কজনই বা লোক আছে বরিহাটিতে! আমি চেষ্টা ক'রব যাতে ওখানকার সকলেও এপারে এসে নামায পড়েন।"

এ প্রস্তাবে সকলেই খুশী হইয়া উঠিলে মোড়ল কহিল,—"আমাগোর হ্যাপারে যে জোমাত হয়, মান্‌ষির মাথা গুণে শ্যাষ করা যায় না। এই গেরদের বিশ তিরিশ হান্ গেরামের লোক আসে আমাগোর ঈদ্‌গায় নোমাজ পড়তি। মাঠ-হান্‌ও পেল্লায়—বহৃত লোক বসতি পারে। এত বড় ঈদ্‌গা এ গেরদের মদ্দি নেই!"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"আপনার কাছে আরও একটা অনুরোধ আছে মৌলবী সাহেব। নামায পড়তে যাবার অনুরোধ তো রাখলেন না; তার বদলে আমরাই আস্‌ছি। কিন্তু এ অনুরোধটা রাখতেই হবে।"

মৌলবী সাহেব কুণ্ঠিতভাবে কহিলেন,—"আমাকে এমন ক'রে ব'লে কেন লজ্জা দিচ্ছেন আপনারা......"

"না, না, ওরকম কেন কচ্ছেন আপনি! আমার অনুরোধ এই যে, কাল দুপুর বেলা আমাদের বাসায় আপনাকে দা'ওত কবুল কত্তে হবে।"

মৌলবী সাহেব মোড়লের মুখের দিকে চাহিলেন। মোড়ল কহিল,—"তা ক্যামন ক'রে হবে, মেয়া সাহেব, ঈদির দিন আমারগোর বাড়ী না খালি হবি ক্যান্?"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"তা উনি রাত্রে এখানে খাবেন 'খন। উনি তো কেবল আপনাদেরই মৌলবী সাহেব নন, আমাদেরও মৌলবী সাহেব। আমরাও ওঁকে একবেলা খাওয়াব।"

মোড়ল কহিল,—"না, ঈদির দিন ওনারে আমরা যাতি দি ক্যাম্বায়? আপনারা ওনারে পাছে খাওয়াবেন।"

"আমরা যে দুই একদিনের মধ্যে চ'লে যাচ্ছি মোড়ল সাহেব। কাল ছাড়া আর আমাদের দিনই নেই।"

কাজেই মোড়ল সাহেবকে হাল ছাড়িতে হইল। স্থির হইল যে, কাল নামায বাদ মৌলবী সাহেব ওখানে খাইতে যাইবেন, কিন্তু রাত্রে উহাদিগকে মোড়ল-বাড়ীর দা'ওত কবুল করিতে হইবে। অবশ্য কাল দ্বিপ্রহরে মোড়ল স্বয়ং গিয়া রীতিমত দা'ওত করিয়া আসিবে! আবদুল্লাহ্ রাজী হইয়া গেল।

রাত্রে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া আবদুল্লাহ্ দেখিল, আবদুল খালেক আসিয়াছেন। তিনি কাজের ঝঞ্ঝাটে অনেক চেষ্টা করিয়াও এ কয়দিন আসিতে পারেন নাই বলিয়া কৈফিয়ৎ দিলেন। কিন্তু সে সকল কৈফিয়তে কান দিবার মত মনের স্থিরতা আবদুল্লার ছিল না। শ্বশুরকর্তৃক অপমানিত মৌলবীটিকে লইয়া কাল যে ব্যাপার ঘটাইতে হইবে, তাহারই ভাবনায় উন্মনা হইয়াছিল। সে আবদুল খালেককে সকল কথা খুলিয়া বলিল। তিনিও অনুমোদন করিলেন দেখিয়া আবদুল্লাহ্ বড়ই খুশী হইয়া গেল।

পরদিন ভোরে উঠিয়াই আবদুল্লাহ্ আকবর আলী সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া ওপারে নামায পড়িতে যাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিল; কিন্তু আকবর আলী তাহাতে রাজী হইতে পারিলেন না। কহিলেন, যখন তাঁহারই চেষ্টায় ইহারা সকলে একটা জুমা-ঘর প্রস্তুত করিয়াছে এবং কয় বৎসর ধরিয়া এখানে রীতিমত নামায হইয়া আসিতেছে, তখন এ স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র

নামায পড়িতে যাওয়া কর্তব্য হইবে না। বিশেষতঃ একবার নামায বাদ পড়িলে ভবিষ্যতে ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটিতে পারে।

অগত্যা আবদুল্লাহ্ স্থির করিল ; কেবল তাহারাই কয়-জন ওপারে যাইবে। আকবর আলী নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু সে কহিল, যখন কথা দিয়া আসা হইয়াছে, তখন যাইতেই হইবে।

২৭

বেলা দেড় প্রহর হইতে না হইতেই আবদুল্লারা নিকারিপাড়ায় ঈদগাহে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন ঈদগাহ্ প্রায় ভরিয়া উঠিয়াছে। নিকটবর্তী বহুগ্রাম হইতে লোক এইখানে ঈদ-বক্‌রীদের নামায পড়িতে আসে, প্রায় ছয় সাত শত লোকের জমাত হইয়া থাকে।

তাহারা আসিতেই সকলে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল এবং তাহাদের সালাম-সম্ভাষণের যুগপৎ প্রতিসম্ভাষণে একটা সমুচ্চ গুঞ্জন উপস্থিত হইল। সকলেই বসিয়াছিল—কেহ বা মাদুর, কেহ বা ছোট জায়-নামায বা শতরঞ্চ পাতিয়া কেহ বা রঙ্গিন রুমাল ঘাসের উপর বিছাইয়া স্থান করিয়া লইয়াছিল। মৌলবী সাহেব গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর লোকসহ ভিড়ের মধ্যে নড়িয়া চড়িয়া, যে দুই একজন লোক তখনও আসিতেছিল, তাহাদিগকে বসাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। তিনি একটু অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "তশরীফ লাইয়ে, হুযুর! আপনাদের দেরি দেখে ভাবছিলাম, বুঝি আর আসা হ'ল না।"

আবদুল্লাহ্ কহিল, "না, না, মৌলবী সাহেব ; না আস্‌বার তো কোন কারণই নেই। ওখান থেকে সবাইকে আনবার জন্যে চেষ্টা কচ্ছিলাম কিনা, তাই একটু দেরী হয়ে গেল।"

"আর কেউ কি আস্‌বেন ?"

"না, তাঁরা বলেন, এখানকার জুমাঘরে বরাবর নামায হয়ে আস্‌চে, কাজেই সেটা বন্ধ করা ভাল দেখায় না।"

মৌলবী সাহেব কহিলেন,—"তবে আর দেরী করে কাজ কি ?"

জমাতের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "নামায শুরু হ'য়ে যাক্—রোদ্ তেতে উঠল!"

আর এক ব্যক্তি দূর প্রান্ত হইতে কহিল,—"এট্টু দেরেঙ্গ করেন আপনারা ঐ যে আরও কজন মুসল্লি আস্‌তিছেন।"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"ঈদগাহটি এঁরা বেশ সুন্দর জায়গায় ক'রেছেন কিন্তু! চারদিকে বড় বড় গাছ, সবটা ছায়াতে ঢেকে পড়েছে। আরামে নামায পড়া যাবে 'খন।"

মৌলবী সাহেব কহিলেন,—"কিন্তু দেরী হ'য়ে গেলে আর আরাম থাক্‌বে না। ইমামের মাথার উপরেই রোদ্ লাগবে আগে!"

আবদুল্লাহ্ এবার হাসিয়া কহিল,—"সেই জন্যেই বুঝি আপনি তাড়াতাড়ি কচ্ছেন ?"

মৌলবী সাহেব কহিলেন,—"তাও বটে, আর ঈদের নামাযে বেশী দেরী করা জায়েজ নয়, সে জন্যেও বটে।"

এদিকে গ্রামের মোড়ল আর এক জন মুসল্লি সঙ্গে লইয়া, দুইজনে একখানা বড় রুমালের দুই প্রান্ত ধরিয়া প্রত্যেকের নিকট হইতে ফেৎরার পয়সা আদায় করিতে আরম্ভ করিল। সেই মুসল্লিটি কহিতে লাগিল "ফেৎরার পয়সা দেন, মে' সাহেবেরা! শোনে দু'সের গমের দাম চোদ্দ পয়সা। ছোট বড় কারো মাফ নেই। ছোট বড়, আওরত মরদ সক্কলকার জন্যি ফেৎরা দেওয়া ওয়াজেব! হর্ হর্ বাড়ীর মালিক জনে জনে হিসেব ক'রে দেবেন! যে যে না দিলে রোজার পুরা সওয়াব মেলে না!"

রুমাল ঘুরিয়া চলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝনঝন্ পয়সা পড়িতে লাগিল। কেহ কহিল,—"এই নেন আমার পাঁচ জোনের ফেৎরা এক ট্যাহা ছয় পয়সা ; কেহ—"আমি একলা মানুষ" বলিয়া

সাড়ে তিন আনা পয়সা ফেলিয়া দিল ; কেহ বা কহিল,—"আমি বড় গরীব, মেয়া সাহেব! খোদায় মাফ করবি!"

ক্রমে টাকা পয়সা সিকি দু'য়ানিতে ভরিয়া রুমালখানি দারুণ ভারী হইয়া উঠিল। তখন সেখানি বেশ করিয়া বাঁধিয়া মেম্বারের পার্শ্বে রাখিয়া দিয়া আর একখানি রুমাল আনা হইল। এইরূপে তিন চারি খানি রুমাল ভরিয়া ফেৎরো আদায় করা হইয়া গেলে মৌলবী সাহেব নামাযে খাড়া হইলেন। তখন ঈদগাহের পশ্চিম প্রান্ত রৌদ্রে ভরিয়া গেলেও মেম্বর প্রান্তস্থিত ভরা রুমালগুলি তাঁহাকে সূর্য-তাপ অনুভব করিবার অবসর দিল না।

সকলে উঠিয়া কেবলামুখী হইয়া দাঁড়াইল। মৌলবী সাহেব চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"কাতার ঠিক ক'রে দাঁড়াবেন, মিয়া সাহেবরা! পায়ের দিকে চেয়ে দেখবেন।"

অমনি সকলে পার্শ্ববর্তীগণের পায়ের দিকে দেখিয়া নড়িয়া চড়িয়া কাতার সোজা করিয়া লইল। নামায শুরু হইল।

নিয়ত করা হইয়া গেলে মৌলবী সাহেব সমুচ্চকণ্ঠে চারবার তক্‌বির উচ্চারণ করিলেন। অতঃপর সকলে তহ্‌রিমা বাঁধিয়া নতমস্তকে দাঁড়াইয়া ইমামের সুরা পাঠ শ্রবণ করিতে লাগিল। ইমাম সাহেব বড়ই সুকণ্ঠ ; প্রান্তর মুখরিত করিয়া তাঁহার কেরাত নামাযীগণের হৃদয়ে যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সুরা-পাঠ শেষ হইলে আবার গম্ভীর রবে তক্‌বির উচ্চারিত হইয়া অমনি সকলে যুগপৎ অর্ধাবনমিত দেহে রুকু করিল—সুশিক্ষিত সেনাদল যেমন নায়কের ইঙ্গিত মাত্রে যন্ত্রচালিতের ন্যায় একযোগে আদেশ-পালনে তৎপর হয়, তেমনই তৎপরতার সহিত সকলে একযোগে রুকুতে অবনত হইল। আবার তক্‌বির উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তেমনই সকলে একযোগে দণ্ডায়মান হইল এবং একযোগে ভূতলে জানু পাতিয়া ভূপৃষ্ঠ-মস্তকে সেজ্‌দা করিল। আল্লাহ্ যেমন এক তেমনি নামায-রত জনসঙ্ঘেরও যেন একই প্রাণ, একই দেহ!

দুই রেকাত নামায দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া গেল ; ইমামের সালাম পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সকলে দক্ষিণে ও বামে মস্তক হেলাইয়া সমগ্র মোস্‌লেম জগতের প্রতি মঙ্গল-আশীর্বাদ বর্ষণ করিল।

তাহার পর ইমাম মুনাজাত করিলেন এবং সকলে দুইহাত তুলিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিল। মুনাজাত হইয়া গেলে তিনি দণ্ডায়মান হইয়া আরবী কেতাব হাতে লইয়া খোৎবা পড়িতে লাগিলেন। যদিও তাহার এক বর্ণও কাহারো বোধগম্য হইল না, তথাপি সকলে ধর্মবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া গভীর মনোযোগের সহিত খোৎবা শ্রবণ করিতে লাগিল।

খোৎবার পর আবার মুনাজাত হইল। তাহার পর আলিঙ্গনের পালা। প্রত্যেকে একবার ইমামের সহিত এবং আর একবার পরস্পরের সহিত কোলাকুলি করিবার জন্য ব্যগ্রতা দেখাইতে লাগিল। যেন সকলেই ভাই ভাই, এক প্রাণ, এক আত্মা! একতার এমন নিদর্শন আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না ; কার্যক্ষেত্রে এমন নিদর্শনের এমনব্যর্থতাও আর সমাজে ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ!

ঈদের নামায খতম হইল, যে যাহার ঘরে চলিল। মৌলবী সাহেবের রুমালে-বাঁধা টাকা পয়সার মোটগুলি মোড়লের হাতে ঘরে চলিল। মৌলবী সাহেব তাহার সহিত ঘরে গিয়া সেখানে গণিয়া বাকস বন্দী করিয়া আসিলেন এবং আবদুল্লাদের সঙ্গে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিলেন।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় বাসায় পৌছিয়া যে-যাহার মুরুব্বিগণের 'কদমবুসি' করিল। মুরুব্বিরাও সকলকে প্রাণ ভরিয়া দো'য়া করিতে লাগিলেন।

তাহার পর আহারের পালা। ডাক্তার বাবুকে ডাকিয়া আনিবার জন্য সামুকে পাঠান হইল। একটু পরেই ডাক্তার বাবু হস্পিটাল এসিষ্ট্যান্ট বাবুকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। কহিলেন,—"একে ধ'রে নিয়ে এলাম। একা একাই জাতটা খুইয়ে লেজকাটা শেয়াল হব ? আরও যতগুলার পারি লেজ কেটে দি!"

আবদুল্লাহ্ সবিনয়ে কহিল,—"বড়ই সুখের বিষয় যে, আপনি এসেছেন। আপনার প্রেজুডিস নেই তা তো জানিনে, কাজেই বল্‌তে সাহস করিনি।"

ডাক্তার বাবু কহিলেন,—"আরে এর আর বলাবলি কি? যারা মুর্গি-মাটনের স্বাদ একবার পেয়েছে, তাদের আর বলতে কইতে হয় না কিছু। কি বল, ভায়া? আর এ আমার নিজের বাড়ী—আমিই তো ওঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছি।"

বৈঠকখানা ঘরে দস্তরখান বিছানো হইল। অন্দর হইতে খাঞ্চা ভরিয়া খানা আসিতে লাগিল এবং আবদুল খালেকের চাকর সলিম রেকাবিগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া দিল। চিলমচি বদ্‌না প্রভৃতি আসিল। মৌলবী সাহেবকে হাত ধুইবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি কহিলেন যে, আর আর সকলের হাত ধোওয়া হইয়া গেলে তিনি ধুইবেন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ছাড়িল না; "আপনি আগে ধোন" "আপনারা আগে ধু'য়ে নেন" ইত্যাদি শিষ্টাচার কলহের পর মৌলবী সাহেবকেই হারিতে হইল—তিনিই সর্বাগ্রে হাত ধুইয়া লইলেন। এমন কি আবদুল্লাহ্ নিজেই তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দিল।

দস্তরখানে লোক বেশী নহে বলিয়া আর স্বতন্ত্র খাদেমের দরকার হইল না। আবদুল খালেক বসিয়া বসিয়াই সকলের রেকাবীতে তাম বখ্‌শ করিয়া পোলাও পৌছাইয়া দিল এবং আবদুল্লাহ্ চামচে করিয়া কাবাব ও কোফ্‌তা বাঁটিতে লাগিল।

সুফী সাহেব আবদুল্লাকে কহিলেন,—"উওহ্ নিমকদানঠো জারা বাঢ়া দিজিয়ে!" আবদুল্লাহ্ তাড়াতাড়ি নিমকদান বাড়াইয়া দিল। তখন প্রত্যেকেই নিমক চাহিলেন; সুতরাং নিমকদানটা এবার সব হাত ঘুরিয়া আসিল।

সুফী সাহেব একবার সকলের মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে জিজ্ঞাসু ভাবে কহিলেন, "বিস্‌মিল্লাহ্?" আবদুল্লাহ্ কহিল, "জি হাঁ, বিস্‌মিল্লাহ্।" খানা শুরু হইল।

সুফী সাহেব লোকটি বেশ ভোজন-বিলাসী। দুই এক লোক্‌মা পোলাও খাইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! বড়া ওমদা খানা পাকা। কাবাব ভি বহোৎ জায়েকাদার হুয়া!"

ডাক্তার বাবু কহিলেন,—"বাস্তবিক, রান্নাটা খাসা হ'য়েছে কিন্তু। আমি অনেক জায়গায় খেয়েছি, কিন্তু এমনটি কোথাও খাইনি।"

সামু খাইতে খাইতে জল চাহিল। সলিম এক গ্লাস জল ঢালিয়া তাহার হাতে দিল। কয়েক চুমুক খাইয়া সামু গেলাসটি দস্তরখানের উপর রাখিল। সুফী সাহেব চটিয়া কহিলেন, "বড়া বে-তামিজ লাড়কা! দস্তরখান পর পানিকা গিলাস রাখ্‌তা হ্যয়।"

আবদুল খালেক কহিল,—"সামু, গেলাসটা তুলে সলিমের হাতে দাও বাবা।"

খানা চলিতে লাগিল। আবদুল্লাহ্ কোর্‌মার পেয়ালাটি বাম হস্তে তুলিয়া আনিয়া কাছে রাখিল এবং বাম হস্তে চামচ ধরিয়া কয়েকজনকে কোর্‌মা তুলিয়া দিয়া, পেয়ালাটি আবদুল কাদেরের দিকে বাড়াইয়া দিয়া কহিল, "দাও তো ভাই ওদিকে......ডাক্তার বাবুদের পাতে বেশী করে দিও।"

দেবনাথ বাবু আপত্তি করিয়া কহিলেন,—"ঢের র'য়েছে যে, কত আর খাব।" কিন্তু বলিতে বলিতেই দুই তিন চামচ করিয়া কোর্‌মা তাঁহাদের পাতে পড়িয়া গেল।

সুফী সাহেব কহিলেন, "লাইয়ে তো পিয়ালা ইধার, নরম্ এক বোটি চুন্ লে।" আবদুল কাদের কোরমার পিয়ালা তাঁহার দিকে বাড়াইয়া দিল। সুফী সাহেব পিয়ালার ভিতর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি ডুবাইয়া দিয়া মাংসের টুক্‌রা টিপিয়া টিপিয়া কয়েকখানি বাছিয়া তুলিয়া লইলেন।

আবদুল্লাহ্ তাড়াতাড়ি সলিমকে ডাকিয়া কানে কানে কহিয়া দিল, "দৌড়ে একটা পেয়ালায় করে কোর্‌মা নিয়ে আয় তো! আর একটা চামচও আনিস্।

সলিম দরজার কাছে গিয়া মামাকে ডাকিয়া কহিতেই সে আর এক পেয়ালা কোর্‌মা চামচসহ আনিয়া দিল। সলিম উহা লইয়া ভিতরে আসিলে আবদুল্লাহ্ তাহাকে কহিল,—"ওটা ডাক্তার বাবুদের সুমুখে রেখে দে।"

কিছুক্ষণ পূর্বে সুফী সাহেব জল খাইয়া গেলাসটি কাছেই রাখিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে আবার জলের আবশ্যক হওয়াতে তিনি গেলাসটি উঠাইয়া সলিমের হাতে দিয়া কহিলেন,—"পানি দেও।"

গেলাসের তলায় সামান্য একটু জল ছিল, সলিম তাহাতেই আবার জল ঢালিয়া দিল! সুফী সাহেব চটিয়া উঠিয়া কহিলেন,—"জুঠা পানিমে পানি ডালতা হায়! ফেঁক দেও উওহ্ পানি।"

সলিম সে জল ফেলিয়া দিয়া আবার এক গ্লাস ঢালিয়া দিল।

সামু আবদুল্লার পাশেই বসিয়াছিল। সে ফিস্ ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ফুফাজান, জুঠা পানিতে পানি ঢাল্‌লেই দোষ, আর ভরা পিয়ালায় জুঠা হাত ডুবালে দোষ হয় না?"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"চুপ, ওকথা এখন থাক্।"

ক্রমে আহার শেষ হইল। তাহার পর হাত ধুইবার পালা। সলিম চিলমচি, বদ্‌না, সাবান, তোয়ালে প্রভৃতি লইয়া আসিল। ডাক্তারবাবুদেরই আগে হাত ধোয়ান হইল। তাঁহারা সাবান দিয়া হাত ধুইলেন। তাহার পর মৌলবী সাহেব, তিনিও সাবান লইলেন। কিন্তু বিলাতী সাবানে হারাম বস্তু থাকা সম্ভব মনে করিয়া সুফী সাহেব তাহা স্পর্শ করিলেন না ; কেবল জল দিয়া মুখ হাত ধুইয়াই,—"খ্যাক থু" করিতে করিতে বেশ করিয়া তোয়ালে দিয়া হাত মুছিয়া ফেলিলেন। হাতের আঙ্গুলে চর্বি ঘি প্রভৃতি জড়াইয়া ছিল, তাহাতে তোয়ালেখানি সুন্দর বাসন্তী রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া গেল! আবদুল্লাহ্ বাড়ীর ভিতর গিয়া তাড়াতাড়ি আর একখানি পরিষ্কার তোয়ালে লইয়া আসিল।

পান আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আবদুল কাদের দশটাকার করিয়া পাঁচখানি নোট আনিয়া দেবনাথ বাবুর সম্মুখে রাখিয়া দিল।

ডাক্তার বাবু একটু আশ্চর্য বোধ করিয়া কহিলেন—"ও কি?"

আবদুল কাদের কহিল,—"আপনার ভিজিট বাবদ আমরা এতদিন কিছু দিতে পারিনি, ডাক্তার বাবু! তা ছাড়া আপনি আরও যে উপকার ক'রেছেন, তার তো কোন মূল্যই হয় না। তবে মেহেরবানি ক'রে যদি এটা অন্ততঃ সামান্য নযর বলে কবুল করেন......"

ডাক্তার বাবু কহিলেন,—"না, না, ওসব আবার কি! আমি তো এখানে ডাক্তার বলে আসিনে, বন্ধু ভাবেই এসেছি। আর আপনারা তো ধত্তে গেলে হস্পিটালেই আছেন—আমার বাড়ীতে জায়গা ছিল, তাই ওয়ার্ডে না রেখে এই খেনেই রেখেছি..."

"তা হোক্ হস্পিটালই হোক্ আর যাই হোক্, আমরা আপনার কাছে যে কতদূর ঋণী তা এক ঈশ্বর জানেন, আর আমরা জানি। এ সামান্য নযরটা অবশ্য সে ঋণের পরিশোধ হতেই পারে না—তবে আমার সাধ্যে যেটুকু কুলোয় তাই দিচ্ছি, ওটা আপনাকে নিতেই হবে।"

ডাক্তার বাবু একটু ভাবিয়া কহিলেন,—"না নিলে পাছে আপনারা বেজার হন, তাই নিচ্ছি—কিন্তু—আর না......" বলিয়া তিনি দু-খানি নোট উঠাইয়া লইলেন। কিছুতেই অধিক লইতে চাহিলেন না।

এমন সময়, "ম্যা সাএব শ্যালাম, শ্যালাম" বলিতে বলিতে, এবং সুদীর্ঘ হাতখানি সম্মুখের দিকে হঠাৎ বাড়াইয়া দিয়া আবার টানিয়া লইয়া কপালে ঠেকাইতে ঠেকাইতে, নিকারি পাড়ার মোড়ল আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

২৮

স্কুল খুলিবার কয়েক দিন পরে আবদুল্লাহ্ একদিন ক্লাসে পড়াইতেছে, এমন সময় হেডমাষ্টার তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ক্লাসে কাজ করিবার সময় এমন করিয়া হঠাৎ ডাকিয়া পাঠানো স্কুলের রীতিবিরুদ্ধ—তবে কোন বিশেষ জরুরী কারণ থাকিলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সে জরুরী কারণটি এ ক্ষেত্রে কি? কিছু একটা গুরুতর অপরাধ হইয়া গিয়াছে, না কোন

অপ্রত্যাশিত শুভ-সংবাদ আসিয়াছে? এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে স্পন্দিত হৃদয়ে আবদুল্লাহ্ হেডমাষ্টারের কামরায় গিয়া প্রবেশ করিল।

তাহাকে দেখিয়াই হেডমাষ্টার স্মিতমুখে, "গুড্ নিউজ ফর ইউ, মৌলভী, লেট্ মি কন্‌গ্রাচুলেট ইউ।" বলিয়া আবদুল্লার হাতখানি ধরিয়া প্রবলবেগে দুই-তিনটা ঝাঁকা দিয়া দিলেন।

আবদুল্লার বুকের ভিতর ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। সে ঔৎসুক্যে অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ব্যাপার কি, সার?"

হেডমাষ্টার কহিলেন,—"কবে খাওয়াচ্চেন তা আগে বলুন,—খোশ খবর কি অম্‌নি বলা যায়?"

"বেশ তো যদি এমনই খোশ-খবর হয়, তা হ'লে খাওয়াব বই কি। অবিশ্যি আমার সাধ্যে যদ্দুর কুলোয়।"

"তা আর কুলোবে না? বলেন কি! যে খবর দিচ্ছি, তার দাম নেমন্তন্ন খাওয়ার চাইতে অনেক বেশী। আচ্ছা, আপনিই আঁচ করুন দেখি, এমন কি খবর হ'তে পারে?"

সংবাদটি জানিবার জন্য আবদুল্লার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল—অতি কষ্টে ঔৎসুক্য দমন করিয়া রাখিয়া কহিল,—"বোধ করি একটা প্রমোশন পেয়ে থাক্‌ব।"

হেডমাষ্টার অবজ্ঞাভরে কহিলেন,—"নাঃ, আপনার সাধ্যই নেই সে আসল কথাটা আঁচ করা। যদি বলি আপনি হেডমাষ্টার হ'য়েছেন, বিশ্বাস ক'রবেন?"

"কোথাকার হেডমাষ্টার?"

"রসুলপুর হাইস্কুলের?"

"রসুলপুরের! আমি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিশ্বাস হচ্চে না? এই দেখুন ইনস্পেক্টরের চিঠি। ও স্কুলটা যে এখন প্রভিন্সিয়ালাইজড্ হয়ে গেল। আপনাকে সত্বর রিলিভ করবার জন্যেও কড়া হুকুম এসেছে!"

আবদুল্লাহ্ কম্পিতহস্তে পত্রখানি লইল এবং তাড়াতাড়ি তাহার উপর দিয়া চোখ বুলাইয়া গেল। সত্যই তো তাহাকে রসুলপুরের নূতন গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলের হেডমাষ্টার নিযুক্ত করা হইয়াছে—একশত টাকা বেতনে! তৎক্ষণাৎ ইনস্পেক্টর সাহেবের শেষ কথা কয়টি তাহার মনে পড়িয়া গেল, "আপনার যাতে সুবিধে হয়ে যায়, তার জন্য আমি চেষ্টা করব" এবং কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। পত্রখানি হেডমাষ্টারকে ফিরাইয়া দিয়া সে গদগদ কণ্ঠে কহিল,—"সার এ কেবল আপনার সুনযর ছিল বলে......"

হেডমাষ্টার যথেষ্ট গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া কহিলেন,—"সাহেব সেদিন ইনস্পেকশনের সময় আমাকে ব'লেছিলেন, রসুলপুর স্কুল প্রভিন্সিয়ালাইজড্ হবে, আর সেখানে একজন ভাল হেডমাষ্টার নিযুক্ত করা হবে। আমি তক্ষুনি তাকে বল্লাম, আমার ষ্টাফে একজন খুব উপযুক্ত লোক আছেন। বুঝতেই পাচ্ছেন, আপনার কথাই আমি তাঁকে বলেছিলাম তা তিনি আপনার নাম নোট করে নিয়েছিলেন। আচ্ছা, আপনাকে কোন হিন্ট দেন নি?"

"না সার। আমি স্কুলে একজন মৌলবী দেবার কথা বল্‌তে গিয়েছিলাম, অন্য কোন কথা হয় নি তো।"

"বড়ই আশ্চর্য! সাহেবের এ্যাটিচুড দেখে কিন্তু আমার তখনই মনে হ'য়েছিল যে আপনাকেই সিলেক্ট ক'রবেন—আর ক'রেছেন তাই। যা হোক্, আমার রেকমেণ্ডেশনটা যে তিনি রেখেছেন, এতে আজ আমার ভারী আনন্দ হ'চ্চে, মৌলবী সাহেব!"

আবদুল্লাহ্ বিনয়ের সহিত কহিল,—"আপনার অনুগ্রহ।"

"তাহ'লে আপনি কবে যাচ্ছেন?"

"যখন আপনার সুবিধে হবে..."

"আমার সুবিধার কথা তো হচ্চে না—মৌলবী সাহেব! আপনাকে এ্যাট-ওয়ান্স্ রিলিভ ক'রবার জন্যে যে অর্ডার আছে। বিলম্ব করা তো আপনার পক্ষে উচিত হবে না।"

"তবে কবে আমাকে রিলিভ ক'রবেন?"

"বলেন তো কালই!"

"আচ্ছা, সার।"

"কিন্তু আপনি যত শীগ্‌গীর পারেন, ওখানে গিয়ে জয়েন ক'রবেন। যেতেও তো দিন দুই লাগ্‌বে—কমুনিকেশন ওখানকার বড়ই বিশ্রী। আপনি আজই গিয়ে সব গুছিয়ে টুছিয়ে নিন।......"

আবদুল্লাহ্ একটু ভাবিয়া কহিল,—"তা হলে হোষ্টেলের চার্জ কাকে দেব?"

হেডমাষ্টার যেন একটু চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন,—"ওঃ হো। সে কথা তো আমি আপনাকে বল'তে ভুলে গিয়েছি। এই জানুয়ারী থেকে একজন মৌলবী আস্‌চেন যে!"

আবদুল্লাহ্ একটু আশ্চর্য হইয়া কহিল,—"অর্ডার এসেচে নাকি?"

ইনস্পেক্টার সাহেব যে একেবারে এতখানি অনুগ্রহ করিয়া ফেলিবেন ইহা স্বপ্নেরও অতীত। যাহা হউক, নিজের পদোন্নতিতে তো আবদুল্লাহ্ সুখী হইলই, তাহার উপর মৌলবী নিযুক্ত করা সম্বন্ধে যে তাহার অনুরোধ রক্ষা করা হইয়াছে, ইহাতেও সে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করিল।

দেখিতে দেখিতে স্কুলময় এই আশ্চর্য সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া গেল। যে যে ঘণ্টায় যাঁহাদের বিশ্রাম, তখন তাঁহারা নানাপ্রকারে ইহার সমালোচনা করিতে লাগিলেন। কোথায় কোথায় কোন স্কুলে ক'জন বিশেষ যোগ্য লোক আছেন, বরিহাটির ষ্টাফেও আবদুল্লাহ্ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ কে কে আছেন, একে একে তাঁহাদের নাম হইতে লাগিল এবং সকলেই একবাক্যে মত প্রকাশ করিলেন যে, এ লোকটা কেবল মুসলমান বলিয়াই হঠাৎ এমন বড় চাকরীটা পাইয়া গেল। ইহাও সকলে স্থির করিয়া ফেলিলেন যে, স্কুলের হেডমাষ্টারী করা আবদুল্লার কর্ম নয়; দুদিনের মধ্যেই একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড ঘটিয়া যাইবেই যাইবে।

আবার কেহ কেহ কহিলেন, মুসলমানের আজকাল সাতখুন মাফ। আবদুল্লার আমলে স্কুলটি গোল্লায় না গেলে স্থানবিশেষের প্রতি দুর্জয় ঝোঁক দেখাইলেও তাহার কোন ভয়ের কারণ নেই। রসুলপুরের ভূতপূর্ব হেডমাষ্টার বরদাবাবু কিই বা অপরাধ করিয়াছিলেন—কতকগুলো দুষ্ট ছেলে একটা কাণ্ড করিল, আর তাহার জন্য কিনা বেচারা বরদাবাবুর চাকরীটাই গেল। বরদাবাবু যদি মুসলমান হইতেন, তাহা হইলে স্কুলে স্বদেশীর হাট বসাইলেও গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে একটা খাঁ বাহাদুরী না দিয়া ছাড়িতেন না। আর পড়াশুনা? আপনারা পাঁচজনে দেখিয়া লইবেন, যদি সাত বৎসরেও একটি ছেলে রসুলপুর হইতে এণ্ট্রান্স পাশ না করে, তথাপি আবদুল্লার প্রমোশন স্থগিত থাকিবে না।

যাহা হউক, আবদুল্লার এই সৌভাগ্যে আকবর আলী এবং আবদুল কাদের, এই দুইজন আন্তরিক সুখী হইলেন এবং বার বার খোদার নিকট শোকর করিতে লাগিলেন। আকবর আলী কহিলেন, "দেখুন খোনকার সাহেব, আপনার মুখের উপর বলাটা যদিও ঠিক নয় তবু বলি যে, যোগ্য লোকের উন্নতি খোদা যে কোন দিক্ থেকে জুটিয়ে দেন, তা বলা যায় না। বাস্তবিক এখানে যার সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে, সকলেই আপনার প্রশংসা করে। বিশেষ আপনার খোশ্-আখলাকে সকলেই মুগ্ধ। আপনি যাচ্ছেন বটে খোদা করুন দিন দিন আপনার উন্নতি হোক—কিন্তু আমাদের আপনি কাঁদিয়ে যাচ্ছেন।"

আবদুল্লাহ্ আর্দ্রকণ্ঠে কহিল,—"মুন্সী সাহেব, আপনি আমাকে বড্ড বেশী স্নেহ করেন বলেই এ সব বলছেন।"

আবদুল কাদের রহস্য করিয়া কহিল, "নেও নেও, উনি স্নেহ করেন, আর আমি বুঝি করিনে; আমি কিন্তু ওয়াদা কচ্ছি, তুমি চ'লে গেলে এখানকার কেউ তোমার জন্য কাঁদবে না—আমিও না..."

বলিতে গিয়া সত্যসত্যই কাদেরের দুই চোখ ভরিয়া উঠিল। আবদুল্লাহ্ তাহাকে বক্ষের উপর টানিয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিতে লাগিল, "ভাই, প্রথম চাকরী পেয়ে অবধি আমরা দুজনে

এক জায়গাতেই ছিলাম—বড়ই আনন্দে ছিলাম। এখন প্রমোশন পেলাম বটে, কিন্তু তোমাদের ছেড়ে যেতে হবে, এই কথা মনে করে প্রাণটা অস্থির হচ্ছে। এ আড়াইটা বছর কি নির্ভাবনায়, কি আনন্দেই কেটে গেছে। বুঝি জীবনের এই কটা দিনই শ্রেষ্ঠ দিন গেল, এমন সুখের দিন আর হবে না' ভাই!

সন্ধ্যার কিছু পরে যখন আবদুল্লাহ্ বোর্ডিংএ ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল স্কুলের অনেকগুলি ছাত্র সেখানে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাহাকে আসিতে দেখিয়া সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্র সতীশ অগ্রসর হইয়া নমস্কার করিল এবং কহিল, "সার, আপনি হেডমাষ্টার হ'য়ে চলে যাচ্ছেন, তাতে আমরা খুব খুশী হয়েছি ; কিন্তু আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন বলে মনে বড় দুঃখ হচ্ছে। তা আমরা আপনাকে একটি address দেব বলে হেডমাষ্টার মহাশয়কে বল্লাম, কিন্তু তিনি বল্লেন ওটা নাকি rule-এর against-এ। এখন আপনি যদি বলেন, তবে অন্য কোন জায়গায় মিটিং করে আপনাকে address দিই।"

আবদুল্লাহ্ কহিল, "না হে, যখন ওটা rule-এর against-এ তখন ওসবে কাজ নেই। তোমরা সকলে যে আজ আমার সঙ্গে এখানে দেখা কত্তে এসেছ, এতেই address-এর চাইতে আমাকে ঢের বেশী সম্মান করা হ'য়েছে।

অবনী নামক আর একটি ছাত্র নিরাশাব্যঞ্জক স্বরে কহিল,—"তবে কি সার আমাদের address দেওয়া হবে না?"

"এই তো দিচ্ছ ভাই আমাকে address! সভা করে ধূমধাম না কল্লে কি আর মনের ভালবাসা জানানো হয় না? আজ সত্যিই আমি বুঝতে পাচ্ছি, তোমরা আমাকে ভালবাস! এই বেশ; আমার সঙ্গে তোমাদের কেমন ভাব, লোকে তা নাই বা জান্‌ল! শুধু তোমরা আর আমি জান্‌লাম। এই বেশ!"

আবদুল্লার কথাগুলি ছাত্রদের মর্মে গিয়া স্পর্শ করিল। কয়েকজন আবেগভরে বলিয়া উঠিল—"থাক, সার, address দিতে চাইনে—তবে ভগবান করুন যেন আপনি শীগ্‌গীরই আমাদের হেডমাষ্টার হ'য়ে আসেন।"

আবদুল্লাহ্ হাসিয়া কহিল,—"দেখ পাগলগুলো বলে কি। কেন, আমাদের হেডমাষ্টার তো চমৎকার লোক। তিনিই ইনস্পেক্টার সাহেবের কাছে আমার জন্যে সুপারিশ করে চাকরী করে দিয়েছেন, এমন লোককে কি অশ্রদ্ধা কত্তে হয়।"

"তা হোক সার, আপনি গেলে আপনার মত সার আমরা আর পাব না।"

"দেখ তোমরা আমাকে ভালবাস বলেই এমন কথা বল্‌ছ। আমার মত শিক্ষক পাও আর না পাও—আশীর্বাদ করি, যে আমার অপেক্ষা শত-সহস্রগুণ ভাল শিক্ষক তোমরা পাও।—কিন্তু তোমাদের কথাবার্তা শুনে আমি যে বুঝতে পাচ্ছি, আমি তোমাদের ভালবাসা লাভ কত্তে পেরেছি, এতেই আমার মনে যে কত আনন্দ হচ্চে, তা বলে শেষ করা যায় না। আশীর্বাদ করি, তোমরা মানুষ হও, প্রকৃত মানুষ হও—যে মানুষ হ'লে পরস্পরকে ঘৃণা কত্তে ভুলে যায়, হিন্দু মুসলমানকে, মুসলমান হিন্দুকে আপনার জন বলে মনে কত্তে পারে। এই কথাটুকু তোমরা মনে রাখবে ভাই,—অনেকবার তোমাদের বলেছি, আবার বলি, হিন্দু-মুসলমান ভেদজ্ঞান মনে স্থান দিও না। আমাদের দেশের যত অকল্যাণ, যত দুঃখকষ্ট, এই ভেদ জ্ঞানের দরুনই সব। এইটুকু ঘুচে গেলে আমরা মানুষ হতে পারব—দেশের মুখ উজ্জ্বল কত্তে পারব।"

এইরূপ কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়া মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া আবদুল্লাহ্ সকলকে বিদায় দিল। যাইবার পূর্বে তাহারা জানিয়া গেল যে, আগামী কল্যই আবদুল্লাহ স্কুলের কাজ হইতে অবকাশ লইবেন এবং পরশু শুক্রবার বাদজুমা বিকালের ট্রেনে রওয়ানা হইবেন।

কিন্তু রওয়ানা হইবার সময় ষ্টেশনে ছাত্রদের কেহই আসিল না। আবদুল্লাহ্ মনে করিয়াছিল, তাহাকে বিদায় দিবার জন্য দুই চারিজন ছাত্র নিশ্চয়ই ষ্টেশনে আসিবে তাই প্লাটফর্মের উপর দাঁড়াইয়া উৎসুক নেত্রে এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিল। শেষ ঘণ্টা পড়িল, তবু

কেহ আসিল না। আবদুল্লাহ্ তাড়াতাড়ি আকবর আলি এবং আবদুল কাদেরের সহিত কোলাকুলি করিয়া গাড়ীতে চড়িয়া বসিল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

২৯

রাত্রি প্রায় ৯টার সময় বিলগাঁ ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। আবদুল্লাহ্ জিনিস-পত্র লইয়া নামিয়া পড়িল। এইখান হইতে গরুরগাড়ী করিয়া তাহাকে অনেকটা পথ যাইতে হইবে। রাত্রে গাড়ী পাওয়া যাইবে না—একটা হোটেলেই থাকিতে হইবে ; পরদিন প্রাতে গাড়ী ছাড়িলে সন্ধ্যার পূর্বেই রসূলপুর পৌঁছিতে পারিবে।

ষ্টেশনের বাহিরেই কয়েকটা হোটেল আছে। আবদুল্লাহ্ তাহারই একটাতে গিয়া উঠিল! সঙ্গে জিনিস-পত্র বেশী ছিল না, একটা তোরঙ্গ, একটা বিছানার মোট আর একটা বদ্‌না। হাত মুখ ধুইবার জন্য জল চাহিলে হোটেলওয়ালা একটা কুঁয়া দেখাইয়া দিল। আবদুল্লাহ্ বদ্‌নাটি লইয়া কুঁয়ার নিকটে গেল এবং এক বাল্‌তি জল উঠাইয়া বদ্‌না ভরিয়া জল আনিয়া বারান্দার এক প্রান্তে ওযূ করিতে বসিল। হোটেলে আরও অনেক যাত্রী ছিল ; আবদুল্লাহ্‌কে ওযূ করিতে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে হইতে কয়েকজন উঠিয়া ওযূ করিবার জন্য কুঁয়ার ধারে গেল। ইতিমধ্যে আবদুল্লাহ্ ওযূ সারিয়া জায়-নামায বাহির করিল এবং হোটেল ঘরটির এক কোণে গিয়া নামাযে খাড়া হইল। ক্রমে আরও দুই চারিজন যাত্রী ওযূ করিয়া আসিয়া, কেহ তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে, কেহ পশ্চাতে—কেহ উড়ানী, কেহ স্কন্ধস্থিত রঙ্গিন রুমাল বিছাইয়া নামাযে যোগদান করিল।

নামায শেষ হইতে না হইতেই খানা আসিল। প্রথমে একটা শতছিন্ন লম্বা মাদুর মেঝের উপর পাতা হইল, তাহার উপর, মাদুরের অর্ধেক ঢাকিয়া একটা খেরুয়ার দস্তরখান বিছাইয়া দিল। দস্তরখানটিতে যে, কয় বেলার ডাল, সুরুয়া, ঘুষা-চিংড়ির খোলা, মাছের দুই একটা সরু কাঁটা ইত্যাদি শুকাইয়া লাগিয়া রহিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই।

নামায শেষ করিয়া উঠিয়া আবদুল্লাহ্ দেখিল, দুই চারিজন যাত্রী খানার প্রত্যাশায় দস্তরখানে বসিয়া আছে। সেও আসিল, পার্শ্বে চিলমচি ও বদ্‌না ছিল, হাত ধুইয়া লইল ; কিন্তু মাদুরের কোন্‌খানটিতে বসিলে মাটি লাগিয়া কাপড় নষ্ট হইবে না, তাহা খুজিয়া পাইল না। অবশেষে মাটি মাদুর নির্বিশেষে এক প্রান্তে তাহাকে বসিয়া পড়িতে হইল। দস্তরখানটির দুর্গন্ধে আবদুল্লাহ্ মনে মনে বিরক্ত হইল বটে, কিন্তু এরূপ দস্তরখানে বসা তাহার পক্ষে নূতন নহে—সচরাচর বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে খাইতে গিয়া সে দস্তরখানের দুর্গন্ধে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। দরিদ্র মুসলমান ভদ্রলোকেরা পৈতৃক ঠাট বজায় রাখিতেই চেষ্টা করিয়া থাকেনঃ কিন্তু মানসিক নিশ্চেষ্টতার দরুন পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিয়া চলিবার তৎপরতাটুকু তাঁহারা হারাইয়া বসিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় বেচারা হোটেলওয়ালার আর অপরাধ কি।

ওদিকে যাহারা নামাযে শরীক হইয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে একে একে সকলে আসিতে লাগিল। কিন্তু এ পর্যন্ত একটি লোক টিকিয়া গেল—এদিকে সকলের খানা শুরু হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে লোকটি ঘাড় গুঁজিয়া তাহার রঙ্গিন রুমালটির উপর বসিয়াই রহিল। হোটেলওয়ালা তাড়া দিয়া কহিল,—"নেও নেও মেয়াসাহেব, ওঠ, উদিক দে গাড়ী আস্যে পড়লো বুঝি। ওই শোন ঘণ্টা পড়তিছে।"

বাস্তবিকই ষ্টেশনে ঘণ্টা পড়িতেছিল ; কিন্তু উহা গাড়ীর আসিবার ঘণ্টা নহে, রাত্রি দশটার ঘণ্টা। কিন্তু তাহা হইলেও গাড়ীর ঘণ্টা পড়িবার আর বড় বিলম্ব ছিল না। বরিহাটি যাইবার গাড়ী সাড়ে দশটায় বিলগাঁয়ে আসিবে। লোকটা হোটেলওয়ালার তাড়া খাইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা শুনিয়া চট্-পট্ মুনাজাত করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং "দেও, দেও জল্‌দি খানা দেও" বলিতে বলিতে দস্তরখানে আসিয়া বসিল।

হোটেলওয়ালা একটা বড় কাঠের খাঞ্চা ভরিয়া ভাত আনিল এবং কলাই-চটা এনামেলের রেকাবীগুলিতে দুই-তিন থাবা করিয়া ভাত দিয়া গেল। আর একটি লোক সবুজ রঙের লতা-পাতা কাটা একটা বড় চিনামাটির পেয়ালা হইতে বেগুন ও ঘুষাচিংড়ির ঘন্ট থপ্‌ থপ্‌ করিয়া খানিকটা খানিকটা দিয়া যাইতে লাগিল। একটা লোক বলিয়া উঠিল, "কই মেয়া সাহেব, একটু নেমক দিলে না।"

"ওরে হাশেম, নেমক দিয়ে যারে"—বলিয়া হোটেলওয়ালা এক হাঁক দিল। হাশেম নামক ছোকরাটি দৌড়িয়া বাবুর্চিখানার দিকে গেল, কিন্তু একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "নেমক তো নেই, বাপজী।"

"বলিস্‌ কিরে! নেমক নেই? দৌড়ে যা দৌড়ে যা, বাজারে এক পয়সার নেমক নে আয়" বলিয়া হোটেলওয়ালা কাপড়ের খুঁট খুলিয়া একটা পয়সা বাহির করিয়া দিল। এ কার্যে অবশ্য তাহার আর হাত ধুইবার কোন আবশ্যকতা দেখা গেল না।

এদিকে যাত্রীদিগের মধ্যে অনেকে বিনা লবণেই বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল; কিন্তু সেই অতি নামাযী লোকটি এবং তাহার দেখাদেখি আরও দুই একজন কাঁধে রঙিন রুমালওয়ালা লবণ অভাবে বিস্‌মিল্লাহ্‌ করিতে না পারিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিল। প্রায় আট-দশ মিনিট পরে ছোকরাটি লবণ লইয়া ফিরিয়া আসিল এবং কাগজের ঠোঙ্গা হইতে একটু একটু লবণ তুলিয়া পাতে পাতে দিয়া গেল। তখন রঙ্গীন-রুমালওয়ালা একটু নড়িয়া বসিয়া একটু কাঁপিয়া, তর্জনীটা একবার লবণের উপর চাপিয়া লইয়া সাড়ম্বরে বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলিয়া উহা জিহ্বাগ্রে ঠেকাইয়া, খানা আরম্ভ করিল।

বেগুনের সালুন দিয়া খাওয়া প্রায় শেষ হইল, যাত্রীরা ডাল এবং আরও চারিটি ভাত চাহিতেছে, এমন সময় ষ্টেশনে ঢংঢং করিয়া ঘন্টা বাজিয়া উঠিল। হোটেলওয়ালা কহিল,—"জলদি খায়্যা লেন মেয়া সাহেবেরা, গাড়ী আস্যে পড়্‌লো।"

"এ্যাঁ, খাওয়াই যে হলো না! কি করি?" বলিতে বলিতে পাঁচ সাত জন উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি হাত ধুইবার জন্য বদ্‌না লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল,—কেহ বা কুঁয়ার দিকে ছুটিল। হোটেলওয়ালা চীৎকার করিয়া কহিল,—"পয়সা তিন আনার দে যাবেন মেয়া সাহেবেরা। ওরে হাশেম, পয়সাডা গুনে নিস্‌......"

হাশেম পিতার আদেশ পাইয়া দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তিন চার জন লোক তখন হাত ধুইয়া ঘরের বাহির হইতেছিল; তাহারা ট্যাক হইতে পয়সা বাহির করিয়া গণিয়া দিয়া গেল। কিন্তু আরও কয়েকজনের নিকট হইতে পয়সা আদায় করা বাকী, তাহারা গেল কোথায়? হোটেলওয়ালা অবশিষ্ট আহার-নিরত যাত্রীদিগকে ডাল দিতেছিল; সে কহিল,—"দেখত হাশেম, কুয়োডার কাছে, এ মেয়া সাহেবেরা কেমন লোক? খানা খ্যায়া পয়সা না দ্যোই ভাগতি চায়?"

যে লোকটি হোটেলওয়ালার সহিত খাদেমী করিতেছিল, সে ইতিমধ্যে একবার বাবুর্চিখানায় যাইবার পথে কুঁয়ার ধারে জন তিনেক লোক ধরিয়া পয়সা আদায় করিয়া লইয়াছিল। সে ঘরে আসিয়া হোটেলওয়ালাকে কহিল,—"মেয়া ভাই, এই লন তিন জনের পয়সা।"

হাশেম তিন জনের নিকট হইতে পয়সা আদায় করিয়াছিল। হোটেলওয়ালা গণিয়া দেখিল, সাত জন লোক উঠিয়াছে, কিন্তু পয়সা দিয়াছে ছয় জন। কোন্‌ লোক্‌টা পয়সা না দিয়া পলাইল? হাশেম কহিল,—"যে মানুষটা শ্যাষে আইস্যা বসছিল, তারে কিন্তু আমি দেহি নাই।" হোটেলওয়ালার ভাই কহিল,—"আমিও তো দেহি নাই! ওই মানুষটাই ভাগছে বোধ করি। মেয়া ভাই, দেহি ইষ্টিশনে গ্যে মানুষটারে ধরি। বলিয়াই সে চলিয়া গেল।

এদিকে সকলে খানা শেষ করিয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে গাড়ী আসিল। দুই তিন মিনিটের মধ্যেই আবার গাড়ী ছাড়িয়া দিল এবং তাহার একটু পরেই হোটেলওয়ালার ভাই ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—"নাঃ, তারে তো ধত্তি পাল্লাম না মেয়া বাই—বড্ড ফাঁকি দ্যে গেল।"

হোটেলওয়ালার পক্ষে এরূপ ফাঁকিতে পড়া কিছু নূতন নহে। সেও তেমনি ঘণ্টা না পড়িলে লোককে ভাত দিত না ; সুতরাং অনেককেই আধপেটা খাওয়াইয়া পুরা তিনগণ্ডা পয়সা আদায় করিয়া পোষাইয়া লইত। সে কেবল কহিল,—"ভাল রে ভাল, এমন মুসল্লি মানুষটা! ওই যে কয়, বোলে 'মান্‌ষির মাথায় কাল চুল মানুষ চেনা ভার।' তা সত্যি!"

প্রাতে একখানি গাড়ী ঠিক করিয়া আবদুল্লাহ্ রওয়ানা হইল। তখন কার্তিক মাস ; বর্ষাকাল শেষ হইয়া গেলেও এখনও তাহার জের মেটে নাই! রাস্তার স্থানে স্থানে অনেকটা করিয়া কাদা জমিয়া আছে ; কাজেই গাড়ী অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল।

মাঠের ভিতর দিয়া আবদুল্লার গাড়ীখানি চলিতে লাগিল। ক্রমে বেলা দ্বিপ্রহর হইয়া আসিল দেখিয়া আবদুল্লাহ্ গাড়োয়ানকে কহিল, একটা বাজার টাজার দেখিয়া গাড়ী থামান হউক, কিছু নাশ্‌তা করিয়া লওয়া যাইবে।

গাড়োয়ান কহিল,—"হুমকির এই গেরামডার ওই মুড়োয় বাজার আছে, কাছে এট্টা ভাল পুষ্কনিও আছে, পানি টানি খাতি পার্বেন।"

আবদুল্লাহ্ কহিল, "আচ্ছা তাই চল।"

যে রাস্তা দিয়া আবদুল্লার গাড়ী চলিতেছিল, সেটি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা। রাস্তাটি বেশ চৌড়া ও উচ্চ ; কিন্তু সম্মুখস্থ গ্রামের ভিতর দিয়া না গিয়া বাঁকিয়া গ্রামের বাহির দিয়া গিয়াছে। উহার দক্ষিণ পার্শ্বে গ্রাম এবং বাম পার্শ্বে বিল। গাড়োয়ান কহিল, এ সরকারী রাস্তা দিয়া আর যাওয়া যাইবে না, কারণ বিলের ভিতর খানিকটা রাস্তা নাই, জল একদম ধুইয়া গিয়াছে। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কায়দাই এরূপ, এক বর্ষায় রাস্তা ভাঙে, আর এক বর্ষার প্রারম্ভে মেরামত হয়। সুতরাং গ্রামের ভিতরকার সঙ্কীর্ণ পথ দিয়াই যাইতে হইবে।

গ্রামের মধ্য দিয়াই গাড়ী চলিল। পথের উভয় পার্শ্বে ঘন-বসতি—ঘরগুলির বারান্দা একেবারে রাস্তারই উপর। পথ এত সঙ্কীর্ণ যে, একখানি গাড়ি চলিলে আর মানুষ পর্যন্ত চলিবার স্থান থাকে না। খানিকদূর গিয়াই আবদুল্লাহ্ দেখিল, সর্বনাশ! এ রাস্তাও খানিকটা ভাঙা, মধ্যে ভয়ানক গর্ত, জল-কাদায় ভরা। ভাঙন অধিকদূর লইয়া নহে, এই হাত পাঁচ ছয় হইবে ; কিন্তু পাড় এমন খাড়া যে, গাড়ী তাহার ভিতর নামানো কঠিন না হইলেও ওঠানো একরূপ অসম্ভব। এক্ষণে উপায়?

গাড়োয়ান কহিল,—"হুজুর এ হাবোড়ের মদ্দি দ্যে তো গাড়ী চল্‌বি নে!"

"তবে কি করা যায়?"

গাড়োয়ান একটু ভাবিয়া কহিল,—"দেহি যদি আর কোন পথ পাই।"

গাড়ীখানি ভাঙা রাস্তার কিনারায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়া গাড়োয়ান পাড়ার মধ্যে প্রবেশ করিল। আবদুল্লাহ্ গাড়ী হইতে নামিল। সম্মুখে রাস্তার উপরেই একখানি বাড়ী ; তাহার দাওয়ায় এক ব্রাহ্মণ খালি গায় বসিয়া ডাবা হুঁকায় তামাক খাইতেছিলেন। আবদুল্লাহ্ একটু অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মশায় গাড়ী যাবার কি আর কোন পথ আছে?"

ব্রাহ্মণটি একটু ঘাড় নাড়িয়া একটী "উঁহুক্" শব্দ করিয়া ধোঁয়া ছাড়িলেন।

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"তবে কি করি, মশায়, বড়ই মুস্কিল হল ত!"

ব্রাহ্মণটি কোন উত্তর করিলেন না। রৌদ্রতাপে ক্লান্ত হইয়া আবদুল্লার বড় ইচ্ছা হইতেছিল, দাওয়ার উপর উঠিয়া বসিয়া একটু বিশ্রাম করে, কিন্তু গৃহস্বামীর দুর্জ্ঞেয় তুষ্ণীভাব দেখিয়া আর তাহার সাহস হইল না। অগত্যা সে রাস্তার পার্শ্বেই ছাতা খুলিয়া বসিয়া ব্যগ্রচিত্তে গাড়োয়ানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে গাড়োয়ান ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—"হুযুর, আছে এট্টা পথ ; কিন্তু সে এক ঠাহুরির বাড়ীর পর দ্যে যাতি হয়। আপনি গে তানার এট্টু ক'য়ে বুলে দ্যাহেন যদি যাতে দেন।"

এই কথায় কিঞ্চিৎ ভরসা পাইয়া আবদুল্লাহ্ গাড়োয়ানের সঙ্গে চলিল। সরুপথ দিয়া একটু গিয়া বাহির হইতে বাড়ীখানি দেখাইয়া দিয়া গাড়োয়ান কহিল,—"ঐ বাড়ী ; ঐ যে ফাটক্‌খানা দ্যাহা যায়। আপনি যান, আমি গাড়ীর কাছে থাক্‌লাম।"

আবদুল্লাহ্ গিয়া বৈঠকখানার বারান্দার উপর উঠিল। গৃহমধ্য হইতে শব্দ আসিল,—"কে?" আবদুল্লাহ্ কহিল,—"মশায় আমি বিদেশী, একটু মুস্কিলে পড়ে আপনার কাছে......" বলিতে ঘরে উঠিবার জন্য পা বাড়াইল।

টুপী-চাপকান পরিহিত অদ্ভুত মূর্তিখানি সটান ঘরের মধ্যে উঠিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া গৃহমধ্যস্থ লোকটি সত্রাসে 'হাঁ, হাঁ, করেন কি, করেন কি, বাইরে দাঁড়ান, বাইরে দাড়ান' বলিতে বলিতে তক্তপোশ হইতে নামিয়া পড়িলেন। আবদুল্লাহ্ অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি পা টানিয়া লইয়া বারান্দায় সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

"কি চান মশায়?" সে লোকটি দরজায় গবরাটের উপর দাঁড়াইয়া দুইহাতে চৌকাঠের বাজু দুটি ধরিয়া, একটু রুষ্ট স্বরে এই প্রশ্ন করিলেন।

আবদুল্লাহ্ যথাশক্তি বিনয়ের ভাব দেখাইয়া কহিল,—"মশায়, আমি গরুর গাড়ী ক'রে যাচ্ছিলাম, গ্রামের মধ্যে এসে দেখি রাস্তার এক জায়গায় ভাঙা, গাড়ী চলা অসম্ভব। শুনলাম মশায়ের বাড়ীর পাশ দিয়ে একটা পথ আছে যদি দয়া করে..."

লোকটি রুখিয়া উঠিয়া কহিলেন,—"হ্যাঃ, তোমার গাড়ী চলে না চলে তা আমার কি? আমার বাড়ীর উপর দিয়ে তো আর সদর রাস্তা নয় যে, যে আস্‌বে তাকেই পথ ছেড়ে দিতে হবে..."

আবদুল্লাহ্ একটু দৃঢ়স্বরে কহিল,—"মশায় বিপদে পড়ে একটা অনুরোধ কত্তে এসেছিলাম, তাতে আপনি চ'ট্‌ছেন কেন? পথ চেয়েছি বলে তো আর কেড়ে নিতে আসিনি! সোজা বল্লেই হয়, না, দেব না!"

"ওঃ, ভারি তো লবাব দেখি, কে হে তুমি, বাড়ী ব'য়ে এসে, লম্বা লম্বা কথা কইতে লেগেছ?"

"লম্বা কথা কিছু কই নি মশায়, একটু অনুগ্রহ প্রার্থনা কত্তে এসেছিলাম। থাক আপনাকে আর কোন অনুগ্রহ কত্তে হবে না, মেজাজও খারাপ কত্তে হবে না—আমি বিদায় হচ্ছি।"

লোকটা গজর গজর করিতে লাগিল। আবদুল্লাহ্ ফিরিয়া চলিল। তাহাকে বিষণ্নমুখে ফিরিতে দেখিয়া গাড়োয়ান কহিল,—"দেলে না বুজি? আমি জানি ও ঠাহুর ভারি ত্যান্দোড়। তবু আপনারে একবার যাতি কলাম, ভদ্দর লোক দেখলি যদি যাতি দেয়।"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"এস, এক কাজ করা যাক্। জিনিস-পত্তর গাড়ী থেকে তুলে নিয়ে দেও গাড়ী নামিয়ে। তুমি এক চাকা ঠেল, আমি এক চাকা ঠেলি—গরুও টানুক, তা হলে গাড়ী ঠিক উঠে যাবে।"

গাড়োয়ান একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—"আপনি এই হাবোড়ের মদ্দি নাম্‌বেন হুজুর?"

"তা কি ক'রব! দায়ে ঠেক্‌লে সবই কত্তে হয়। নেও আর দেরী ক'রো না।" এই বলিয়া আবদুল্লাহ্ বিছানা খুলিয়া একটা ময়লা ধুতি বাহির করিল এবং পোশাক ছাড়িয়া মালকোচা মারিল। গাড়োয়ান তোরঙ্গ এবং বিছানা গাড়ী হইতে উঠাইয়া রাস্তার কিনারায় রাখিয়া দিয়া একটা গরুর লেজ মলিয়া এবং আর একটার পিঠে পাঁচনবাড়ি কসিয়া র্‌-র্‌-র্‌ হেট্‌-হেট্‌ করিতে করিতে গাড়ী চালাইয়া দিল। ভাঙনের সেই খাড়া পাড়ের উপর দিয়া গাড়ীখানা ধড়াস্ করিয়া কাদার ভিতর নামিয়া অনেকখানি বসিয়া গেল।

গরু দুটি একবার ডাইনে, একবার বামে আঁকিয়া বাঁকিয়া অগ্রসর হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কাদা প্রায় তাহাদের বুক-সই; তাহার ভিতর হইতে পা টানিয়া উঠানো দুষ্কর হইয়া পড়িল। আবদুল্লাহ্ গাড়োয়ানের সহিত একযোগে প্রাণপণে চাকা ঠেলিতে লাগিল। কিন্তু ওপারেও তেমনি খাড়া পাড়, গাড়ী কিছুতেই উঠাইতে পারিল না। গরু দুইটা তো পূর্ব হইতেই ক্লান্ত হইয়াছিল; এক্ষণে ক্রমাগত লেজমলা এবং পাঁচনবাড়ী খাইতে খাইতে মৃতপ্রায় হইয়া সেই কাদার উপরেই শুইয়া-পড়িল। গাড়োয়ান চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"হমুন্দির গরু আবার বজ্জাত্তি লাগালো দ্যাহো!" এবং আবার মারিবার জন্য ভীষণ আস্ফালনের সহিত

পাঁচনবাড়ি উঠাইল। আবদুল্লাহ্ তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য তাড়াতাড়ি কহিল,—"আরে কর কি, ম'রে যাবে যে। আর পারবেই বা কত? মের না ওদের, এক কাজ কর। দেখ যদি দুই চার জন লোক পাওয়া যায়। পয়সা দেবখ'ন—যা চায় তাই দেব বলে নিয়ে এস।

গাড়োয়ান কহিল,—"এ হেঁদুর গাঁ এহানে কি মুনিষ্যি পাওয়া যাবি? যে গেরামডা এই পাছে থুয়ে আলাম, স্যানে পাওয়া গেলিউ যাতি পারে।"

"তবে তাই যাও, দেরী করো না।"

গাড়োয়ান চলিয়া গেল। আবদুল্লাহ্ কাদা ঠেলিয়া উঠিয়া আসিল এবং ছাতাটি খুলিয়া ব্রাহ্মণের দাওয়ার সম্মুখে রাস্তার উপরেই বসিয়া পড়িল।

ব্রাহ্মণটি উঠিয়া গিয়াছিলেন ; কিছুক্ষণ পরে পান চিবাইতে চিবাইতে ডাবা হাতে আবার বাহিরে আসিয়া বসিলেন। আবদুল্লাহ্ ঘাড় ফিরাইয়া তাঁহাকে একবার দেখিয়া লইল, কিন্তু কোন কথা কহিল না।

এদিকে দ্বিপ্রহর গড়াইয়া গিয়াছে—ক্ষুধায়, শ্রান্তিতে ও উদ্বেগে আবদুল্লাহ্ অস্থির হইয়া উঠিল। গাড়োয়ানের ফিরিতে কত দেরী হইবে, কে জানে? আবদুল্লাহ্ পথের দিকেই চাহিয়া আছে। অবশেষে প্রায় অর্ধঘণ্টা পরে দূর হইতে তিন চারিজন লোক আসিতেছে দেখা গেল। গাড়োয়ান লোক লইয়া ফিরিতেছে মনে করিয়া আবদুল্লার ধড়ে যেন প্রাণ আসিল। ক্রমে তাহারা নিকটবর্তী হইলে আবদুল্লাহ্ দেখিল, সে-ই বটে, তিন জন লোক সঙ্গে।

তাহারা আসিয়া কাদার ভিতর নামিয়া পড়িল। আবদুল্লাহ্ নামিবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু তাহারা কহিল,—"আপনি আর নাম্‌বেন ক্যান্ হুযুর? আমরাই ঠেলে দি তুলে—আপনি বসেন।" গরু দুইটি কাদার ভিতর শুইয়া শুইয়া এতক্ষণে একটু বিশ্রাম করিয়া লইয়াছে। গাড়োয়ানের পাঁচনবাড়ির দুটা খোঁচা খাইয়াই তাহারা উঠিয়া পড়িল। চারজন লোকে চাকা ঠেলিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই গাড়ী ওপারে তুলিয়া ফেলিল। আবদুল্লার জিনিসপত্রগুলিও তাহারা তথায় মাথায় করিয়া পার করিয়া দিয়া আসিল।

আবদুল্লাহ্ তাহাদিগকে কহিল,—"তোমরা আজ আমার বড্ড উপকার কল্লে বাপু—না হলে আমার যে আজ কি উপায় হ'ত তার ঠিক নেই। এদের কত দেবার কথা আছে, গাড়োয়ান?"

গাড়োয়ান কহিল,—"আমি পুস্ করছিলাম, কত লেবা ; তা ওরা বলে হুযুর খুশী হয়ে যা দেন, আমরা আর কি কবো।"

আবদুল্লাহ্ একটি টাকা বাহির করিয়া দিল। তাহারা খুশী হইয়া সালাম করিয়া চলিয়া গেল।

যাইবার পূর্বে আবদুল্লাহ্ সেই ডাবা-প্রেমিক ব্রাহ্মণটির দিকে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল ঠাকুর মশায় তাহাদের দিকেই তাকাইয়া আছেন এবং সুস্থ চিত্তে ধূমপান করিতেছেন।

৩০

মগরেবের কিঞ্চিৎ পূর্বে মীর সাহেব মস্‌জিদে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিয়াছেন, এমন সময় দুইটি লোক বৈঠকখানার বারান্দা হইতে নামিয়া আসিয়া একেবারে তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া করুণস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"আমাগোর সর্বনাশ হয়ে গেছে হুযুর, এ্যাহোন আপনি যদি বাঁচান তো বাঁচি!"

হঠাৎ এইরূপ আক্রান্ত হইয়া মীরসাহেব ত্রস্তভাবে পা টানিয়া লইলেন এবং কহিলেন,—"আরে কে? বসির মাঝি? কি, কি, হয়েছে কি?"

বসির কহিল,—"আর কি হবে হুযুর, সর্বনাশ হ'য়ে গেছে, আর কি কব! লাও ডুবে গেছে, খোদা জানডা বাঁচাইছে, আর কিসসু নেই!"

"এ্যাঁ! নৌকা ডুবে গেছে? কোথায়? কেমন ক'রে ডুবলো?"

"ম্যাগনায়। পাট বোজাই করে নে যাতিছেলাম, আটশো ট্যাহার পাট হুযুর! আমার যথাসর্বিস্বি হুযুর! অইন্দে গোনে এট্টা বাঁকের মুহি মস্ত এট্টা ইষ্টিমার আস্যে পড়ল সামাল দিতি পাল্লাম না! লার পর দে চ'লে গেল! সবই ভাইসে গেল।"

মীর সাহেব পরম দুঃখিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"ওহো!"

বসির চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া কহিতে লাগিল,—"হুযুর, কিস্‌সু বাঁচাতি পালাম না। গনি গাঙ, তাতে আঁদার রা'ত লারও ঠিকানা কত্তি পালাম না! কম্নে ভাইসে গেল কিছুই ঠাওর কত্তি পাল্লাম না। এহোন উপায় কি হুযুর? আমার যে আর কিস্‌সু নেই।"

মলি সাহেব গভীর সহানুভূতির সহিত কহিলেন, "তাই তো বসির! তোমার তো বড়ই বিপদ গেছে দেখ্‌ছি!" বলিয়া বৈঠকখানার তক্তপোশের উপর বসিয়া পড়িল।

বসিরের সঙ্গে লোকটি তাহার নৌকার একজন মাল্লা। সে কিয়ৎক্ষণ গালে হাত দিয়া বসিয়া চিন্তাকুল ভাবে আপন মনে কহিতে লাগিল,—"নাইয়ার নাও গেল, মাহাজোনের ট্যাহা গেল, হের লইগা কিসু না! কিন্তু—কাওহান্ অইল কি!"

বসির কহিল,—"এ্যাহোন আমি লাইয়্যারেই বা কি বুজ দি, আর হুযুরির ট্যাহারই বা কি কোরি! আমি ধোনে পরাণে মলামরে আল্লাহ্!"

মীর সাহেব কহিলেন,—"আমার টাকার জন্যে তুমি ভেব না, বসির। তোমার সঙ্গে আমার অনেক দিনের কারবার! তোমাকে সৎ লোক ব'লেই জানি। তুমি তো আর ইচ্ছে ক'রে আমার টাকা মার নি! খোদার মরজি সবই—তার উপর তো কারুর কোন হাত নেই।"

এমন সময় একখানি গরুর গাড়ী করুণ কাতর রবে ক্লান্ত মন্থর গতিতে আসিয়া মীর সাহেবের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। আবদুল্লাহ্ তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া আসিল, মীর সাহেবও বৈঠকখানার বারান্দা হইতে নামিয়া আসিতে আসিতে কহিলেন,—"এস এস, বাবা; এত দেরী যে?"

আবদুল্লাহ্ 'কদমবুসি' করিয়া বলিল,—"পথে একটা মুস্কিলে পড়ে গিয়েছিলাম—তা পরে ব'লব খ'ন। আমার চিঠি পেয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, আজ সকালেই পেয়েছি। বড্ড খুশী হলাম যে তমি আমাদের স্কুলের হেড মাষ্টার হ'য়ে এলে—তোমার পত্র পড়ে অবধি খোদার কাছে হাজার হাজার শোকর কচ্ছি।"

"তবিয়ত ভাল তো?"

"হ্যাঁ, বাবা ভালই আছি।"

"আমি মনে ক'রেছিলাম হয় তো আপনি বাড়ীতে নেই..."

"না থাক্‌বারই কথা বটে—কিন্তু থেকে যেতে হয়েছে। বোধ করি তুমি আসবে বলেই খোদা আমাকে বাড়ী থেকে বেরুতে দেন্ নি।" বলিয়া মীর সাহেব স্মিতমুখে আবদুল্লার স্কন্ধে হাত দিলেন।

আবদুল্লাও হাসিমুখে কহিল,—"তা বেশ হ'য়েছে, আপনি আছেন, ফুফাজান। নইলে আমার ভারি অসুবিধে হত।"

মীর সাহেব কহিলেন, "এস, ঘরে এস। নামাযটা প'ড়েনি। ওযুর পানি চাই?"

"জি না, পথেই আসর প'ড়ে নিয়েছি। ওযু আছে।"

অতঃপর মীর সাহেব গাড়োয়ানকে জিনিসপত্র তুলিয়া রাখিতে বলিয়া এবং বসিরকে বসিবার জন্য ইশারা করিয়া আবদুল্লাকে লইয়া নামায পড়িবার জন্য বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। উলফৎ কিঞ্চিৎ পূর্বে আলো দিয়া গিয়াছিল।

নামায বাদ মীর সাহেব অন্দরে গিয়া আবদুল্লার জন্য কিঞ্চিৎ নাশতার বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া আসিলেন। একটু পরেই একটা বাঁদী নাশতার খাঞ্চা, চিলমচি, বদনা দস্তরখানা প্রভৃতি একে একে লইয়া আসিল। মীর সাহেব খানপোশ উঠাইয়া ফেলিলেন : খাঞ্চার উপর এক রেকাবী সমুসা, এক

তশতরী কুমড়ার মোরব্বা, এক তশতরী আণ্ডার হালুয়া ছিল. তিনি সেগুলি একে একে দস্তরখানে সাজাইয়া দিলেন।

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"আপনিও আসুন, ফুফাজান..."

"আমার তো এ সময়ে খাওয়া অভ্যাস নেই—বসি তোমার সঙ্গে একটু......"এই বলিয়া মীর সাহেব আবদুল্লার সহিত নাশতা করিতে বসিয়া গেলেন।

"ফুফাজান তো একলা মানুষ, তবে এ সব নাশতা কোথা হইতে আসিল?" আবদুল্লার কৌতূহল হইল; সে জিজ্ঞাসা করিল, "এগুলো কে ত'য়ের ক'রেছে; ফুফাজান?"

মীর সাহেব কহিলেন, "কেন, ভাল হয় নি?"

"না, না, ভাল হবে না কেন? বেশ চমৎকার হ'য়েছে। তবে আপনার এখানে এ সব নাশতা ত'য়ের করার তো কেউ নেই, তাই জিজ্ঞেস কচ্ছিলাম....."

মীর সাহেব একটু হাসিয়া কহিলেন,—"ওঃ, তা বুঝি জান না? আমার এক আম্মা এসেছেন যে!"

"কে? ভাবী সাহেবা?"

"না মালেকা, আমার ছোট আম্মা।"

"কবে এলেন তিনি?"

"এই ক'দিন হল। মইনুদ্দীন মারা গেছে তা বোধহয় জান..."

"কই না! কবে?"

"এই পূজার ছুটির ক'দিন আগেই। হঠাৎ কলেরা হয়েছিল।"

আবদুল্লাহ্ কেবল একবার "আহা!" বলিয়া অত্যন্ত বিষণ্ন মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মীর সাহেব বলিতে লাগিলেন, "মেয়েটা বিধবা হয়ে একেবারে নিরাশ্রয় হ'য়ে প'ড়েছিল—বুবুও তাঁহার নেই যে তাঁর কাছে এসে থাক্‌বে..."

"কেন, ভাসুর বুঝি জায়গা দিলে না?"

"দিয়েছিলেন; কিন্তু দুই জায়ে ব'ন্‌ল না। কাজেই তিনি বাধ্য হ'য়ে মালেকাকে আবদুল খালেকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।"

কেন, ব'ন্‌ল না কেন? মালেকার তো ছেলেপিলে নেই, নির্ঝঞ্ঝাট..."

"সে জন্যে না; অত বড় ঘরের মেয়ে—সৈয়দজাদী, বাপ জমিদার আবার সবজজ-জজিয়তিও মধ্যে মধ্যে ক'রে থাকেন—তিনি কি আর সামান্য গেরস্তের মেয়ের সঙ্গে ঘর কত্তে পারেন।"

"হ্যাঁ, তা ঠিক ফুফাজান! শুনেছি তিনি স্বামীকেও বড় একটা কেয়ার করেন না..."

"আরে কেয়ার করা তো দূরের কথা; তিনি স্বামীর কথায় নাকি ব'লে থাকেন,—"ওঃ এ্যায়সা ডিপটি কেত্তা মেরা বাপকা জুতা সাফ করনেকে লিয়ে রাখখা গিয়া হ্যায়!"

"বটে? তবে তো মহীউদ্দীন সাহেব খুব সুখেই ঘর কচ্ছেন।"

"হ্যাঁ,! সুখ ব'লে সুখ? বাড়ীতে তিনি যে কি হালে থাকেন, তা শুনলে কান্না আসে। তাঁর বাসন, পেয়ালা, গেলাস, বদ্‌না সব আলাদা। তিনি যে গেলাসে পানি খান বিবি সাহেব সে গেলাস ছোঁনও না..."

"এতদূর!"

"এই বোঝ! মস্ত ভয়ঙ্কর বড় ঘরের মেয়ে—স্বামী হ'লেই বা কি, তাঁর সঙ্গে তুলনায় সে ছোটলোক।"

আবদুল্লাহ্ একটু ভাবিয়া কহিল,—"মহীউদ্দীন সাহেব তো নিতান্ত যে সে লোক নন! বেশ খাস সম্পত্তি আছে, পুরনো জমিদারের ঘর—তার উপর ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট,—এতেও যদি তিনি ছোট লোক হ'লেন, তবে ও বিবি সাহেবের তুল্য স্বামী পেতেন কোথায়? আর যদি এতই ছোটলোক ব'লে ওঁরা বিবেচনা করেন, তবে বিয়ে না দিলেই হত।"

"বিয়ে দিয়েছিলেন মহীউদ্দীনের বাপ অনেক চেষ্টা চরিত্র ক'রে—বড় ঘরে ছেলের বিয়ে দিয়ে কৃতার্থ হবেন, সেইজন্য আর কি! জজ সাহেবও দেখলেন, এমন ছেলে আর পাবেন না, কাজেই তিনি রাজী হয়ে গিয়েছিলেন।"

আবদুল্লাহ্ একটু ভাবিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল,—"বেচারা মহীউদ্দীন সাহেবের জন্যে বড় দুঃখ হয়।"

মীর সাহেব কহিলেন,—"বরাতে দুঃখ থাকলে আর কে কি ক'রবে বল! সে কথা থাক, এখন মালেকার একটা গতি ক'রতে হয় তাই ভাবছি।"

"কি কত্তে চান্?"

"ফের বিয়ে দেবো, মনে কচ্ছি।"

"বিয়ে দেবেন? ছেলে পাবেন কোথায়? বিধবার বিয়ের কথা শুনলে সকলাই শিউরে উঠবে একেবারে!"

"সত্যিই তাই। আমি আলতাফের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করিয়েছিলাম। আলতাফ রাজী আছে, কিন্তু তার বাপ শুনে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিল..."

আবদুল্লাহ্ কহিল, "তা তো উঠবেনই! আমাদেরও ক্রমে হিন্দুদের দশা হ'য়ে উঠল আর কি। ভাল মানুষের, বিশেষ গরীব ভাল মানুষের ঘরে তো আজকাল বিধবাদের বিয়ে হয়ই না।"

মীর সাহেব কহিলেন,—"ও তো হিন্দুদের দেখাদেখি। আর আত্মাভিমানও আছে। বিধবাদের কথা ছেড়ে দাও, কত আইবুড়ো মেয়েরই বিয়ে হচ্ছে না। এই দেখ না, আমাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যেই কত মেয়ের বয়স ত্রিশ বছর পার হ'য়ে গেল, বিয়ে হচ্ছে না। এঁরা সব আলমগীর বাদশার অবতার হয়ে এসেছেন কি না, শাহজাদা পাচ্ছেন না, কাজেই শাহজাদীদের বিয়ে হচ্ছে না!"

আবদুল্লাহ্ কহিল, "আমার শ্বশুর একদিন কার বিয়ের কথায় বলছিলেন, শরীফজাদীর বিয়ের জন্যে আবার এত ভাবনা কেন? না হলেই বা কি?

"চিরকাল আইবুড়ো থাকবে?"

"তাঁর মতে থাকলেও দোষ নেই—পরাকভক্তির ভেলায় চ'ড়ে ভবসিন্ধু পার হয়ে যাবে।"

মীর সাহেব একটু হাসিয়া কহিলেন,—"খোদা করে যেন সব শরীফজাদীই ঐ রকম করে ভবসিন্ধু পার হ'য়ে যান; তা হ'লে শরীফগোষ্ঠী নিপাত হবে শিগ্‌গীর, মুসলমান সমাজও নিস্তার পাবে।"

উভয়ে হাসিতে লাগিলেন। মীর সাহেব আবার কহিলেন,—"দেখ সমাজে বিয়ে-থাওয়া কয়েকটা নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ—তার বাইরে কথা উঠলে মুরুব্বিরা আপত্তি ক'রে বলেন, ওদের সঙ্গে কোন পুরুষে হসব-নসব নেই। অর্থাৎ যাদের সঙ্গে ইতিপূর্বে হসব-নসব হয় নি, তারা যেন সবাই অ-জাত! এই রকম করে কেবল আপনা-আপনির মধ্যে শাদি-বিয়ে অনেক পুরুষ ধ'রে চলে আসছে, আর তার ফলে শারীরিক, মানসিক, সব রকম অধঃপাত হ'চ্ছে। শাদি-বিয়ে যত বাইরে বাইরে হবে, বংশাবলী ততই সতেজ হবে! তাই ব'লে এমন কথা বলিনি যে, ভদ্র ঘরের ছেলে-মেয়ের সঙ্গে জেলে চাষার ছেলে-মেয়ের বে-থা হোক। দেখতে হবে, মানসিক উন্নতি হিসাবে বিশেষ কোন তফাৎ না থাকে। মনে কর, তিন চার পুরুষ যারা চাষা ছিল, আজ তাদের বংশে লেখাপড়ার চর্চা হয়েছে, অবস্থা ফিরেছে, স্বভাব চরিত্র ভাল, বড় বড় সমাজে আমাদের সঙ্গে সমান ভাবে মেলামেশা কচ্চে, তাদের সঙ্গে হসব-নসবে কোন দোষ হ'তে পারে না। এক কালে চাষা ছিল বলে যে রোজ কেয়ামত পর্যন্তই তাদের বংশ দূষিত হ'য়ে থাকবে, তার কোন মানে নেই। আর যারা নতুন উন্নতি কচ্চে, তাদের সঙ্গে রক্তের সংমিশ্রণ হলে আজকালকার শরীফ-জাদাদের নিস্তেজ রক্ত একটু সতেজ হয়ে উঠবে—আর এদের বংশানুক্রমিক উৎকর্ষেরও কিছু ফল ওরা পাবে—সুতরাং উভয় পক্ষেরই লাভ।"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"কিন্তু বিলেতের মত সভ্য দেশের লর্ড ফ্যামিলির লোকেরা সাধারণ লোকের সঙ্গে ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতে চায় না।"

মীর সাহেব কহিলেন,—"জাত্যাভিমান তাদের মধ্যেও আছে। কিন্তু তাদের আছে বলেই যে সেটা ভাল ব'লে মেনে নিতে হবে, তার কোন মানে নেই। যখন দেখতেই পাচ্ছি আমাদের নিজেদের সমাজে এই রকম আপনা-আপনির ভিতর বিবাহের ফল ভাল হচ্চে না, অনেক স্থলেই সন্তান রোগা, নিস্তেজ, বোকা এই রকম সব হচ্চে আর যেখানেই একটু বিভিন্ন রক্তের সংমিশ্রণ হচ্চে, প্রায়ই সেখানে দেখতে পাই সন্তান সতেজ, সবল এবং মেধাবী হ'য়ে ওঠে, তখন আর কোন যুক্তিই মানতে চাই নে। আবার দেখ, মুরুব্বিদের মুখে শুনেছি, সেকালে নাকি বাড়ী বাড়ী লোক-জনে ভরা ছিল ; তাঁরা বলেন, দুনিয়া আখের হ'য়ে এসেছে, তাই এখন সব বিরান হ'য়ে উঠেছে! লোকসংখ্যা যে মোটের উপর বাড়ছে, সেটা তাঁরা খেয়াল করেন না ; শরীফদের ঘর উজাড় হয়ে আসচে, এইটেই কেবল লক্ষ্য করেন। তা উজাড় তো হবেই! মেয়েগুলোকে কেউ কেউ আইবুড়ো করে রাখেন, আর নিতান্তই বে দেন তো সে আপনা-আপনির মধ্যে, যার ফল ভাল হয় না—বিধবা হলে আর বে দেবেন না ; এত করে আশরাফ সমাজে লোক বাড়বে কি করে? এ আশরাফ সমাজের আর মঙ্গল নেই। আর দুই এক পুরুষের মধ্যেই এদের দফা শেষ হবে ; আর এখন যাদের দেখে এঁরা নাক সিটকাচ্ছেন, তারাই তখন মানুষ হ'য়ে তাদের সমাজকেই বড় ক'রে তুল্‌বে।"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"সে কথা ঠিক, ফুফাজান। এই তো দেখ্‌তে পাই, কলকাতার মেসগুলোতে আমাদের এ দিক্‌কার যত ছাত্র আছে, তার মধ্যে আশরাফ সমাজের ছেলে খুবই কম। লেখাপড়া শিখে ওরা যখন মানুষ হবে তখন এঁরা কোথায় থাক্‌বেন?"

"সাএলের দলে গিয়ে ভিড় বাড়াবেন। এখনও যদি এরা জাত্যাভিমান ছেড়ে অন্যান্য উন্নতিশীল সমাজের সঙ্গে হসব-নসব কত্তে আরম্ভ করেন, তা হ'লে এঁদের বংশের উন্নতি হতে পারে। নইলে ক্রমেই অধঃপাত! যাক্ সে কথা—বলছিলাম মালেকার বিয়ের কথা। বাদশা মিঞা তো কিছুতেই রাজী হবেন না। ভাব্‌ছি কোন উপায় কত্তে পারি কিনা। আল্‌তাফ ছেলেটা ভাল ; বি এ পাশ ক'রেছে, ল প'ড়ছে। বারে বেশ শাইন কত্তে পা'রবে। দেখি যদি একান্ত না হয় অন্য কোথাও চেষ্টা কত্তে হবে। তুমিও একটু সন্ধানে থেক, বাবা।"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"জি আচ্ছা, তা দেখবো। তবে আশরাফ সমাজে ছেলে পাওয়া যাবে ব'লে বোধ হয় না..."

"নাই বা হল আশরাফ সমাজে। ছেলে ভাল, সচ্চরিত্র, সুস্থ, সবল—বাস্, আর কোন সিফাৎ চাইনে। ডিপুটি তমিজউদ্দীনের কথা শুনেছ তো? তার বাপ তো সুপারি নারিকেল, তরি-তরকারী মাথায় ক'রে নিয়ে হাটে বেচতেন। ছেলে যখন বি-এ পাশ কল্লে, তখনও তিনি তাঁর নিজের ব্যবসায় ছাড়েন নি। হাই-কোর্টের উকিল আবদুল জলিল ছেলেটাকে ভাল দেখে নিজের কাছে রেখে লেখাপড়া শিখিয়ে ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করে নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। তমিজউদ্দীন মারা গেছেন, তাঁর ছেলে বদরউদ্দীন এখন ওকালতি কচ্ছেন, দিব্বি পসার। দেখ তো, একটা নিম্নস্তরের পরিবারের কেমন ধাঁ ক'রে উন্নতি হ'য়ে গেল! আর ঐ ছেলে যদি ঐ সহানুভূতিটুকুর অভাবে লেখাপড়া শিখতে না পেত তবে বাঙ্গালা দেশে তো আজ একটা উন্নত পরিবার কম থেকে যেত! ওসব শরাফতের মোহ্ ছেড়ে দেও বাবা। ছেলে ভাল পাও, আমাকে এনে দেও, তা সে যেমন ঘরেরই হোক্ না কেন। কেবল দেখা চাই, ছেলেটি সুস্থ, সচ্চরিত্র আর কর্মক্ষম কি না—বাস্...।"

আর লেখা পড়া?"

"হ্যাঁ, সেটা তো চাই..."

"তবে আপনি বংশটা একেবারেই দেখবেন না? মনে করুন এমনও তো হতে পারে যে, ছেলেটি সব বিষয়ে ভাল, কিন্তু তাদের পরিবারের মধ্যে লেখা পড়ার চর্চা নেই, culture নেই, নিম্নশ্রেণীর লোকের মতনই তাদের চাল-চলন—কেবল ছেলেটি লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পেয়ে বি-এ পাশ কত্তে পেরেছে। তার সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিলে তো মেয়েকে নিতান্ত হীন সংস্রবে জীবন কাটাতে হবে..."

মীর সাহেব কহিলেন, "আমি কি আর সে কথা ভেবে দেখিনি বাবা? তেমন ঘরের কথা আমি বলছিনে। অবশ্য তাও দোষের হয় না যদি ছেলেটি তাদের পরিবার থেকে আলাদা হয়ে থাকে—যেমন ধর, তাকে যদি সারাজীবন চাকরীতে বা ব্যবসায় উপলক্ষে বিদেশে বিদেশে কাটাতে হয়। আর তা ছাড়া শিক্ষিত লোকের মধ্যে আজকাল একটা tendency দেখা যাচ্ছে পরিবারের একান্নবর্তীতার সঙ্গে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হয়ে থাকবার দিকে। কাজেই তেমন ক্ষেত্রে তো কোন অসুবিধায় পড়বার কথা নয়। যেখানে পরিবার একান্নবর্তী সেখানে অবশ্য কেবল ছেলে দেখলে চলে না, একথা মানি। তবে কবরের ওপারের দিকে তাকাবার আমি কোন দরকার দেখিনি..."

আবদুল্লাহ্ কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কবরের ওপারে কি রকম?"

মীরসাহেব কহিলেন, "অর্থাৎ যারা আছে, তাদেরই দেখ, তাদের পূর্বপুরুষরা কি ছিল না ছিল দেখবার দরকার নেই..."

আবদুল্লাহ্ কহিল, "তা না দেখলে কি যারা আছে তাদের চরিত্র, চাল-চলন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়?"

"কেন যাবে না? তাদের একটু study ক'রে দেখে নিলেই হল। তাছাড়া তুমি মনে কর "ঘরানা" হ'লেই চরিত্র চালচলন ভাল হবে? স্ত্রীকে ধ'রে মারে এমন হতভাগা শরীফজাদা কি নেই?"

আবদুল্লাহ্ কহিল, "তা তো বটেই।"

"তবে বুঝেই দেখ, যে ছেলেটিকে চাই, তাকে আর তার immediate environment, কেবল এই দেখব ; তার ওদিকে দেখব না...! তুমি একটু ব'স বাবা—বাইরে দুটো লোক বসিয়ে রেখে এসেছি, তাদের বিদায় ক'রে আসি..."

এই বলিয়া মীর সাহেব উঠিয়া বাহিরে আসিলেন এবং কহিলেন, "দেখ বসির তোমার ও টাকা আমি মাফ ক'রে দিলাম। যখন ডুবেছে, তখন তোমারও গেছে, আমারও গেছে। তা যাক্—তুমি কাল এসো; যদি খোদা তোমাকে দেয়, তবে ও টাকা শোধ ক'রো। কিছু টাকা দেব, ফের কারবার ক'রো। এখন রাত হলো, বাড়ীতেও মেহমান। তোমরা আজ এস গিয়ে।"

৩১

সৈয়দ সাহেব যেদিন সালেহাকে বরিহাটি হইতে বাড়ী লইয়া আসেন, সেদিন আবদুল্লাহ্ অন্তরে-অন্তরে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হইলেও মুখে কোন কথাই কহেন নাই। সালেহা যখন বিদায়ের জন্য 'কদমবুসি' করিয়াছিল তখন আবদুল্লাহ্ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়াই ছিল। সালেহা একবার সজল করুণ-দৃষ্টি তুলিয়া আবদুল্লার মুখপানে চাহিতেই আবদুল্লার চোখ দুটি ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। গণ্ড বাহিয়া দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িয়াছিল। সালেহা তাহা দেখিয়া আর সেখানে দাঁড়াইতে পারে নাই। ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। একটু পরেই নিজেকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া সে আবার সেই ঘরে ঢুকিয়াছিল। কিন্তু আবদুল্লাহ্ তখন বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। কাজেই আর সাক্ষাতের সুবিধা হয় নাই।

এই করুণ বিদায়ে সালেহার বুকের ভিতরটায় যেন একবার কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে কম্পন আসন্ন বিরহের ব্যথার কম্পন নহে। তাহার অপেক্ষাও গভীর অজ্ঞাত অকল্যাণের একটা আতঙ্ক-কম্পন। স্বতঃই তাহার মনে হইয়াছিল, কোথাও কি যেন বাকী রহিয়া গেল। কি যেন প্রাণের বস্তুকে এইখানেই বিসর্জন দিয়া গেল। বরিহাটিতে কিছুদিন এক সঙ্গে বাস করার ফলে সালেহা যেন একটু বদলিয়া গিয়াছিল। পিতার আদেশ অমান্য করার মত শিক্ষা বা মন তাহার ছিল না তাই ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাহাকে পিতার অনুবর্তিনী হইতে হইয়াছিল।

যাহা কউক, ১০০ টাকা বেতনে হেড মাষ্টার হওয়ার সংবাদ পাইয়া আবদুল্লাহ্ মনে মনে ঠিক করিয়া ফেলিল যে রসুলপুর পৌছিয়াই সে সালেহাকে তথায় আনিয়া তাহার মন মত

করিয়া শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিবে। বরিহাটিতে সালেহার কথাবার্তায় এবং চলাফেরায় আবদুল্লার বেশ প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, হয়ত শিক্ষা দিলে সালেহা তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে।

স্কুলের কাজ-কর্ম ভালরূপ বুঝিয়া পড়িয়া লইয়া আবদুল্লাহ্‌এ সম্বন্ধে মীর সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আগামী বড় দিনের বন্ধে সালেহাকে লইয়া আসাই সাব্যস্ত করিয়া ফেলিল।

আবদুল্লার মা মীর সাহেবের বাড়ীতে থাকিতে কখনই রাজী হইলেন না ; কারণ মীর সাহেব সুদের সংস্রবে আছেন। অতএব সাব্যস্ত হইল যে, মীর সাহেবের একটি রায়তের বাড়ীর সীমানায় বিঘা খানেক জমি আবদুল্লাকে দেওয়া হইবে। শীঘ্রই সেখানে ঘর-দরজা তৈয়ার করিয়া একটি ছোট বাসা নির্মিত হইল।

মায়ের অনুমতি ব্যতিরেকে কিছুই করা উচিত হইবে না তাই স্কুল বন্ধ হইবার দিনই সন্ধ্যায় রওয়ানা হইয়া পরদিন দ্বিপ্রহরে আবদুল্লাহ্ আসিয়া পীরগঞ্জে পৌছিল। পুত্র বি-এ পাশ করিয়া এখন ১০০্ টাকা বেতনের চাকরী পাইয়াছে, ভবিষ্যতে, ৪০০/৫০০্ টাকা বেতনের আশা আছে। আজ আবদুল্লাহ্ বাড়ী পৌছায় তার মুখচন্দ্রের পানে চাহিয়া আবদুল্লার মার প্রাণ আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল, তার বুক গর্বে ও আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিল। আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েও বুঝি কোন মানুষের এতখানি হয় না। আজীবন অভাব অনটনে কাটিয়াছে। কত সাধ কত আশা অঙ্কুরেই শেষ হইয়াছে। শৈশবের, কৈশোরের, যৌবনের কত অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি জ্বলন্ত চিত্র চকিতে তাঁহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর কথা মনে পড়িল। তাঁর আজিকার এই আনন্দে ভাগীদার কোথায় কোন অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছেন। ভাগ লইতে আসিতেছেন না। আবদুল্লার জননীর দুই চোখ চাপাইয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। যথাসাধ্য নিজেকে সংযত করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে তিনি কহিলেন,—"ভালো আছতো বাবা, বৌমাকে আর হালিমাকে নিয়ে এলে না কেন?"

আবদুল্লাহ্ উত্তর করিল,—"সে পরামর্শ হবে এখন পরে।"

সম্মুখে বসিয়া আদর করিয়া, আহার করাইয়া, নিজ হাতে বিছানা পাতিয়া আবদুল্লাহ্‌কে বিশ্রাম করিবার অবসর দিয়া জননী নাশ্‌তা ইত্যাদির বন্দোবস্তে লাগিয়া গেলেন।

পরদিন অপরাহ্নে আবদুল্লাহ্ মাকে বলিল,—"তা হ'লে এক কাজ করলে হয় না—চলুন না আম্মা, আপনাদিগকে রসুলপুরে নিয়ে যাই।"

মা কহিলেন,—"তাই তো ভাবছি, তোমার সেখানে খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা হচ্ছে, তা আমার তো যেতেই মন চায়, তবে গেলে ঘর দোর দেখবে কে, সেই কথাই ভাবছি। গেলে তো করিমনকেও নিয়ে যেতে হয়।"

আবদুল্লাহ্ কহিল, "সেই তো কথা, তবে যদি বলেন তো আপনাদের বউকে সেখানে নিয়ে যাই।"

আবদুল্লার জননী কহিলেন,—"বৌমা তো ছেলে মানুষ, একলা থাকবে কেমন করে। তবে এক কাজ করলে হয় না ; ঐ যে গোলাপের মা, ওকে বাড়ী রেখে গেলে ও দেখা শুনা করবে।

শেষে এই কথাই সাব্যস্ত হইল।

যথাসময় মাতাসহ একবালপুরে পৌছিয়া সালেহা ও হালিমাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করা হইল।

সৈয়দ সাহেব হালিমার যাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আপত্তি করিলেন না, তাহার প্রথম কারণ হালিমা অন্য বংশের মেয়ে। দ্বিতীয় কারণ আবদুল কাদেরকে তো তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। হয়ত শেষ পর্যন্ত আবদুল কাদের তাঁহার মর্যাদা রক্ষা করিবে না। কিন্তু সালেহার সম্বন্ধে তিনি ঘোর আপত্তি করিয়া বসিলেন। প্রথম কারণ সৈয়দ সাহেব মীর সাহেবের সংস্রবে আসাটা শুধু অপমানজনক নয়, ধর্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন এবং আবদুল্লাহ্ এখন সেই মীর সাহেবেরই একজন ভক্ত এবং সদাসর্বদা মীরের সঙ্গে ওঠা-বসা, মীরের পরামর্শে সব কাজ-কর্ম করিয়া থাকে। সৈয়দ সাহেবের আন্তরিক বিশ্বাস যে, মীর সাহেব মুসলমান থেকে খারিজ

হয়েছেন এবং শরীফ ঘরের মুসলমানদের উচিত অন্ততঃপক্ষে তাঁর সঙ্গে তরকে মাওয়ালাত (নন্-কো-অপারেশন) করা।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বাদ মগরেব আবদুল্লাকে ডাকিয়া লইয়া সৈয়দ সাহেব বেশ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ব'স, বাবা"। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সৈয়দ সাহেব বলিলেন,—"তা বাবা, আমি একটা খোলাসা কথা ব'লব। তোমরা যে যাই বল না কেন, আমি ওসব কারবারে নেই। আমি সালেহাকে রসুলপুর যেতে দেব না। ওর আখেরাতের দিকে আমার তো দেখা চাই। তোমরা আজকাল শরা-শরীয়ত একদম্ উড়িয়ে দিয়েছ। হারাম-হালাল মান না। তা যাই হোক সব চুলোয় যাক্। ওদিকে, বাবা, ঐ যে মীর সাহেব লোকটার সঙ্গে তোমাদের অত মাখামাখি কেন? বলি তোমরাও কি সুদ খাবে নাকি। আস্তাগফেরউল্লাহ্, কি মুস্কিলেই যে আমি প'ড়েছি। এই সব কিস্‌মতে ছিল! তা'ছাড়া আরও একটা কথা বাবা, নিয়ে যেতে চাচ্ছ, যাবে কেমন ক'রে। এখন তো নৌকা চলবে না।"

আবদুল্লাহ্ মৃদু কণ্ঠে কহিল,—"ওদের রেল গাড়ীতেই নিয়ে যাব। ষ্টেশন থেকে পাল্কীর বন্দোবস্ত আছে, এতে কোন কষ্ট হবে না। তা ছাড়া সময়ও লাগবে কম।"

সৈয়দসাহেব রেলগাড়ীর কথা শুনিয়া একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"তা বাবা সবই বলতে পার, কিন্তু আমাদের খানদানে কোনও যানানা কখনও এ পর্যন্ত রেলে চড়েনি, আর আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন চড়তে দেবারও আমার ইচ্ছা নাই। সে হবে না বাবা হাজার লোক ষ্টেশনে, তার মধ্যে দিয়ে রেলে চড়িয়ে আমার মেয়েকে নিয়ে যাবে? এ কথা মুখে আনতেই যে আমাদের বাধে। তোমরা ইংরেজী শিখেছ, ইংরেজের চাল-চলন অনুকরণ করতে চাও। তা আমি আর কদিন। এই কটা দিন সবুর কর, পরে যা হয় কর।"

আবদুল্লাহ্ বুঝিল কথা কাটাকাটিতে ফল হইবে না। সে রণে ভঙ্গ দিয়া বলিল, "তা হ'লে হালিমাকে..."

সৈয়দ সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ, বৌমাকে নিয়ে যাওয়ার কথা, আবদুল কাদের মিঞা তো বাড়ীই আছেন, তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা হয় কর, আমি ওর মধ্যে নেই। সেবারে বরিহাটির কত কি কাণ্ড-কারখানা, সে সবই তো সয়েছি।"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"আবদুল কাদের সম্মত আছে। আপনার তো কোনও আপত্তি নাই?"

সৈয়দ সাহেব,—"না, আমার আর কি আপত্তি। সে রাজী যখন তখন আমার আপত্তির কারণ কি?"

মস্‌জিদে আযানের শব্দে সৈয়দ সাহেব নামায পড়ার জন্য উঠিয়া পড়িলেন, আবদুল্লাহ্ পিছনে পিছনে নামায পড়িবার জন্য মস্‌জিদে ঢুকিল।

নামায বাদ আবদুল্লাহ্ বাড়ীর ভিতর গিয়া মাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল, মা একটু দুঃখিত হইলেন; কহিলেন,—"তবে কাল সকালেই হালিমাকে নিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত।"

সৈয়দ সাহেব মসৃজিদের রোয়াকে বসিয়া আবদুল কাদেরকে বলিলেন, "ওঁরা কবে যাচ্ছেন।"

আবদুল কাদের,—"তা তো ঠিক জানি না!"

সৈয়দ সাহেব,—"তা হ'লে বৌমাও যাচ্ছেন রসুলপুরে।"

আবদুল কাদের,—"জি হ্যাঁ, তাই তো ওঁদের ইচ্ছা।"

সৈয়দ সাহেব একটু উষ্ণভাবে বলিলেন,—"ওঁদের ইচ্ছা, তোমার কি? তোমারও ইচ্ছা না! এখন নৌকা চলে না জানা আছে তো, রেলে চড়িয়ে নিয়ে যাবে।"

আবদুল কাদের,—"আমার তো কোনও আপত্তি নাই।"

সৈয়দ সাহেব একটা বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—"বেশ"।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ—একটু পরে সৈয়দ সাহেব দহলিজে চলিয়া গেলেন। আবদুল কাদের বাড়ীর ভিতর আবদুল্লার কাছে সমস্ত বিষয় শুনিল।

পরদিন প্রত্যূষেই আবদুল্লাহ্ মাতা, ভগ্নী হালিমা এবং করিমনকে লইয়া রসুলপুর যাত্রা করিল।

৩২

মজিলপুর একটি পুরাতন ও বিখ্যাত স্থান। এখানকার রেজিস্ট্রী আপিসটিও বেশ বড়। এখানে বহু রেজেস্ট্রী হয়। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে তখন সবরেজিস্ট্রারগণ রেজিস্ট্রীকৃত দলিলের সংখ্যা হিসাবে কমিশন পাইতেন। আবদুল কাদের বরিহাটী জয়েন্ট অফিসে বেশ যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়া ডিষ্ট্রীক্ট রেজিস্ট্রারের সুনজর আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এক্ষণে মজিলপুরের সবরেজিস্ট্রারের পদোন্নতি হওয়ায় তিনি অন্যত্র চলিয়া গেলে আবদুল কাদের মজিলপুরে বদলি হইয়া আসিল। হালিমাও সঙ্গে আসিল। এখানে তাহার মাসিক আয় ২৫/৩০ টাকা বাড়িয়া গেল। তা ছাড়া এখানে একটি মাদ্রাসা ছিল। একমাত্র শিক্ষার অভাবই যে সমাজের সমস্ত দুরবস্থার কারণ ইহা আবদুল কাদের মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিল। মজিলপুরে আসিয়া মাদ্রাসার সাহায্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাহার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করার সুযোগ পাইবে মনে করিয়া তাহার প্রাণ হর্ষে নাচিয়া উঠিল।

আবদুল মালেকের খালাত' ভাই ফজলুর রহমানের পিতা মজিলপুর মাদ্রাসার সেক্রেটারী ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় আবদুল কাদের মাদ্রাসার সেক্রেটারী নির্বাচিত হইল।

পীর সাহেবের দোওয়া, তাবিজের বরকতে যখন ফজলু মিঞা ডেপুটীগিরির স্বপ্ন দেখিতেছিল, তখন হঠাৎ একদিন "দি বেঙ্গলী'তে প্রবেশনারী ডেপুটির লিষ্টে ফজলু মিঞার নাম না পাইয়া ফজলু মিঞার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। ফজলু কিন্তু দমিবার পাত্র নয়। সে ভাবিল হিন্দু কাগজওয়ালা বদমাইশি করিয়া তাহার নামটি ছাপে নাই। তারপর সে কলিকাতা গেজেটের সন্ধানে ছুটিল। গেজেটেও নাম পাওয়া গেল না। ব্যাপার কি? তবে কি পীর সাহেব দোওয়া করেন নাই? না, তাও কি সম্ভব? ফজলু ছুটিয়া পীর সাহেবের খেদমতে হাজির হইল। পীর সাহেব ইতিমধ্যেই খবর পাইয়াছিলেন যে ফজলু ডেপুটী কি সব-ডেপুটী কিছুই হইতে পারে নাই। 'কদমবুসি' সম্পন্ন করিয়া ফজলু একপাশে বিষণ্ন মনে বসিয়া পড়িল। পীর সাহেব কহিলেন,—"আয় লড়কা আব্ তুক্ তু গাফেল হ্যায়।" ফজলুর হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল পীর সাহেব তাকে যে এশার নামাযের বাদ ১১০০০ বার একটি দোওয়া পড়িতে বলিয়াছিলেন, কয়েকদিন যাবৎ সেটা ফজলু পড়িতে পারে নাই। তা ছাড়া অনেক দিন ঘুম ভাঙ্গিতে বিলম্ব হওয়ায় ফজরের নামাযও তার কাযা পড়িতে হইয়াছে। ফজলু মনে মনে পীর সাহেবকে সন্দেহ করিয়াছিল। তার দরুন তার মনে ভীষণ অনুশোচনা জন্মিল। সে উঠিয়া গিয়া আবেগ ভরে পীর সাহেবের পায়ের উপর পড়িল। সে মনে মনে আশা করিতেছিল পীর সাহেব ইচ্ছা করিলে তখনও তার চাকুরীর উপায় হইতে পারে।

পীর সাহেব মৃদুকণ্ঠে কহিলেন,—"সবর্ করনা চাহিয়ে, আব লাড়কা, এক শরীফজাদী বহুত হাসীন, আওর নেহায়েৎ নেক্‌বখত; উস্‌কে সাত মোতহারী শাদী মোবারক। এহাঁ ওজর করনে কা মোকাম নেহি হ্যায়। আগার মুঝসে ছোপানা নেহি। আলাওয়া ওসকে জেমীদারী ভী খুব হ্যায়। জেমীদারীসে কোয়ে দস্-বারা হাজার রূপায়াকী আমদানী হ্যায়।"

পীর সাহেবের প্রতি ফজলুর ভক্তি অচল। পীর সাহেবের আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইয়া ফজলু যখন সত্য সত্যই এই বিবাহের জন্য বাপ মায়ের অনুমতি লইয়া আসিল, তখন বিবাহে আর কোনো বাধাই রহিল না। যথাসময়ে শুভকার্য সম্পন্ন হইয়া গেল। ফজলু মিঞার এখন আর্থিক কোন কষ্টই রহিল না। পীর সাহেবের মেহেরবানিতে খাওয়াপরার ভাবনা পার হইয়া ফজলু দশগুণ উৎসাহে পীরের খেদমতে নিযুক্ত হইল। পাঁচ ওয়াক্ত নামায, দো'য়া দরুদ, মহফেলে মৌলুদ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে কোনও ত্রুটি নাই। যাকাতের হিসাবের জন্য একজন মুহুরিই

নিযুক্ত হইয়া গেল। এসব বিষয়ে কোন দিকে ত্রুটি রহিল না বটে কিন্তু আদায়পত্র ইত্যাদি সমস্তই কর্মচারীদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

কয়েক মাস পরের কথা। পিতৃবিয়োগের সংবাদ পাইয়া ফজলু মিঞা সস্ত্রীক পিতার ফাতেহার জন্য বাড়ী আসিয়াছেন। এই উপলক্ষে পীর সাহেবকেও দা'ওৎ করা হইয়াছিল। আবদুল কাদেরকে দা'ওৎ করার জন্য যখন ফজলু মিঞা আবদুল কাদেরের বাসায় আসিয়াছিলেন তখন মদ্রাসা সম্বন্ধে তাঁদের সঙ্গে বহু আলাপ হইয়াছিল। আবদুল কাদের মদ্রাসার ছাত্রদিগকে কিছু ইংরাজী, বাংলা ও অঙ্ক শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করিলে ফজলু মিঞা একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। সে কি কথা, তাও কি হয়! যেখানে দীনী এলেম শেখান হয়, সেখানে এই সব দুনিয়াদারী একদম অপ্রাসঙ্গিক।" অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ফজলু মিঞা কহিলেন, "আচ্ছা কালই পীর সাহেব আসছেন, তাঁর সঙ্গে একবার আলাপ করলেই আপনি আপনার ভুল বুঝতে পারবেন। ওসব খেয়াল আপনি মন থেকে দূর ক'রে ফেলুন। এই দেখুন না হাতে হাতে। আমি একবার চাকরীর জন্যে মস্ত হ'য়ে পড়েছিলাম। অনেক সময় আমার নামায কাযা হ'য়েছে। এখানে দৌড়, ওখানে লাফ্ এইসব ক'রে আমার যে কি সর্বনাশ হচ্ছিল, তা খোদাই জানেন। কিন্তু পীর সাহেবের শরণাপন্ন হ'য়ে আমার এখন কোনো চিন্তাই নাই। খোদার কাজ করলে খোদা রুজি জুটিয়ে দেবেই। আমি দেখুন ইংরাজী পড়তে গিয়ে কি ভুলই করেছি। আগে থেকে যদি পীর সাহেবের শরণাগত হতাম তা'হলে আমার কেসমত আরো ভাল হ'ত। যাক, এখন আসি একবার, মেহেরবানি ক'রে গরীব খানায় তশরীফ আনবেন। ওয়ালেদ মরহুমের কথা মনে হ'লে আর কিছুই ভাল লাগে না। তাঁর শেষ কাজটা যাতে সুসম্পন্ন হয় তার জন্য আপনাদের পাঁচ জনের সাহায্য চাচ্ছি। আশা করি নাওম্মেদ হব না।"

এই লম্বা বক্তৃতা দিয়া আবদুল কাদেরকে স্তম্ভিত করিয়া যথারীতি সালাম সম্ভাষণ পূর্বক ফজলু বিদায় গ্রহণ করিল।

পরদিন মজিলপুরে মহা ধূম পড়িয়া গেল। এক প্রকাণ্ড বজরা নদীবক্ষ বাহিয়া মৃদু মন্থরগতিতে মজিলপুরের দিকে অগ্রসর হইতে দেখা গেল। প্রায় একশত লোক ঘাটে উপস্থিত।

এহেন ভাগ্য মজিলপুরে কোনদিন ঘটিয়াছিল কি না সে সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনায় বাধা জন্মাইয়া যখন ঘণ্টাখানেক পরে পীরসাহেবের বজরা ঘাটে ভিড়িল তখন সমস্বরে "মারহা'বা মারহা'বা" রবে উপস্থিত জনমণ্ডলী গগনমণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিল।

ফজলুর পরলোকগত পিতার ফাতেহা উপলক্ষে লক্ষ্ণৌ হইতে একজন বাবুর্চি আনা হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে কয়েকজন মেট এবং বাবুর্চির সঙ্গেও ২ জন মেট আসিয়াছিল। আশে-পাশের গ্রামের মধ্যে যারা পাকপ্রণালীর সঙ্গে পরিচিত ছিল, ফজলু মিঞা তাদেরও আনাইয়াছিলেন। ফাতেহার দা'ওৎ আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে ছিল সকলেই পাইয়াছিল। গরীব দুঃখী সংবাদ পাইয়া যে যেখানে ছিল আসিয়া জুটিতেছিল। ফাতেহা উপলক্ষে যেয়াফাত শেষ হইয়া গেলে পীর সাহেব যে কয়দিন মজিলপুরে ছিলেন ও অঞ্চলের বহু ভক্ত নানা কাজ ফেলিয়া পীর সাহেবের সহিত কেহ দেখা করিতে, কেহ মুরীদ হইতে, কেহ পানি পড়াইয়া লইতে কেহ তাবিজের জন্য আসিয়া গ্রামের রাস্তা ঘাট ভরিয়া ফেলিয়াছিল। এমন বিরাট আয়োজন এবং এত জন-কোলাহল দেখিয়া পীর সাহেবের বুজরগী সম্বন্ধে কোন সংশয় রহিল না।

সে দিন রাত্রে পীর সাহেবের বজরায় একটু উত্তেজনার আভাস পাইয়া কয়েকজন খাদেম একটু বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ব্যাপার কি জানিবার জন্য উদ্গ্রীব জনমণ্ডলী, এ-ওর মুখের দিকে তাকাইতে আরম্ভ করিলেন। পীর সাহেব ফজলু মিঞার কয়েকজন আত্মীয়াকে 'মুরীদ' করিবার জন্য বজরা হইতে নামিয়া পাল্কী করিয়া ফজলু মিঞাদের বাড়ী গিয়াছিলেন। তথা হইতে এই মাত্র ফিরিয়া আসিয়াছেন। ফজলু মিঞা অদূরে মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া আছেন। সকলে চুপ! কিছুক্ষণ পরে পীর সাহেব এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন— "উওহ সব মিস্ত্রিয়োঁকা কাম হ্যায়, শরীফোঁকা কাম নেহী।"

ফজলু মিঞা পীর সাহেবের মন্তব্য শিরোধার্য করিয়া লইয়া মৃদু কণ্ঠে বলিলেন,—"জি হাঁ হুজুর, উওহ সব সে আখেরাতকা কোয়ী ফায়দা নেহী হোগা।"

ব্যাপার আর কিছুই নয়; পীর সাহেব যখন ফজলু মিঞাদের বাড়ীতে গিয়াছিলেন সেই সুযোগে ফজলু মিঞার সাহায্যে আবদুল কাদের পীর সাহেবের খেদমতে হাজির হইয়াছিল। যথাবিহিত 'কদমবুসি' সম্পন্ন করিয়া আবদুল কাদের বিনয়নম্র বচনে পীর সাহেবের খেদমতে মদ্রাসার সংস্কারের কথা পাড়িয়াছিল। পীর সাহেব আবদুল কাদেরের প্রস্তাবে মর্মাহত হইয়া শুধু বলিলেন,—"ইয়ে সব দুনিয়াদারী মামলাত সে হাম লোগ ফারেগ রহ্না চাহ্তে হ্যাঁয়। মেরা খেয়ালমে মদ্রাসা দীনী এলেম কা ওয়াস্তে হ্যায়। আংরেজী আওর বাংলা, আওর ইয়ে সব তো আংরেজী স্কুল মে পড়াহায়ি জাতি হ্যায়, বাবা।"

আবদুল কাদের বিনয়নম্র বচনে আরজ করিল,—"হুযুর লোগ সব গোমরাহ্ হোতে চলা হ্যায়। আওর জারা-সা হেসাব না জান্নে সে মহাজন আওর জমীনদার লোক গরীববোঁ পর বড়া জুলুম করতে হ্যাঁয়। লোগ সব ভুকা মর রহেঁ হ্যাঁয়। এনলোগুঁকো জেন্দেজীকে ওয়াস্তে কুছ্ আংরেজী আওর হেসাব জান্না জরুরী হ্যায়।"

পীর সাহেব উর্ধ্বে আঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক কহিলেন,—"দীন ইসলামকো আগে বাঁচানা চাহিয়ে। জেন্দেগীকো ওয়াস্তে খোদওন্দ করিম পর তওয়াক্কল করনা ওয়াজেব হ্যাঁয়! রাজ্জাককো ভুলকে রোজীকা বন্দোবস্ত হো নে-হী সাক্তা। খায়ের ইয়ে সব তকরার সে কুচহী ফায়দা নেঁহী নেকলেগা।"

আবদুল কাদের রণে ভঙ্গ দিয়া পীর সাহেবের 'কদমবুসি' সম্পন্ন করিয়া বিদায় হইয়া গেল; পীর সাহেব বড়ই নারায হইয়া বজরায় চলিয়া গেলেন এবং পর দিনই মজিলপুর গ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক চলিয়া গেলেন।

পীর সাহেব চলিয়া যাওয়ার পর আবদুল কাদের একটি মিড্ল মদ্রাসা স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। চারিদিকে ঘোর আপত্তি হওয়ায় অবশেষে মদ্রাসার জন কয়েক ছাত্রকে নিয়া একটু একটু ইংরাজী শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিতে সক্ষম হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিল।

৩৩

নৌকা চলে না, রেলগাড়ীতে চলা-ফেরায় বেপরদা—এই অজুহাতেই আবদুল্লার শ্বশুর সালেহাকে রসুলপুর পাঠান নাই। গ্রীষ্মের বন্ধেও নৌকা চলিবে না। কাজেই তখনও তিনি সেই অজুহাত ধরিয়া বসিলেন। অতএব আবদুল্লাহ্ স্থির করিয়া লইল গ্রীষ্মের বন্ধে একবার শ্বশুরবাড়ী যাইয়া দেখাশুনা করিয়া আসিবে। তাহার পর পূজার বন্ধে নৌকা চলাচল আরম্ভ হইলে সালেহাকে লইয়া আসিবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠিল না। কারণ স্কুলের লাইব্রেরীর পুস্তকগুলি বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল, সেগুলিকে শৃঙ্খলা মত সাজাইতে গিয়া গ্রীষ্মের বন্ধে তাহার আর রসুলপুর ত্যাগ করা ঘটিয়া উঠিল না।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। পূজার বন্ধও ঘনাইয়া আসিল। এ যাবৎ একবালপুরের কোন খবর না পাওয়ায় আবদুল্লার মন কেমন অজানা আশঙ্কায় অস্থির ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। চিঠিপত্র লিখিয়া উত্তর পাওয়াও সহজ ব্যাপার নয়। কারণ ওবাড়ীতে এক আবদুল কাদের ভিন্ন প্রায় সকলেই দোয়াতে কলম দান ব্যাপারটাকে গর্হিত মনে না করিলেও সহজ মনে করিতে শিখে না। প্রায় ৬ মাস পরে ভাদ্রমাসে ৪ঠা তারিখে একখানা পত্র আসিল। কাল কালির লেখা দুঃসংবাদ আবদুল্লার হৃদয়ে কাল দাগ আঁকিয়া দিল। আসন্নপ্রসবা সালেহার আসন্ন মৃত্যুর সংবাদে আবদুল্লার হৃদয়ে শেল বিঁধিল।

আহার ও নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গরুর গাড়ীর ঝাঁকানি সহ্য করিয়া কাদা ও বৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া আকাশের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করিয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া জুতা হাতে নগ্নপদে আবদুল্লাহ্ যখন

একবালপুরে পৌছিল তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। সাদা লংক্লথে মোড়া খট্টাশায়ী কাষ্ঠখণ্ডবৎ দেহখানির মস্তকাবরণ উঠাইয়া তাহাকে দেখানো হইল। সেই মুখ—কিন্তু কি পরিবর্তন! শীর্ণ পাণ্ডুর রক্তলেশপরিশূন্য আঁখিপল্লব নীমিলিত ঈষদুম্ভিন্ন অধরোষ্ঠ—কি যেন বলিতে চায়, অথচ বলিতে পারে না। আবদুল্লার মর্মতলে মৃত্যুশেল বিঁধিল। তাহার মুখে কথা ফুটিল না। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে দফন ক্ষেত্রের দিকে চলিয়া গেল।

৩৪

ভগ্ন হৃদয়ে আবদুল্লাহ্ কর্মস্থলে ফিরিল। মীর সাহেব আদ্যোপান্ত সকল সংবাদই শুনিলেন। আবদুল্লার মনে একটা যে বৈরাগ্যের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে ; তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু সে ভাবকে আদৌ তিনি প্রশ্রয় দিলেন না। নানা প্রকারের সান্ত্বনা দিয়া তিনি আবদুল্লাকে পুনরায় কর্মক্ষেত্রের মাঝে টানিয়া আনিলেন।

আবদুল্লাহ্ মীর সাহেবের আদেশ-অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না। সে আবার যথারীতি স্কুলের কার্যে মনঃসংযোগ করিল। এই সময়ে হঠাৎ একদিন একবালপুর হইতে সৈয়দ সাহেবের এক পত্র আসিয়া পৌছিল। পত্রে সৈয়দ সাহেব মোহরানার দাবী করিয়াছেন।

আবদুল্লার পিতা ওলিউল্লার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে সৈয়দ সাহেব নারায-ই ছিলেন। শুধু মাতার অনুরোধেই তিনি সম্মত হইয়াছিলেন। এদিকে সৈয়দ সাহেব যখন ২৫০০০৲ টাকার মোহর দাবী করিয়া বসিলেন, বড় ঘরে বিবাহ দিবার আগ্রহে আবদুল্লার পিতা রাজী হইয়া গেলেন। আবদুল্লাহও তখন এ গুরুত্ব বুঝিতে পারে নাই। কারণ সাধারণতঃ এই মোহরানা একটা অর্থশূন্য প্রথা বলিয়া বিবেচিত হয় এবং বাস্তবিক পক্ষে যদি সৈয়দ সাহেবের অবস্থার পরিবর্তন না হইত তবে এ সম্বন্ধে তাঁহারা যে কোন দাবী করিতেন এরূপ মনের ভাব বোধ হয় সৈয়দ সাহেবেরও ছিল না। কিন্তু নানা কারণেই সৈয়দ সাহেবদের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল। এমন অবস্থায় হক্কের দাবী ছাড়িয়া দিবেন এমন অবিবেচক বলিয়া সৈয়দ সাহেবকে দোষারোপ করা চলে না।

পিতার বর্তমানে কন্যার মৃত্যু হইয়াছে সুতরাং সম্পত্তির কোনও ভাগ কন্যাতে বর্তায় নাই। এমন অবস্থায় মোহরানার টাকার দাবী ন্যায্য দাবী। কন্যার অবর্তমানে জামাতা যে শ্বশুরকে ঠকাইবার চেষ্টা করিতে পারে এ ভয়ও সৈয়দ সাহেবের ছিল ; তাই তিনি চিঠিতে জানাইয়াছিলেন যে, সহজে টাকা না দিলে আদালতে নালিশ করা হইবে; তিনি হক্কের দাবী ছাড়িয়া দিতে কিছুতেই পারিবেন না। তিনি আরও লিখিয়াছিলেন যে, যদি আদালতে নালিশ করেন তবে ডিক্রী নিশ্চয়ই হইবে এবং আবদুল্লার মোকদ্দমা খরচ বাবদ কিছু টাকা অনর্থক দণ্ড দিতে হইবে।

এই পত্রের উত্তরে আবদুল্লাহ্ সবিনয়ে জানাইল যে, এক সঙ্গে অত টাকা দেওয়া তার সাধ্যাতীত কিন্তু সে কিস্তি করিয়া টাকা পরিশোধ করিতে সম্মত। প্রত্যুত্তরে সৈয়দ সাহেব জানাইলেন, যে, তাঁর এত টানাটানি তা বলিবার নয় ; টাকার বড় দরকার। সুতরাং তিনি বিলম্ব করিতে অক্ষম।

অগত্যা আবদুল্লাহ্ তাহার পৈতৃক সম্পত্তি বন্ধক দিয়া টাকা পরিশোধের কথা ভাবিতে লাগিল। কিন্তু সম্পত্তি কি আর ছিল! দেখা গেল যে—বন্ধক কেন, বিক্রী করিলেও সে অত টাকা সংগ্রহ করিতে অক্ষম! আবদুল্লাহ্ বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িল!

চাকুরী করিয়া আবদুল্লাহ্ মোট ১০০০৲ টাকা জমাইয়াছিল। অনেক চিন্তার পর সেই টাকা এবং সমস্ত সম্পত্তি বন্ধক দিয়া আরও ৮০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া একত্রে ১৮০০৲ টাকা সে সৈয়দ সাহেবকে পাঠাইয়া দিল। কিন্তু ইহাতে সৈয়দ সাহেব একটুও সন্তুষ্ট হইলেন না।

মীর সাহেব ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। মাঘ মাসের পূর্বে বাড়ী ফিরিবেন না। আবদুল্লাহ্ বড়ই চিন্তায় দিন কাটাইতে লাগিল। যাহা হউক, মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহেই মীর সাহেব বাড়ী ফিরিলেন এবং সমস্ত সংবাদ জানিয়া অগত্যা তিনিই আবশ্যক টাকা কর্জ দিতে চাহিলেন। আবদুল্লাহ্ অগত্যা তাহাতেই স্বীকৃত হইল এবং বিনা দলিলে ১০,০০০/- টাকা কর্জ করিয়া স্বয়ং একবালপুরে গিয়া সৈয়দ সাহেবের হস্তে দিয়া আসিল। সৈয়দ সাহেব তখনই একখানা রসিদ লিখিয়া দিলেন। আবদুল্লাহ্ মীর সাহেবের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে এ কথা সৈয়দ সাহেব অবগত ছিলেন। সুদের টাকা লওয়া জায়েয কিম্বা না-জায়েয এ সম্বন্ধে তর্ক উঠিতে পারে এবং সৈয়দ সাহেব উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া জানিয়াছিলেন যে, ২৫০০০্ টাকা দেওয়া আবদুল্লার পক্ষে একেবারে অসম্ভব সুতরাং আদালত হয় তো অত টাকা ডিক্রী দিবে না। এতদ্ভিন্ন সংসারে আজকাল টানাটানি একটু বেশীই হইয়াছে। সৈয়দ সাহেব যা টাকা পাইলেন তাহাতেই রাজী হইয়া সম্পূর্ণ টাকার রসিদ লিখিয়া দিলেন। টাকা প্রাপ্তির পর সৈয়দ সাহেব আবদুল মালেককে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন,—"তোমার ঐ ছেলেটার খাৎনার কথাই ভাবছি। আবদুল্লার নিকট যে টাকাটা পাওয়া গেছে তার কিছুটা হাত কর্জ শোধ দিতে যাবে। আর কিছু টাকা দিয়ে খাৎনার খরচটা চলে যাবে!"

আবদুল মালেক মনে মনে ভাবিয়াছিল, ঐ টাকাটা দিয়া রসুলপুর ও মাদারগঞ্জ তালুকটার—যা ভোলানাথ বাবুর নিকট বন্ধক ছিল, সেটা খালাস করিয়া লওয়া যাইবে। সে বলিল—"তা আব্বাজান ধরুনগে" আপনার ঐ তালুক দুটো খালাস করে নেওয়া তো দরকার।"

সৈয়দ সাহেব বলিলেন,—"বাবা, আমি আর কদ্দিন, যে ক'দিন আছি খোদা এদের দেছেন, এদের নিয়ে একটু আমোদ-আহ্লাদ করে যাই, তোমরা তো রইলে।"

আবদুল মালেকের পুত্রের খাৎনার দিন স্থির হইয়া গেল। খাৎনা উপলক্ষে সৈয়দ সাহেব কিছু ধুম-ধামই করিয়া বসিলেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা আজকাল ভাল ছিল না। এই হয়ত তাঁর জীবনের শেষ কাজ। সুতরাং যাতে বংশমর্যাদা বজায় থাকে এরূপ ভাবে লোকজনকে খাওয়াইবার ভাগ্য হয় তো তাঁর আর জুটিবে না। যে যেখানে ছিল সবাইকে দা'ওৎ দেওয়া হইল। বরিহাটি হইতে সওদা আনা হইল। বাবুর্চি খানসামা বাড়ীতে যারা ছিল তাদের দ্বারাই পাকের বন্দোবস্ত হইল! নির্দিষ্ট দিনে বহু লোক তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করিয়া বলিল, এমন খানা তারা জীবনে কখনও খায়ওনি, খাইবেও না। অবশ্য ঠিক এই ভাবের কথা তারা এই সৈয়দ সাহেবের বাড়ীতে আরও বহুবার বলিয়াছে। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া ভোলানাথ বাবু কহিলেন, "হবে না কেন ? সৈয়দদের মত বড় বংশ তো আর এ অঞ্চলে নাই। এঁরাই ত এতকাল নবাব ছিলেন।"

এই উপলক্ষে আত্মীয়-বন্ধুদের সোওয়ারীও আনা হইয়াছিল সুতরাং ধুমধামের জের আরও দশ পনর দিন চলিল। আরও কিছুদিন হয় তো চলিত—কিন্তু দেখা গেল যে টাকাগুলা কেমন করিয়া ফুরাইয়া গিয়াছে। এতগুলা টাকা কেমন করিয়া যে গেল হিসাবই পাওয়া গেল না। সৈয়দ সাহেব কিন্তু বলিলেন, তা বৈকি—কতই আর টাকা।

৩৫

মীর সাহেবের সাহায্যে আলতাফ যথা সময়ে বি-এ ও 'ল' পাশ করিয়া বরিহাটিতে ওকালতী করিতেছে। বাদশা মিঞা এখন আলতাফের বিবাহ্ সম্বন্ধে বেশ একটু উৎসুক হইয়া পড়িয়াছেন। এদিকে আলতাফের মালেকার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সংবাদে বাদশা মিঞা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কৃতবিদ্য ছেলের পিতা হওয়া যেমন গৌরবের তেমন দয়িত্বপূর্ণও বটে। যদিও মুসলমান সমাজের নিয়মানুসারে বিবাহের ভার বহন সাধারণভাবে ছেলের পক্ষেই করিতে হয়

তথাপি শিক্ষিত ছেলের সংখ্যা কম। মেয়েকে সৎপাত্রে দান হিন্দু সমাজের পক্ষে জটিল বটে কিন্তু মুসলমান সমাজে উহা জটিলতর। শরীফ খানদানের সঙ্গে সম্বন্ধ করিতে হইবে ; কিন্তু সাধারণতঃ পুরাণো ঘরানাদের অবস্থা আজ কাল প্রায়ই সচ্ছল নয়। লেখাপড়া শিখিয়া যাহারা চাকুরী বা ওকালতী বা ঐরূপ কোন স্বাধীন ব্যবসায়ের দ্বারা নিজের স্ত্রী পরিবার প্রতিপালন করিতে সক্ষম তাহাদেরও সংখ্যা কম। সুতরাং বি-এল পাশ ছেলের আদর যথেষ্ট। বাদশা মিঞা মনে মনে বহু আশা পোষণ করিতেছিলেন। কিন্তু মীর সাহেবের প্রতি ছেলের অত্যধিক অনুরক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন হইয়াছিলেন। তথাপি পিতার কর্তব্য পালনে তিনি কিছুতেই পরাঙ্মুখ হইলেন না।

সেদিন লাল মিঞা আসরের নামায বাদ খড়ম পায়েই আসিয়া বাদশা মিঞার বাটি উপস্থিত। যথারীতি সালাম-সম্ভাষণ বাদ লালমিঞা বলিলেন,—"মীরের পো এবারে সৈয়দ সাহেবের বাড়ীতে যে দা'ওৎ খেয়ে এল। আজকাল আর বাচ-বিচার কিছুই রইল না।"

লালমিঞা,—"যা বলেছেন, সব একাকার হ'য়ে গেল। লোকটা বড্ড ফন্দীই জানে। কিন্তু জানেন সহজে কি সৈয়দসাহেবের বাড়ী দা'ওৎ পেয়েছেন। নগদ ১০০০০ টাকা ঘুষ।"

"১০০০০ টাকা ঘুষ। এঁ্যা বলেন কি?"

"তা বুঝি জানেন না। কত তালেই যে উনি আছেন! ছা-পোষা মানুষ যদি হ'ত তা হলে আর এতটা হ'ত না। ঐ যে আবদুল্লার দেন-মোহরের টাকা ; টাকাটা তো উনিই দিলেন কিনা? না হ'লে আবদুল্লাহ অত টাকা কোথায় পেত?"

"এঁ্যা দশ দশ হাজার টাকা দিলে ; এত টাকা? হ্যাঁ তা আর কি? পরের টাকা পরেই খাবে। আবদুল্লাহ্ কি আর কখনও এ টাকা শোধ দিতে পারবে। ও যেমন এসেছে তেমনই যাবে সে কথা মীরের পো বেশ ভালই জানে। মাঝখান থেকে সৈয়দদের বাড়ী দা'ওৎ খেয়ে এই যে সমাজে একটু আটকি ছিল সেইটে খসিয়ে নিল। এখন তো মীরের পোর পোয়া বারো। আরও টাকার জোরে সে কতকগুলি ছেলেকে এমন হাত করেছে, এই দেখুন না আমার আল্‌তাফ। সে তো আমার কোন তওয়াক্কাই রাখে না। আর ও লোকটা এমন যাদু জানে! ঐ যে একটা বিধবা মেয়ে জুটিয়েছে। ছেলেটাকে এমনি সলাহ পরামর্শ দিয়েছে যে, সে বলে যে ঐ মালেকা না হ'লে সে আর বিয়েই করবে না। কি সব বেহায়াপনা দেখুন না। ছেলে নিজমুখে বলে কিনা সে ওখানে ছাড়া আর কোথাও বে করবে না।"

লালমিঞা বলিলেন,—"শুনেছি মালেকা নাকি তার স্বামীর জীবনবীমার দরুন ৫০০০ টাকা পেয়েছে।"

টাকার কথায় বাদশা মিঞা একটু নরম হইয়া কহিলেন,—"হ্যাঁ, সেও একটা কথা। আবার শুনেছি যে মীরসাহেব নাকি আরও ৫০০০ টাকা তাকে দান করেছেন। তা একত্রে দশ হাজার টাকা একটা মোটা টাকা বৈ কি?"

লালমিঞা বলিলেন,—"তা তো বটে, তবে মেয়েটা কিন্তু বিধবা।"

"তা ছেলে নাকি বলে বিধবা হ'লে কি হয় আমরা তো আর হিন্দু নই। আমাদের সমাজে বিধবা বিবাহে তো কোন আপত্তি নেই।"

লালমিঞা,—"তা তো বটে ? তবে কিনা একটা খুঁত।"

"সমাজে একটু নিন্দার কথাত বটেই। মেয়েটি নাকি বেশ সুন্দরী-আর দেখুন না টাকারও কিছু দরকার তো হ'য়ে পড়েছে। ছোকরাকে তখন বল্লাম 'ল' পড়ে কাজ নেই ডেপুটিগিরি চেষ্টা কর, কিছুতেই শুনলে না; এখন বুঝ। ওকালতী তার আর ভাল লাগছে না। পয়সা কড়ি বিশেষ কিছু পাচ্ছে বলে মনে হয় না। তা আমি আর কি করি। মীরের পোর পরামর্শ বিনে তো কোন কাজেই সে হাত দেবে না। যাক একবার মীরের পোর সঙ্গে পরামর্শ করেই দেখা যাক। দেখি কি বলে।"

মজিলপুরে বদলি হইয়া আসার পর আবদুল কাদের আয় বাড়াইয়াছিল কিন্তু রসুলপুর ও মাদারগঞ্জের বন্ধকের দরুন মাসিক ৬০্ টাকা পরিশোধ করিয়া যে টাকা অবশিষ্ট থাকিত তাহাতে সংসার চালান বেশ কঠিন হইত। কয়েকটি ছেলেমেয়ে লইয়া আবদুল কাদের খুব কষ্ট করিয়া যথাসাধ্য মিতব্যয়ীভাবে সাংসার চালাইয়া আসিতেছিল। কিন্তু আপিসের খাটুনী খাটিয়া এবং সাধারণের উপকারের জন্য নানারূপভাবে তাহাকে পরিশ্রম করিতে হয়। যেমন খাটুনী তেমন আহার জুটে না। পিতৃঋণ পরিশোধ না করিলেও চলে না। তা ছাড়া মাঝে মাঝে গরীব দুই একজন আত্মীয় আছে। ৬০্ টাকা গেলে আর কতই বা থাকে। হালিমা দেখিল, আবদুল কাদেরের শরীর দিন দিন খারাপ হইয়া চলিয়াছে। অন্যান্য নাশ্‌তা যোগাড় করা দুঃসাধ্য তাই হালিমা তাহাকে সকাল ও বিকাল একটু দুধ খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলে আবদুল কাদের বলিত, ছেলেমেয়েদেরই দুধ জুটাতে পারি না আর আমি বুড়া মানুষ দুধ খাব।

এইভাবে দিন কাটিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আবদুল কাদেরের স্বাস্থ্যও অসম্ভবরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। মাঝে মাঝে জ্বর হইতে লাগিল ; কুইনান খাইয়া জ্বর বন্ধ করা হয়, কিন্তু জ্বরটা কি জ্বর এবং তার ঔষধ কি এ সম্বন্ধে প্রথমটা মাথা ঘামাইল না। যাহাদের অর্থের অভাব তাহাদের দেহ দুর্গের মধ্যে কোন শত্রু প্রবেশ করিলেও তাহাদের বিশেষ হুঁশ হয় না। অবশেষে এমন হইয়া আসিল যে, জ্বর আর ছাড়ে না। তখন ডাক্তারের ডাক পড়িল। মজিলপুরে যে ডাক্তার ছিল, সে পরামর্শ দিল রক্ত পরীক্ষা করিতে হইবে। তদনুসারে বরিহাটী রক্ত পাঠানো হইল। পরীক্ষা করিয়া জানা গেল রক্তের মধ্যে কালাজ্বরের বীজাণু ঢুকিয়াছে। আবদুল কাদের মনে মনে হতাশ হইয়া পড়িল ; কিন্তু উপায় নাই। হালিমা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সকলে পরামর্শ দিল বরিহাটী গিয়া চিকিৎসা করা দরকার। আবদুল কাদের মনে মনে টাকার অভাব অনুভব করিল। পিতা বিমুখ ; আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এমন কে-ই বা আছে যে টাকা দিয়া সাহায্য করিবে। কিন্তু টাকা কর্জ করিতে পারিলে চিকিৎসার চেষ্টা করা যায়। কিন্তু তার শারীরিক অবস্থা এখন যেরূপ তাহাতে কে বা কর্জ দেয়।

মানসিক উদ্বেগ ও অশান্তির মধ্যে অসুস্থদেহে কয়েকদিন আপিসের কাজ চলিল বটে কিন্তু তাহা আর বেশীদিন চলিল না। অবশেষে যখন আবদুল কাদের একেবারে শয্যাগ্রহণ করিতে বাধ্য হইল তখন ছুটির দরখাস্ত করা হইল।

কিস্তির টাকা দেওয়া হইবে না, হালিমার কি উপায় হইবে, ছেলে মেয়েদের কি দশা হইবে; পিতার যেরূপ মতিগতি তাতে পৈতৃক সম্পত্তি যা আছে তাও রক্ষা হইবে না। আর যদিই বা রক্ষা হয় তাহা ভাগ হইয়া গেলে থাকিবেই বা কি ইত্যাদি দুশ্চিন্তা আবদুল কাদেরকে একবারে অধীর করিয়া ফেলিল।

সংবাদ পাইয়া আবদুল্লাহ কয়েকদিনের casual leave লইয়া আবদুল কাদেরকে দেখিতে আসিল। আবদুল কাদের আর সে আবদুল কাদের নাই। একেবারে অস্থি-চর্মসার, তাহার কঙ্কালের প্রতি তাকাইয়া আবদুল্লার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। আবদুল কাদেরের কাঁদিবার শক্তি ছিল না, দুইহাত বাড়াইয়া ইশারা করিয়া তাহাকে বসাইয়া দিতে বলিল। অতি সন্তর্পণে সকলে মিলিয়া ধরিয়া তাহাকে পিছনের দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া বসাইয়া দিল। তাহার চক্ষু ছলছল করিতেছিল। আবদুল্লাকে কাছে ডাকাইয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, "ভাই গোনাহ্ খাতা মাফ্ কর।" তাহার পর হালিমাকে দেখাইয়া অস্পষ্টস্বরে কি একটা কথা বলিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার গণ্ড বাহিয়া দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। আবদুল্লাহ্ নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া নানারূপ আশ্বাসবাণী দিয়া আবদুল কাদেরকে সান্ত্বনা দিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিল। আবদুল কাদের আর বসিতে পারিতেছিল না। সকলে মিলিয়া অতি সন্তর্পণে তাহাকে শোয়াইয়া দিল।

একবালপুরে সংবাদ পৌছিল। সৈয়দ সাহেব বলিলেন, "আর কি হবে—আমার ওসব জানাই আছে। সবই খোদার মর্জ্জি, নইলে এমন হবে কেন ?"

আবদুল মালেক কহিল—"তা আব্বাজান, ধরুন গে' আপনার আবদুল কাদের তো ছেলেমানুষ, আপনি ওকে মাফ্ করে দিন ; আর আমি না হয় একবার ওকে দেখে আসি।"

সৈয়দ সাহেবেরও শারীরিক অবস্থা দিন দিন কালি হইয়া আসিতেছিল। নিজের যাওয়া সম্ভবপর নয়। তিনি বলিলেন—"হ্যাঁ বাবা আমিও তাই মনে করছি, তুমি গিয়ে দেখে এস। আমার নড়াচড়ার হাঙ্গামা সইবে না।"

অবশেষে সৈয়দ সাহেবের আদেশ মত আবদুল মালেক মজিলপুর আসিয়া উপস্থিত হইল। আবদুল মালেক আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে সে একেবারে বসিয়া পড়িল। সে আবদুল্লাকে কহিল,—"তা দুলামিঞা, ধরগে' তোমার বরিহাটিতে নিয়ে গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখলে হয় না? হালিমার ব্যারাম তো ধরগে' তোমার ঐ বরিহাটির ডাক্তার বাবুই ধরগে' তোমার আরাম ক'রে দিয়েছিলেন।"

আবদুল্লাহ্ কহিল—"কি আর নিয়ে যাব। দেখছেন না হাড় ক'খানা? ও নিয়ে যেতে গেলে পথেই গুঁড়ো হ'য়ে যাবে। নেবার মত অবস্থা থাক্‌লে কি আর বসে আছি। কিছুই নেই এখন যে আর। কোন আশাই নেই ভাইজান"—বলিয়া আবদুল্লার চক্ষু দিয়া অশ্রু বাহির হইল। ঠিক এই সময়েই হালিমার উচ্চ ক্রন্দন রোল উভয়ের চমক ভাঙ্গাইয়া দিল, উভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া কলেমা পড়িতে লাগিল। হালিমার হাত পা তখন থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। আবদুল্লাহ্ তাহাকে একপাশে সরাইয়া তাহার হাত হইতে চামচটি লইয়া একবার পানি দিল।

হালিমা কহিল,—"ভাইজান আর পানি দেবেন না।" আবদুল মালেক কলেমা পড়িতে পড়িতে পা দুটি সোজা করিয়া দিল। সকলেই সমস্বরে পড়িতে লাগিল, "লাএলাহা-ইল্লাল্লাহ্ মোহাম্মাদার রসুলুল্লাহ্'!

যথা সময়ে দাফন্ দফন্ সমাধা করিয়া, লাখ কলেমা পড়াইয়া এবং কয়েকজন ফকীর মিসকিনকে খাওয়াইয়া হালিমা ও তাহার সন্তান কয়েকটিকে লইয়া আবদুল্লাহ্ ও আবদুল মালেক একবালপুরে ফিরিয়া আসিল। আসার সময় ফজলু মিঞা হালিমাকে কয়েকদিন তাঁহাদের বাড়ী রাখিয়া পরে একটু সুস্থ হইলে লইয়া গেলে হইবে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার স্বামীর অসুস্থ অবস্থায় যে ফজলু মিঞা একদিনও দেখিতে আসিলেন না, তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হালিমা আদৌ রাজী হইল না। হালিমা আরও জানিল যে, এই ফজলু মিঞা তাঁর দীনী এলেমের প্রতি উৎকট্ নেশায় বশীভূত থাকায় আবদুন কাদেরের বিরুদ্ধে নানারূপ সমালোচনা করিয়াছেন এবং তদ্দরুন আবদুল কাদেরকে অনেক যন্ত্রণাও পোহাইতে হইয়াছে। মাদ্রাসায় কতকগুলি ছেলেকে ইংরাজী, বাংলা ও অঙ্ক শিখাইতে চেষ্টা করায় ফজলু মিঞা আবদুল কাদেরের বিরুদ্ধে একবার কাফেরের ফৎওয়ার কথাও ভাবিয়াছিলেন। সে বাড়ীতে হালিমা কিছুতেই যাইতে রাজী হয় নাই।

বিধবার বেশে হালিমা যখন রসুলপুর পৌছিল, তখন তাহাকে দেখিয়া তাহার মা একেবারে উন্মাদের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। আবদুল্লাহ্ অশ্রুসজল চক্ষে মাকে শান্ত করিবার জন্য বলিল,—"সবর করুন আম্মা, সবরকরুন! ওতে গোনাহ্ হয় আম্মা, তা তো জানেন।" পরে আবদুন কাদেরের বড় ছেলেটিকে তাহার মায়ের কোলে দিয়া বলিল,—"দোওয়া করুন, এরা বেঁচে থাকুক-মানুষ হ'ক"—কে কার কথা শুনে, ছেলেটিকে ধরিয়া মা ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। হালিমা কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রু নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছিল। সে আর কাঁদিতে পারিল না। তাহার কোলের ছেলেটি ক্ষুধায় অস্থির হইয়াছিল। আবদুল্লাহ্ মাকে বলিল, "আম্মা, দুধ থাকে তো ওকে একটু দুধ দিন।" যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করিয়া শিশুটিকে কোলে লইয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইবার জন্য জননী উঠিয়া গেলেন।

আবদুল্লাহ হালিমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, আবদুন কাদেরের Life Insurance-এর দরুন ৫০০০্ টাকা পাওয়া যাইবে। এই টাকা দ্বারা ছেলেগুলা হয়ত ভবিষ্যতে মানুষ হইতে পারে এই ভরসা নিয়া সে হালিমাকে অনেকখানি আশ্বস্ত করিয়া ছুটি-শেষে রসুলপুর রওয়ানা হইল।

আবদুল কাদের যে Life insure করিয়াছিল, একথা সকলেই জানিত। এখন অনটনের মধ্যে পড়িয়া সেই টাকাগুলির ন্যায্য অংশ হস্তগত করিবার জন্য সৈয়দ সাহেব উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন, দুই একজনকে ডাকাইয়া সল্লা পরামর্শও করিলেন। শেষে স্থির করিলেন আবদুল্লার দ্বারাই টাকাটা উঠাইয়া লইতে হইবে,কারণ সে ভিন্ন হালিমাকে রাজী করা সম্ভব হইবে না এবং এত হাঙ্গামা হুজ্জৎ অন্য কেহ-ও পোহাইতে পারিবে না।

স্থির-সঙ্কল্প হইয়া সৈয়দ সাহেব আবদুল মালেককে রসুলপুরে পাঠাইয়া দিলেন। আবদুল মালেক রসুলপুরে পৌছিয়া সংসারের অভাব-অনটনের কথা যাহা কিছু বলিবার সমস্তই আবদুল্লাকে বলিল এবং শীঘ্রই যাহাতে Life insureএর টাকাটার ন্যায্য প্রাপ্যটা পাওয়া যায় তাহার যথাবিহিত চেষ্টা করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইল।

আবদুল্লাহ্ আপত্তির কোন কারণ দেখিতে পাইল না। কাজেই যতশীঘ্র সম্ভব সে একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিবে—এই প্রতিশ্রুতি দিয়া আবদুল মালেককে একবালপুরে পাঠাইয়া দিল।

৩৭

বাস্তবিকই সৈয়দ সাহেবের শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। পুত্র আবদুল কাদেরের মৃত্যু সংবাদে তিনি আরও বেশী কাহিল হইয়া পড়িলেন। তার উপর দুশ্চিন্তার বোঝাও ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়াছে। আবদুল কাদেরের মৃত্যুতে কিস্তি খেলাফ হওয়ায় ভোলানাথ বাবুরাও কিছু চাঞ্চল্য দেখাইতেছেন। টাকাটা শোধ না দিলে ভাল ভাল দুটো তালুক বেহাত হইয়া যাইবার সম্ভাবনায় আবদুল মালেকও অনেকটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আবদুল মালেক সেদিন আসরের নামায বাদ সৈয়দ সাহেবের সম্মুখীন হইয়া বলিল, "আব্বা, আমি মনে মনে ভাবছি আবদুল কাদেরের Life Insurance-এর দরুন যে টাকাটা পাওয়া যাবে তা ধরুনগে' তাতে তো আপনারও হক আছে।" সৈয়দ সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন—"তা আছে, তাতে তুমি কি বলছ।"

আবদুল মালেক—"বলব আর কি ধরুনগে' আপনার মাদারগঞ্জ আর রসুলপুর ঐ দুটাই তো হ'ল ভাল তালুক ; ও দুটো গেলে ধরুনগে' আপনার আর রইল কি ?"

সৈয়দ সাহেব একটু উষ্ণ হইয়া বলিলেন "তা তুমি কি বলছ খোলাসা করে সোজা বল না। ও সব ঘোর প্যাঁচ কেন ?"

আবদুল মালেক—"আমি বলছি যে, আপনার যখন শরা মত হক আছে তখন ধরুনগে' আপনার যে টাকাটা আপনি পাবেন......"

সৈয়দ সাহেব—"হ্যাঁ পাব, তাতে কি ? তুমি বলছ সেই টাকাটা ভোলানাথ বাবুকে দিয়ে ঋণটা শোধ দেওয়া যাবে।"

আবদুল মালেক—"তা যাবে বই কি ? আবদুল কাদের মরহুম তো প্রায় হাজার দেড়েক টাকা শোধ দিয়ে গেছে।"

সৈয়দ সাহেব—"হাজার দেড়েক না, তবে কাছাকাছি, অনেকটা টাকা তো সুদের বাবদ গেছে কিনা ? তা যা হ'ক Life Insurance-এর কত টাকা ?"

—"পাঁচ হাজার ; তা তার দুই আনা হ'ল কত—ছয় শত সাড়ে ছয় শত হবে। তাতে কি আর ঋণ শোধ হবে ? তা যা হ'ক তুমি আবদুল্লাকে চিঠি লিখে দাও। বড় টানাটানি চল্‌ছে।"

যথাসময়ে ঐ মর্মে আবদুল্লার নিকট পত্র প্রেরিত হইল এবং আবদুল্লাহ্ যথাসময়ে শরা মত সৈয়দ সাহেবের দাবী গ্রাহ্য করিয়া ৬৩৩/-৩ টাকা পাঠাইয়া দিল।

টাকা হস্তগত হওয়ায় সৈয়দ সাহেবের সওয়াব হাসিল করার আবার একটি বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইল। পীর সাহেবের পুত্রের শাদী মোবারকের দা'ওৎ পৌছিয়াছিল এবং যত্র আয় তত্র ব্যয়। সমস্ত টাকাই পীরসাহেবের ছেলের বিবাহের নযর ইত্যাদিতে খরচ হইয়া গেল।

অভাব-অভিযোগের ইয়ত্তা ছিল না, শরীরও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সৈয়দ সাহেব শীঘ্রই নিতান্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর ডাক পড়িল। তিনি জিন্নতবাসী হইলেন।

তখনকার দিনে ডেপুটিগিরি চাকরী সুপারিশের উপর নির্ভর করিত। সুপারিশ যোগাড় করিতে হইলে বিস্তর টাকা-পয়সা খরচ হইত। যার টাকা-পয়সার অভাব সে যথেষ্ট কৃতবিদ্য হইলেও চাকুরী তার জুটিত না। আলতাফের ওকালতী ব্যবসায় পছন্দ না হওয়ায় শেষে বাদশা মিঞার ইচ্ছানুসারে ডেপুটিগিরির চেষ্টার কথা মীর সাহেবের নিকট উপস্থিত করিল। মীর সাহেবের শরীর দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। আলতাফের ওকালতী ব্যবসায় ভাল লাগে না। সুতরাং মীরসাহেব কোন আপত্তি করিলেন না এবং যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বাদশা মিঞাও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া লাল মিঞার দ্বারা মালেকার সহিত আলতাফের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। লালমিঞা আলতাফকে ডেপুটি করার কথা পাকা করিয়া লইলেন। মীরসাহেব যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দেখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং কয়েকদিন পরেই আলতাফকে সঙ্গে লইয়া সদরে গিয়া পৌছিলেন।

সদরে গিয়া প্রথমে তিনি হরনাথ বাবুর সহিত দেখা করিলেন। হরনাথ বাবু সদরেই ওকালতী করিতেছিলেন এবং সেখানে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বেশ অর্জন করিয়াছিলেন। যেমন স্বাস্থ্য তেমনি মেজাজ। লেখাপড়ায় যেমন, আইনের জ্ঞান ততোধিক। এদিকে Tennis খেলায় তিনি সদরের Champion রূপে পরিগণিত। জজ সাহেব, পুলিশ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব প্রায় প্রতিদিন তাঁহার সহিত দেখা করেন। কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে খেলার সূত্রে তাঁর সহিত বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া উঠিয়াছিল। মীরসাহেব এ-সমস্ত খবর জানিয়াই হরনাথ বাবুর নিকট গিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। হরনাথ বাবু প্রথমটা বলিলেন,—"তা ওকালতীই তো ভাল। এখানে scope বড় বেশী ; আর আজকাল ডেপুটিগিরি পাওয়াটা lottery বই আর কিছু নয়। উনি এখন ওকালতী করছেন, চাকুরীর চেষ্টা করিতে গেলে এখানে ওখানে দৌড় ঝাঁপ ক'রে বেড়াতে হবে'খন ; মক্কেল দুচারটা যা আছে তারা সব বেহাত হয়ে যাবে। শেষে ধরুন যদি চাকুরী নাই মিলল ; তবে তো সেই আবার কেঁচে গণ্ডুষ।" আলতাফ একটুখানি বিনয়ের হাসি হাসিয়া কহিল—"আমার মক্কেল আদৌ নাই, যা ২/১ জন কখনও কখনও আসে তারা পরামর্শ নিয়ে শেষ কালটা ভেগে পড়ে। দুই-একজন এমনও আছে যে কাগজপত্র সব রেখে গেল, বলে গেল নিশ্চয়ই আমাকে উকীল দেবে ; কিন্তু পরদিন অথবা দিনের দিন এমন বললে আমি নূতন উকীল ব'লে ভরসা হয় না। এমন ক'রে আর কি করে চলে। বাড়ীর অবস্থা ভাল নয়। বাড়ীতে বৃদ্ধ পিতাও আমি একটু সাহায্য করব বলে অনেকদিন আশা করে রয়েছেন, এখন ওকালতীতে যা দেখছি তাতে আমার আর কোনও ভরসা হ'চ্ছে না।

হরনাথ বাবু সমস্ত শুনিয়া অবশেষে মীর সাহেবকে বলিলেন,—"আচ্ছা, আপনার অনুরোধ আমি কখনও অমান্য করব না এবং যথাসাধ্য আলতাফকে সাহায্য ক'রব। আজই সন্ধ্যায় Collector সাহেবের সঙ্গে দেখা করার কথা। তখনই আমি কথাটা পাড়ব। কাল সকালেই একবার আলতাফ ভায়াকে পাঠিয়ে দেবেন আমার এখানে, যা কথা হয় জানাব। যদি Collector সাহেবকে সম্মত করাতে পারি তা হ'লে দাদা আছেন এখন কমিশনারের পার্সন্যাল এসিস্‌টেন্ট তাঁরও কাছে একটা চিঠি দিয়ে আলতাফকে পাঠিয়ে দেব। যতদূর যা পারি আমি নিশ্চয়ই করব, আর কিছুর জন্য না হয় শুধু আপনার খাতিরে।"

পরদিন প্রত্যুষে আলতাফ হরনাথ বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া জানিল যে কালেক্টর সাহেব বলিয়াছেন যে, কয়েকজন খুব ভাল ভাল প্রার্থী আছে ; তিনি কোনরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না তবে আলতাফকে একবার দেখিতে চান।

সেইদিনই হরনাথ বাবুর একখানা পত্র লইয়া আলতাফ যথাসময়ে কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে দেখা করিল। কালেক্টর সাহেব বলিলেন, আলতাফের আরও কিছু পূর্বে দেখা করা উচিত ছিল, কারণ তিনি পূর্বেই একজনকে একরূপ কথাই দিয়াছিলেন। এখন ডেপুটিগিরির জন্য (first nomination) প্রথম নাম তিনি দিতে অক্ষম তবে সবডেপুটির জন্য প্রথম নাম এবং ডিপুটিগিরির জন্য ২য় নাম দিতে চেষ্টা করিবেন বলিয়া আলতাফকে জানাইলেন।

মীর সাহেব সমস্ত কথা শুনিলেন এবং রসুলপুর ফিরিয়া আসিয়া বাদশা মিঞার সহিত পাকাপাকি কথা ঠিক করিয়া দিন স্থির করার প্রস্তাব করায় বাদশা মিঞা নানারূপ অজুহাত দেখাইয়া সময় লইতে চাহিলেন। বাদশা মিঞার মনের অভিসন্ধি যে, আলতাফের চাকুরী চেষ্টার ফলাফল জানার পূর্বেই যদি সম্বন্ধ হইয়া যায়, তবে হয় তো মীরের পো সরিয়া পড়িবেন এবং আলতাফের চাকরীর তদ্‌বীরের দরুন আর্থিক সাহায্য শেষ পর্যন্ত নাও করিতে পারেন। মীরসাহেব যে এতদিন কোন বিশেষ মতলবেই আলতাফের খরচ যোগাইতেছিলেন এইরূপ সন্দেহ আর যে যাই বলুক বাদশা মিঞার মনে বরাবরই ছিল। কোন সমাজ যখন অধঃপাতে যায় তখন সেই সমাজে যে দুই একটি ভাল লোক নিঃস্বার্থভাবে পরের উপকার করে তাদের মনের কথা বিচার করিবার সময় অধঃপতিত জন নিজের মনের প্রতিবিম্ব ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না। কৃতজ্ঞতা জিনিসটির অধঃপতিত সমাজে কোন স্থান নাই। মীর সাহেবের অবশ্য কৃতজ্ঞতার দিকে তত লোভ ছিল না। তিনি সমাজকে ভাল করিয়াই চিনিয়াছিলেন। বাদশা মিঞা কেন যে দিন স্থির করিতে নারায তাহা তিনি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। অবশেষে যখন বাদশা মিঞা একটু পরে অর্থাৎ ডেপুটিগিরির চেষ্টার ফলাফল প্রকাশিত হইবার পর বিবাহের দিন স্থির করিলেন মীর সাহেব তাহাতেই রাজী হইলেন।

৩৯

যথাসময়ে ফলাফল প্রকাশিত হইল এবং আলতাফ সবডেপুটির নিয়োগপত্র পাইল। বাদশা মিঞা একেবারে চটিয়া লাল। তিনি আরও শুনিয়াছিলেন যে, মালেকাকে মীর সাহেব ৫০০০ টাকা দিয়াছেন সে কথাও মিথ্যা। বাদশা মিঞা চটিয়া বলিলেন, "সব জুচ্চুরি—ডেপুটি করে দেবে বলেছিল, হ'ল কিনা সবডেপুটি—টাকার বেলাতেও ফাঁকি—সব চালাকি!" কিন্তু তিনি মীর সাহেবকে মনের কথা কিছু জানাইলেন না। ভিতরে ভিতরে কূট মতলব করিয়া বসিলেন, আলতাফের বিবাহের সময় এই জুচ্চুরির সমুচিত প্রতিশোধ দিবেন। তাঁহাকে লোকচক্ষে এমনভাবে অপদস্থ করিবেন, যাহাতে জীবনে কখনও আর লোকের কাছে মুখ দেখাইতে না পারেন।

এদিকে আলতাফকে বরিহাটিতে কার্যে যোগদান করিতে হইবে। অথচ বিবাহের দিন নিকটবর্তী। রসুলপুরে বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক। লোকজনকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। গতরাত্রি হইতে নিমন্ত্রিতদের খানার যথারীতি আয়োজন চলিয়াছে। ২০/২৫ জন লোক যাদের উপর পাকের ভার ছিল তারা সারারাত্রি জাগিয়া পাকের আয়োজন করিলেন। পোলাও মাংস ইত্যাদি কতক কতক পাক হইয়াও গিয়াছে। মীর সাহেব অসুস্থ শরীরে প্রায় রাত্রি দুটা পর্যন্ত জাগিয়া সকলের অনুরোধে একটু ঘুমাইয়া আবার ফজরে উঠিয়া নামায সমাধা করিয়া কাজকর্ম দেখিতেছেন। ক্রমে বেলা উঠিল। বরের আসিবার সময় সন্নিকটে। দু'দশজন নিমন্ত্রিত আসিতে আরম্ভও করিয়াছে। মীর সাহেব হাসিমুখে আদর অভ্যর্থনা করিতেছেণ। এমন সময় ডাক পিয়ন আসিয়া একখানা চিঠি হাতে দিল। মীর সাহেব ক্ষিপ্রহস্তে চিঠিখানি লইয়া পড়িয়া একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। সকলে অবাক্। ব্যাপার কি জানিবার জন্য মীর সাহেবের চারিদিকে ভিড় জমাইল। ছল-ছল-চক্ষু বৃদ্ধ মীরসাহেব বুকে পাষাণ বাঁধিয়া সকলকে জানাইলেন যে,—"বাদশা মিঞা চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে, এ বিবাহ হ'তে পারে না, কারণ আমি নাকি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, আলতাফকে ডেপুটি করে দেব কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে আমি তাকে সবডেপুটি মাত্র করেছি। হা কপাল, ডেপুটিগিরি কেন, যদি তার বড় কিছু আমার হাতে থাকত আমি আলতাফকে তাও দিতে পারলে কি ছাড়তাম। আলতাফ, তোমার হাতে আমার এই শাস্তি, এ তো আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। আমার পুত্র-পরিবার কেউ নাই। তোমরাই আমার সব! কবে কোনদিন আলতাফকে কি দিতে আমি কুণ্ঠিত

হ'য়েছি তা খোদাতা'লা ছাড়া আর কেউ জানেন না।" বৃদ্ধের গণ্ড বাহিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরিল।

বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন উপলক্ষে রাত্রি জাগরণ, তার উপর মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগ ভগ্নস্বাস্থ্য মীরসাহেব সহ্য করিতে পারিলেন না। সেই দিন দ্বিপ্রহরে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। একটু সর্দিকাসি পূর্বেও দেখা দিয়াছিল। রাত্রে বুকেপিঠে বেদনা অনুভব করিলেন। মীর সাহেব ভাবিলেন আর সময় নাই। নানারূপ ভাবিয়া পরদিন বাদশা মিঞাকে এই মর্মে একখানা চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন যে, টাকাটা লোন আপিসেই ছিল কিন্তু সে টাকা লোন আপিস হইতে উঠাইয়া তদ্বারা মালেকার নামেই একটি খুব লাভবান সম্পত্তি খরিদ করা হইয়াছে।

৪০

বিবাহ উপলক্ষে আবদুল খালেক সপরিবারে রসুলপুরে উপস্থিত ছিল। আবদুল্লাহ্ ও আবদুল খালেক উভয়ে উপযুক্ত ডাক্তারকে ডাকিয়া মীর সাহেবের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিল। এ দিকে মালেকা ও রাবিয়ার প্রাণপণ সেবা শুশ্রূষা চলিতে লাগিল। খোদার মর্জিতে অল্পদিনের মধ্যেই মীরসাহেব আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিলেন।

মীর সাহেব অসুস্থ থাকাকালীন আবদুল্লাহ্ তাঁহার বাড়ীতে অনবরত আসা-যাওয়া করিত। মালেকার সেবা-শুশ্রূষার নিপুণতার বহু পরিচয় আবদুল্লাহ্ পাইয়াছিল এবং মালেকার প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মানে তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বুদ্ধিমতী রাবিয়াও ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল। সে মনে মনে উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থির করিবার সঙ্কল্প করিল।

মীর সাহেব আরোগ্য লাভ করায় সকলেই অত্যন্ত সুখী হইয়াছিল। কয়েকদিন পর একটু আয়োজন করিয়াই সবই মিলিয়া একসঙ্গে খাবার বন্দোবস্ত করিল। এদিকে মীরসাহেব মালেকার চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সেদিন আহারাদির পর রাত্রিতে আবদুল্লাকে ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেদিন সকলেরই মন বেশ প্রফুল্ল ছিল। রাবিয়া আবদুল্লার সম্মুখে সাজা পানভরা পানের বাটা রাখিয়া দিতেই আবদুল্লাহ্ কহিল, "ভাবীসাহেবা, আমি পান খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।"

—রাবিয়া বলিল,—"কেন, এত বৈরাগ্য কিসের জন্য?"

"বৈরাগ্য আর কি, ভাল লাগে না, তাছাড়া পান খেলে অপকার হয়-আবার মাষ্টারী করি কিনা, ছেলেপুলের সামনে পান খাওয়াটা ভাল নয়; তাই আজকাল ওটা ছেড়েই দিয়েছি।"

"আচ্ছা, পান খাওয়া না হয় ছেড়েই দিলেন, তাই ব'লে সব ছাড়তে পারবেন না। সত্যিই খোনকার সাহেব, বলুন দেখি এমনভাবে আর কতদিন কাটবে?"

"আপনার কথাটা বুঝতে পারলাম না।"

"কথাটা কি এতই শক্ত যে বুঝা কঠিন। তবে সোজা করে বলি। আপনি আপনার লোক কিন্তু কেন জানি না, আপনাকে আরও কাছে টেনে নিতে বড় ইচ্ছা হয়। যদি সত্যি সত্যি আমার মনটা বা'র ক'রে আপনাকে দেখাতে পারতাম তাহ'লে আপনি বুঝতে পারতেন।"

আবদুল খালেক পাশের ঘরে সমস্ত কথাই শুনিতেছিল। সে আগাইয়া আসিয়া বলিল,—"বাঃ, বেশ তামাশা হচ্ছে; আর আমি যে এ ঘরে ওৎ পেতে রয়েছি তার খোঁজ আছে?"

রাবিয়া ঘোমটা একটু টানিয়া দিয়া বলিল,—"তামাশা নয়; সত্যি কথা।" তাহার চক্ষু ছল্ ছল্ ছল্ করিতেছিল। বলিল, "খোনকার সাহেবকে মামুজান এত স্নেহ করেন দেখে আমার বড় ইচ্ছা হয়..."

আবদুল খালেক—"কি ইচ্ছা, মালেকাকে ঘাড়ে চাপাতে চাও, না! আমি ব'লে দিলাম মনের কথাটা।"

রাবিয়া—"চাই চাব না কেন? আপনার লোকের বোঝা আপনার লোকের উপর চাপাতে পারলে কি ছাড়বে ; কিন্তু চাইলেই যদি পারতাম তা হ'লে আর বিলম্ব করতাম না। তা সে আমাদের কি আর সেই কপাল হবে।"

আবদুল্লাহ্ একটু যেন লজ্জিত হইল। আবদুল খালেক তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"কি হে খোনকার? মনটা কি নরমে উঠেছে? তা আমি বলি কাজটা কোরলে মন্দ হয় না।"

আবদুল্লাহ্ এবার গম্ভীর হইয়া উঠিল। তার জীবনের অনেক কথা তার মনে দ্রুত খেলিয়া যাইতে লাগিল। সেদিন স্কুলে একটি ইংরেজী কবিতা পড়াইতেছিল,—"Life is real—life is earnest" সে কথাও মনে হইল। চন্দ্রশেখর বাবুর কথা, জলধর সেনের কথা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ সমর্থনের কথা, নূরজাহান, তাজমহল, কত কথাই তাহার মনে হইল।

মীর সাহেব ব্যাপার কিছু কিছু শুনিলেন। অবশেষে আবদুল্লাহ্ মীর সাহেবের নিকট নিজেই জানাইল যে যদি তিনি মুরুব্বী স্বরূপ আবদুল্লাহকে পরামর্শ দেন এবং যদি তিনি সুখী হন তা হইলে আবদুল্লাহ্ এই বিবাহে রাজী।

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আবদুল্লার মুখ পানে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে মীর সাহেব হঠাৎ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কাছে বসাইয়া পিঠে মাথায় হাত বুলাইয়া অজস্র আশীর্বাদে তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিলেন।

বিনা আড়ম্বরে শুভদিনে শুভক্ষণে আবদুল্লার সহিত মালেকার বিবাহ হইয়া গেল।

মীর সাহেব যেন তাঁর শেষ কর্তব্যটি সম্পন্ন করার জন্য এতদিন মনের কথা মনেই রাখিয়া দিয়াছিলেন। সুদখোর মীর সাহেব যে মনে মনে এতখানি কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা কেহ পূর্বে ভাবে নাই। বাদশা মিঞার সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্ট হইতে একজন উকীল আনাইয়া সুদখোর মীর সাহেব তাঁর সমস্ত সম্পত্তির ওয়াকফ নামা লিখিয়া রেজিষ্ট্রী আপিসে গিয়া রেজিষ্ট্রী করিয়া দিলেন। তাঁর পরিত্যক্ত যাবতীয় সম্পত্তির ।০ আনা সাধারণ শিক্ষার জন্য, ।০ আনা শিল্প শিক্ষার জন্য, /০ আনা আতুর সেবার জন্য, /০ আনা একটি পান্থশালার ব্যয়ের জন্য, বাকী দুই আনার /০ আনা মোতওয়াল্লীর মোশাহেরা দরুন এবং /০ আনা অন্যান্য কর্মচারীদের বেতনের দরুন ব্যয় হইবে। আয়-ব্যয় হিসাব করিয়া দেখা গেল /০ সম্পত্তির বার্ষিক আয় প্রায় ৪০০০৲ টাকা হয় অর্থাৎ সম্পত্তির মোট আয় ৬৪০০০৲ টাকা ছিল। আবদুল্লাহ্ আপাততঃ মোতওয়াল্লীর পদে নিযুক্ত হইল।

৪১

সৈয়দ সাহেবের মৃত্যুর পর হইতে পাওনাদারদের তাগাদা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁর উভয় পক্ষের নাবালক সন্তান-সন্ততিকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া আবদুল মালেক সপরিবারে শ্বশুরবাড়ী শরীফাবাদে গিয়া নিশ্চিন্ত মনে বহাল তবিয়তে কালাতিপাত করিতেছেন! অবশ্য ইহার যে কোন সঙ্গত কারণ ছিল না, তাহা নহে। অভাব এত বেশী হইয়া উঠিয়াছিল যে, বাড়ীতে আদৌ মান-সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া চলিবার কোন উপায় ছিল না। তার উপর ছেলেপুলের অসুখ-বিসুখ, তাহাদের চিকিৎসা-পত্র হইবে কেমন করিয়া? সেবা-শুশ্রূষারও একান্ত অভাব, কারণ দাসী-বাদী যাহারা ছিল, নিয়মিত ভরণ-পোষণ না পাইয়া যে যাহার পথ দেখিয়া লইয়াছে, কাজেই শ্বশুরবাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন তাঁহার গত্যন্তর ছিল না।

এখন বাড়ীর কর্তা হইয়াছিল খোদা নেওয়াজ। বেচারা একাধারে চাকর ও কর্তা। বাঁদীপুত্র বলিয়া লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পায় নাই। কাজেই একজন গোমস্তার আদায়পত্রের ভার ছিল। সে যাহা দয়া করিয়া দেয় তাহারই উপর সমস্ত নির্ভর করা ছাড়া তাহার গতি ছিল না। সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে যে, তাহাকে যথেষ্ট ঠকান হইতেছে। কিন্তু উপায় ছিল না।

এদিকে ভোলানাথ বাবুর শরীরও ইদানীং ভাল ছিল না। সেই মাদারগঞ্জ ও রসুলপুর এই দুইটি তালুকের একটা ব্যবস্থা করিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং মাঝে মাঝে কড়া তাগিদও পাঠাইতেছিলেন।

মধ্যে কয়েক মাস আদৌ আর কোন তাগিদ আসিল না। খোদা নেওয়াজের মনের ভিতর একটা সন্দেহ জাগিয়া উঠিল, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারে না, আবার না করিলেও স্থির থাকতে পারে না ; অবশেষে একদিন সকল রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। আদালতের এক কর্মচারীর মুখে। ভোলানাথ বাবুর পুত্র হরনাথ বাবু কর্জের টাকার জন্য নালিশ রুজু করিয়াছেন এবং শীঘ্রই সুদে-আসলে সমস্ত টাকার ডিক্রী হইয়া যাইবে। সংবাদ শুনিয়া খোদা নেওয়াজ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

হইলও তাই। যথাসময়ে হরনাথ বাবু আদালত হইতে খরচাসমেত সুদে-আসলে সমস্ত টাকার ডিক্রী পাইলেন। সংবাদ যখন একবালপুরে পৌছিল, তখন সকলের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। ছোট বিবি জ্বর গায়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ঘর ঝাঁট দিতেছিলেন। কন্যাটি ঘরের মেঝেয় বসিয়া বাসি তরকারী দিয়া গরম ভাত খাইতেছিল। বড়বিবি বলিলেন—"ওমা, ওর গায় দেখি জ্বর, ওকে বাসি তরকারী দিয়ে ভাত খেতে দিলে কি ব'লে?" ছোট বিবি ধীর শান্তভাবে বলিলেন,—"বেলা দুপুর হ'য়ে গেল, কাল থেকে কিছু খায় নি। কি করি। বল্লাম নুন দিয়ে খা, তা কি শোনে।"

"কেন একটু মিছরি দিয়ে দিলে না।"

"পেট ভরা দিলে, খালি পেটে মিষ্টি খাওয়া কি ভাল, আর দি মি আর মিছরী তাও কি ঘরে আছে ; থাকলে তো দেব।"

এমন সময় খোদা নেওয়াজ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল,—"আম্মাজান, কাল নাকি তালুক নিলেমে চড়বে!" ছোট বিবি শুনিয়াও শুনিলেন না, কাঁপিতে কাঁপিতে ঘর ঝাঁট দিয়াই চলিলেন। বড়বিবি যেন তাঁহার বিশেষ কিছু আসে যায় না এমনি ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে বল্লে, তুই কোত্থেকে শুনে এলি। চিঠি দেখে না কি।"

খোদা নেওয়াজ কিন্তু কি করিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। অবশেষে সে স্নানাহার মুলতবি রাখিয়া মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের প্রখর রৌদ্র অগ্রাহ্য করিয়া এক কাপড়েই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং বেলা ডুবু ডুবু সময়ে রসুলপুর গিয়া উপস্থিত হইল।

আবদুল্লাহ্ সব শুনিল। ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝিয়া রাত্রিতেই একবালপুর পৌছিল এবং আবদুল খালেককে সঙ্গে লইয়া পরদিন প্রত্যুষেই বরিহাটি যাত্রা করিল।

হরনাথ বাবুর এখন অসীম প্রসার প্রতিপত্তি ; কিন্তু তাই বলিয়া এতগুলি টাকা ছাড়িয়া দেওয়ার কথা তাঁকে বলা অন্যায় হইবে ভাবিয়া আবদুল্লাহ্ কিছুদিন সময় প্রার্থনা করিল।

হরনাথ বাবু বলিলেন,—"আর কতদিন অপেক্ষা করা যায়। একেবারে টাকাগুলা মারা যায়, তাই নিতান্ত বাধ্য হয়েই আমাকে এ কাজ করতে হ'য়েছে। তা যদি বড় মিঞা সাহেব (আবদুল মালেক) বাড়ী থেকে নিজে দেখে শুনে আদায়পত্র করতেন এবং কিছু কিছু করে টাকাটা আদায় হ'ত তাহ'লে আর ভাবনা কি ছিল। তা তিনি তো শুনেছি শ্বশুর বাড়ীতেই আজকাল আছেন। এখন আপনারাই বলুন কি ভরসায় আমি ব'সে থাকি?"

আবদুল্লাহ্ কহিল,—"আপনারা বড় লোক। সৈয়দ সাহেবদের অবস্থা জানেনই। একটি বিশেষ সম্ভ্রান্ত পরিবার পথের কাঙ্গাল হবে। দয়া করলে একটা উপায় হয়েই পারে।"

হরনাথ বাবুর করুণ হৃদয় মথিত হইয়া একটি দীর্ঘশ্বাস নির্গত হইল, তিনি বলিলেন,—"হ্যাঁ, সৈয়দ সাহেবকে আমি দেখেছি। এমন উদার চেতা লোক আজকাল অতি বিরল। একবার বাবা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। কত খাতির করলেন বাবাকে ও আমাকে। তাঁর গোমস্তা ৮০০ টাকা তহবিল তসরুফ করেছিল, বাবার অনুরোধে এক কথায় তিনি 'মাফ' লিখে দিলেন। ভগবান এমন একটি উদারচেতা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততির ভাগ্যে এতদুঃখ কেন লিখলেন

বুঝি না। তা যা হ'ক আপনারা এসেছেন ; আমি না হয় সুদটা ছেড়ে দিতে পারি; কিন্তু আসল টাকাটা—"

আবদুল খালেক একটু নড়িয়া বসিল এবং চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া হরনাথ বাবুর দিকে হা করিয়া তাকাইয়া রহিল।

আবদুল্লাহ্ বলিল,—"এরূপ মহৎ হৃদয় না হ'লে ভগবান আপনাদের এত উন্নতি দিয়েছেন? যার যেমন মন তার তেমন ভাগ্য!"

আবদুল খালেক আনন্দে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল,—"সোবহান আল্লাহ্!"

আবদুল্লাহ্ সজল চক্ষে হরনাথ বাবুকে বলিল,—"মহাশয়, আপনি যদি সুদ ছেড়ে দেন তবে ও আসল টাকাটা আমিই দিয়ে দেব।"

হরনাথ বাবু আবদুল্লার প্রতি সৈয়দ সাহেব যে ব্যবহার করিয়াছিলেন সে সংবাদ জানিতেন। ইত্যকার ব্যবহার সত্ত্বেও আবদুল্লার এই উদারতায় তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য হইলেন।

আবদুল্লাহ্ দৃঢ় এবং শান্ত ভাবে বলিল,—"তা দেখুন, আমার শ্বশুর আমার সঙ্গে কিছু দুর্ব্যবহার করেছিলেন সত্য কিন্তু তাঁর ইদানীং যা অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তাতে ওরূপ ব্যবহারে আমি খুব দুঃখিত হইনি। লোকজনকে দান খয়রাত করা ও পেট ভরে লোককে খাওয়ান, তাঁর একটা নেশা ছিল ; আমি বা কি কম খেয়েছি। আমার স্ত্রীকে তিনি যা যত্ন করতেন আর ভালবাসতেন তেমন বাৎসল্য পুত্রকে ভিন্ন দেখা যায় না।"

হরনাথ বাবু সমস্তই শুনিলেন। এই মহৎ উদার যুবকের প্রতি তাঁহার মন আপনা হইতে নত হইয়া পড়িল। শ্রদ্ধায়, প্রীতিতে তাঁহার সমগ্র অন্তর্দেশ ভরিয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া আবদুল্লাহকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "ভাই তোমার মহত্ত্বের কাছে আজ আমি নত শিরে পরাজয় স্বীকার করছি। আজ হ'তে সত্যিই তুমি আমার ভাই। এ ঋণ তোমার পরিশোধ করতে হবে না। আমি এখনই তার ব্যবস্থা করছি।" এই বলিয়া হরনাথ বাবু সম্মুখস্থ দেরাজ টানিয়া ডিক্রীখানি বাহির করিয়া তাহাদের সম্মুখেই টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। আবদুল্লাহ্ বা আবদুল খালেকের মুখে একটিও কথা ফুটিল না, শুধু নির্বাক বিস্ময়ে তাহারা হরনাথ বাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

সমাপ্ত

প্রশ্নোত্তরিকা

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে লেখক যে সমাজচিত্র অঙ্কন করেছেন তার স্বরূপ নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

অথবা,

"আবদুল্লাহ' বইখানি পড়ে আমি খুশী হয়েছি, বিশেষ কারণ এই বই থেকে মুসলমানদের ঘরের কথা জানা গেল।"—রবীন্দ্রনাথের এ উক্তির আলোকে 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসটির সমাজ পরিবেশ সম্পর্কে তোমার যে ধারণা জন্মে, তা সংক্ষেপে লিখ।

উত্তর ঃ 'আবদুল্লাহ' উপন্যাস সে যুগের মুসলিম সমাজের একটি নিখুঁত সুন্দর ছবি। "বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙালী মুসলমান সমাজের যে অবস্থা ছিল, তার একটি নিখুঁত চিত্র 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। অধুনা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রথার প্রবর্তন হচ্ছে, ফলে আগেকার আশরাফ আতরাফ ভেদ, পর্দা প্রথা, পীর ভক্তি, সুদ সমস্যা, ইংরেজী শিক্ষার নিন্দাবাদ এ সবের উৎকটতা কালক্রমে হ্রাস পেয়েছে কিন্তু সেদিনের সমাজ জীবন ও ব্যক্তি মানসে এ সকল সমস্যা যে বিরোধ ও বাধার সৃষ্টি করেছিল, 'আবদুল্লাহ' তার এক মনোরম আলেখ্য।"

মূলত এ পটভূমিকাতেই 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। কোন কোন সমালোচক অবশ্য উপন্যাসটিতে শিল্প সমৃদ্ধ দিকটি আবিষ্কার করেন। সামাজিক পটভূমিতে কাজী ইমদাদুল হকের আবদুল্লাহ একখানি নিখুঁত উৎকৃষ্ট সমাজ চিত্র এবং তার যে একটা বিশেষ মূল্য আছে সেকথাও অতি সত্য।

আবদুল্লাহ উপন্যাসে লেখকের সমাজ চেতনা বোধ ও সমাজ মানসের প্রতিফলন উল্লেখযোগ্য ভাবে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য উপন্যাসটি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন এভাবে—

"আবদুল্লাহ বইখানি পড়ে আমি খুশী হয়েছি—বিশেষ কারণ, এই বই থেকে মুসলমানদের ঘরের কথা জানা গেল। এ দেশের সামাজিক আবহাওয়া ঘটিত একটা কথা এই বই আমাকে ভাবিয়েছে। দেখলুম যে ঘোরতর বুদ্ধির অন্ধতা হিন্দুর আচারে হিন্দুকে পদে পদে বাধাগ্রস্থ করেছে, সেই অন্ধতাই ধুতি চাদর ত্যাগ করে লুঙ্গি ও ফেজ পড়ে মুসলমানের ঘরে ঘোরার অন্ন জোগাচ্ছে। একি মাটির গুণ? এই রোগ বিষে ভরা বর্বরতর হাওয়া এদেশে আর কতদিন চলবে? আমরা দুই পক্ষ থেকে কি বিনাশের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পরস্পর পরস্পরকে আঘাত ও অপমান করে চলবো? লেখকের লেখনীর উদারতায় বইখানিকে বিশেষ মূল্য দিয়েছে।" তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে। 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের মূল বিরোধ বা দ্বন্দ্ব সমাজ জীবনের পটভূমিকাতেই গড়ে উঠেছে। সমাজের কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, জীর্ণতা ইত্যাদিকে সংরক্ষণশীল শক্তি আঁকড়ে ধরে আর প্রগতিবাদী শক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিরন্তর তাকে অস্বীকার করতে প্রয়াস পেয়েছে। উপন্যাসের চরিত্রগুলোর জন্ম, লালন ও বিকাশ সমাজের এহেন আবহাওয়াতেই ঘটেছে। "ইমদাদুল হকের চিত্রাঙ্কন ক্ষমতা প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁর অঙ্কিত এই আলেখ্যে ব্যক্তি চরিত্র অপেক্ষা সমাজ মানসের প্রতিফলন হয়েছে বেশী।"

সমালোচক আবদুল কাদির সাহেবের উক্তিতে 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের মূল বিরোধ, লেখকের সমাজ চেতনা, চরিত্র চিত্রণ—পরিকল্পনা ইত্যাদির স্বচ্ছ ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।... "সৈয়দ সাহেব ও মীর সাহেব দুই বিপরীত ধর্মী চরিত্র; সৈয়দ সাহেবের বংশাভিমান, আড়ম্বরপ্রিয়তা, আচার নিষ্ঠা ও আত্মপরায়ণতা পাঠকের মনে সহানুভূতি জাগায় কিন্তু সম্ভ্রম জাগায় না। পক্ষান্তরে মীর সাহেবের বাস্তব বুদ্ধি মানবিক বোধ ও সংস্কার প্রয়াস আধুনিক মনের সমর্থন লাভ করে। নায়ক আবদুল্লাহ শেষে এই মীর সাহেবের আদর্শের ধারক হলো—স্ত্রী সালেহার মৃত্যুর পর মীর সাহেবের আশ্রিতা মালেকাকে করলো দ্বিতীয় বিবাহ। সৈয়দ সাহেব সংরক্ষণশীলতার এবং মীর সাহেব প্রগতিমুখিতার প্রতীক। এ দু'য়ের সংঘাতে যে স্ফুলিঙ্গ উঠেছে তাতে সংস্কারমুক্ত আধুনিক মনের অধিকারী আবদুল্লাহ চরিত্র হয়েছে ভাস্বর।"

এসব চরিত্র, ঘটনা মুসলিম পরিবেশেরই জাগ্রত ফসল।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ "অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমাবেশ হওয়ায় 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের রস পরিণতি ও পরিসমাপ্তি সার্থক হয় নাই।"—আলোচনা কর।

উত্তরঃ কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসটির পরিণতিতে সালেহার মৃত্যু, সৈয়দ সাহেবের মৃত্যু, আবদুল কাদেরের মৃত্যু ইত্যাদি বিয়োগান্ত ঘটনার পরিণতিতে যতখানি কারুণ্য সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তা হয়নি। বরং আবদুল্লাহর মহত্ত্ব এবং হরনাথ বাবুর উদারতার মধ্য দিয়ে কাহিনী পরিণতি লাভ করেছে।

রস-পরিণতির দিক দিয়ে উপন্যাসকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (ক) ট্রাজেডি বা বিষাদান্তক, এবং (২) কমেডি বা মিলনান্তক। আগের দিনে উপন্যাসের ছোট গল্প বা নাটকে চরিত্রের মৃত্যু-কল্পনার মধ্যেই ট্রাজেডি নিহিত বলে মনে করা হতো। কিন্তু আধুনিক সমালোচকদের মতে, মৃত্যুই শুধুমাত্র ট্রাজেডি নয়। মৃত্যু ছাড়াও জীবনের নানাবিধ জটিল সমস্যার পীড়নে যদি উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা দুঃখময় পরিণতির শিকার হয়, যার জন্যে একটা করুণাবোধ বা সহানুভূতি বোধ পাঠকের মধ্যে সৃষ্টি হয়, সর্বোপরি উপন্যাসে একটা বিষাদের ছায়া বিস্তার লাভ করে তাহলেই উপন্যাস Tragedy-র লক্ষণাক্রান্ত বলা চলে।

মোটামুটিভাবে, যে উপন্যাসে সমস্ত সমস্যা উত্তীর্ণ হয়ে পাত্র-পাত্রী স্বীয় আকাঙ্ক্ষিত পরিণতি লাভ করে আনন্দিত হয় এবং একটা সুখদ অনুভূতির সঞ্চার করে তাকেই Comedy বা মিলনান্তক উপন্যাস বলে। আর যে সমস্ত উপন্যাসে মৃত্যু অথবা অন্যবিধ পন্থায় কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়ক-নায়িকার মধ্যে নিজেদের কল্পনা করা হয় এবং এক রকম বিষাদময় ও করুণা সিক্ত অনুভূতির সৃষ্টি হয় তাকে Tragedy বা বিষাদান্তক উপন্যাস বলা হয়।

কাজী ইমদাদুল হক ১৯১৮ সালে কঠিন অস্ত্রোপচার ভোগের পর যখন সুদীর্ঘকাল হাসপাতালে অবস্থান করছিলেন তখন তিনি 'আবদুল্লাহ্' উপন্যাসটি রচনা করেন। 'মোসলেম ভারতে' উপন্যাসটির ৩০ পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ উপন্যাসটি লেখক শেষ করে যেতে পারেন নি বলে উপন্যাসের প্রায় ১১ পরিচ্ছেদের খসড়া নিরবচ্ছিন্ন কল্পনার ফল নয়।

'আবদুল্লাহ' উপন্যাসটি প্রধানত নায়ক প্রধান। নায়িকা সালেহা প্রাণস্পন্দন বর্জিত, প্রতাপশালী পিতার বিচার-বিবেকহীন মতবাদের ছায়াচিত্র মাত্র। আবদুল্লাহ সালেহাকে কেন্দ্র করে ক্ষীণ হৃৎস্পন্দন অনুভব করার প্রয়াস থাকলেও মূল কাহিনী অংশের বিকাশ সাধন করা হয়নি। আবদুল্লাহ ও আবদুল কাদেরের সংস্কারমুক্ত প্রজ্ঞার সঙ্গে লেখক শুধু বিরোধের আভাস দিয়েছেন মাত্র—বিরোধকে উপন্যাসের জটিল আবর্তে আবর্তিত করার প্রয়াস পাননি।

'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে বর্ণিত কাসেম গোলদারের কাহিনী ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। উপন্যাসের শাখা কাহিনী বলতে যা বোঝায় এই কাহিনীগুলো তেমন আবহ সৃষ্টি করে না। বিচ্ছিন্নভাবে সমাজের এক একটি ছবি যথার্থভাবে এগুলোর মধ্যে ফুটে উঠলেও তা মূল কাহিনীকে গতি বা পরিণতি দান করে না।

আবদুল্লাহর পিতার মৃত্যুজনিত কারণে সংসার ও লেখাপড়া পরিচালনার সমস্যা সৈয়দ সাহেবের ধর্মান্ধতার কারণে সালেহা ও হালিমার পক্ষে যে সমস্ত মানবিক সমস্যার আভাস উপন্যাসে রয়েছে তার কোন জটিল ব্যাপ্তি উপন্যাসে নেই। আবদুল্লাহ ও আবদুল কাদেরের সংস্কার মুক্ত চেতনার আভাস এতে আছে বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা প্রতিষ্ঠা করার কোন ঐকান্তিকতা নেই। এ কারণে উপন্যাসে তেমন কোন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়নি।

'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে কাহিনী ঘটনার ক্রমধারায় অগ্রসর না হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে, উপন্যাসের ঘটনার ঠাস বুনুনি এ উপন্যাসে নেই—এর ঘটনাগুলোকে বিচ্ছিন্ন সমাজ চিত্র বলা যেতে পারে মাত্র। আখ্যানভাগের যাবতীয় ঘটনা ক্রমপরিণতির প্রবাহে অগ্রসর হয়ে পরিণতিতে উপন্যাসে যে ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে, 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে তা অনুপস্থিত। এ কারণে ঘটনার প্রাচুর্যে কেন্দ্রীয় চরিত্র আবদুল্লাহর জীবন কর্মময় হয়ে উঠলেও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে নি।

কাহিনীর শিথিল বন্ধনের কারণে নায়ক আবদুল্লাহ ও নায়িকা সালেহার মধ্যে এমন কোন নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি যার ফলশ্রুতিতে সালেহার মৃত্যুপোঠক চিত্তকে স্পর্শ করে কিংবা পাঠকের সহানুভূতি জাগাতে পারে। ফলে সালেহার মৃত্যুতে যে ঔপন্যাসের কাহিনী শেষ হতে পারতো এবং সৈয়দ সাহেব ও আবদুল কাদেরের মৃত্যু ও অনুক্রম প্রেক্ষিত কাহিনীর রস পরিণতিকে আরো করুণ করে তুলতে পারতো—উপন্যাস সেখানে শেষ হয়নি। উপন্যাস শেষ হয়েছে আবদুল্লাহর মহত্ব ও হরনাথ বাবুর উদারতা প্রদর্শনের পটভূমিকায়। ফলশ্রুতিতে বেদনাময় অথবা আনন্দিত মুহূর্তের কোনটিরই পরিচয় উপন্যাসের পরিণতিতে পাওয়া যায় না।

সাম্প্রতিক কালের কোন কোন সমালোচক 'আবদুল্লাহ' সম্পর্কে এটি 'শিল্পের বিচারে আদৌ উপন্যাস নামের যোগ্য' কিনা প্রশ্ন তুলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু বাংলার মুসলিম সাহিত্য রস পিপাসু জনগণের এক সময় যে তা তৃষ্ণা মিটিয়েছে সে কথা অস্বীকার করার নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটি সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন—"আবদুল্লাহ' বইখানি পড়ে আমি খুশী হয়েছি—বিশেষ কারণ, এই বই থেকে মুসলমানদের ঘরের কথা জানা গেল।"

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ উপন্যাস কাকে বলে? কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের গঠনরীতি আলোচনা কর।

অথবা,

"গঠনরীতি বা শৈলীর উপরে উপন্যাসের সার্থকতা অনেকখানি নির্ভরশীল।"—কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের প্রেক্ষিতে এ উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তরঃ উপন্যাস বর্ণনাত্মক শিল্পকলা। উপন্যাসের মূল্য উপাদান জীবন ও জীবনের প্রবৃত্তি। সুখ-দুঃখ, হাসি কান্না আর ব্যথা আনন্দময় যে মানুষ, উপন্যাস সেই মানুষেরই জগত। উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচক David Cecil বলেন—"A novel is not only a record of facts objectively observed life, a scientific text book, but of facts, seen objectively through the temparament of the writer."

পাঁচটি বিশেষ অবস্থা বা স্তর সাধারণত উপন্যাসে থাকে। এই পাঁচটি স্তর অতিক্রম করে মূল কাহিনীর ঘটনাপ্রবাহ ও চরিত্র বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে। লক্ষণীয় যে, এ পাঁচটি বিশেষ অবস্থা বা স্তর 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসেও রয়েছে।

১। প্রস্তাবনা—সূচনা অংশ, উপন্যাসের কাহিনী পীরগঞ্জ ও একবালপুরের গ্রামীণ পটভূমিকায় উল্লেখিত হয়েছে।

২। সমস্যার সংস্থাপনা—এই স্তরে লেখক পিতার মৃত্যুতে সংসারে অভাব-অনটনের পরিপ্রেক্ষিতে আবদুল্লাহর শ্বশুর সৈয়দ সাহেবের সংগে আবদুল্লাহর বিরোধ সংক্রান্ত সমস্যা তুলে ধরেছেন।

৩। আখ্যানভাগের মধ্যে জটিলতার প্রবেশ—অত্যন্ত দক্ষতার সংগে লেখক সৈয়দ সাহেবের কাছে আবদুল্লাহর অর্থ সাহায্য প্রার্থনা ও ব্যর্থতা, আবদুল কাদেরের ইংরেজী শিক্ষালাভের হেতু সৈয়দ সাহেব কর্তৃক তাকে ত্যাজ্যপুত্র করা, ধূর্ত ভোলানাথ সরকার ও হরনাথ বাবুর কূট কৌশল, পীর ভক্তিজনিত ধর্মান্ধতা ও অন্ধবিশ্বাস এই স্তর বিন্যাসে সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। এ সব ঘটনা 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের কাহিনীতে জটিলতার সৃষ্টি করেছে।

৪। চরম সংকট মুহূর্ত—সালেহাকে রসুলপুর আনার ব্যাপারে আবদুল্লাহর ব্যর্থতা এবং সুচিকিৎসার অভাবে সালেহার মৃত্যু সৈয়দ সাহেবের ধর্মান্ধতা ও অযৌক্তিক পর্দা প্রথার বিশ্বাসের কারণে ঘটেছে

৫। সংকট বিমোচন—সালেহার মৃত্যুর পর মীর সাহেবের আশ্রিতা মালেকাকে বিবাহ করার মত মহত্ত্ব এবং সৈয়দ সাহেবের ঋণের টাকা মাফ করে দেবার মধ্যে হরনাথ বাবুর উদারতায় সংকট বিমোচন।

যথার্থ উপন্যাসের মধ্যে যে কটি দিকের একান্ত আবশ্যক সেগুলো হলো—(ক) আখ্যান ভাগ, (খ) চরিত্র চিত্রণ, (গ) পরিবেশ কল্পনা, ও (ঘ) বাণীভঙ্গি। এগুলোর যথাযথ লালন কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসেও আছে।

(ক) আখ্যান ভাগ—পারিপার্শ্বিক জীবন থেকে একটি কাহিনী বেছে নেয়া। লেখক যে কাহিনী আলোচ্য উপন্যাসে গ্রহণ করেছেন তা হচ্ছে এক অতি পরিচিত বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ জীবনের কাহিনী। এ কাহিনীর উপাদান লেখক পারিপার্শ্বিক জীবন থেকে গ্রহণ করেছেন।

(খ) চরিত্র চিত্রণ—লেখক যে সমস্ত চরিত্র আবদুল্লাহ উপন্যাসে অংকন করেছেন মোটামুটিভাবে তারা সবাই আমাদের সমাজেরই জীব, পরিচিত পরিমণ্ডলের মানুষ। সৈয়দ সাহেব, মৌলভী সাহেব, হরনাথ বাবু কেউই আমাদের অচেনা নয়।

(গ) পরিবেশ কল্পনা—ঘটনাবহুল দৈনন্দিন জীবনের মধ্য থেকে গৃহীত উপাদান। যে পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিকতার চিত্র লেখক উপন্যাসে অংকন করেছেন, বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিন ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে তা পরিচিত।

(ঘ) বাণীভঙ্গি—কাহিনীর উপাদানের মতো বাণীভঙ্গিও গ্রাম বাংলার সমাজ জীবন থেকে 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে নেয়া হয়েছে।

উপন্যাসের একটি প্রধান অঙ্গ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি। ঔপন্যাসিক ঘটনার পর ঘটনার ঘাত অভিঘাত সৃষ্টির মাধ্যমে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে থাকেন। এই দ্বন্দ্ব উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মধ্যে দেখানো হয়। তেমন কোন দ্বন্দ্ব আলোচ্য উপন্যাসে দেখতে পাওয়া যায় না। তাই বলা যায়, কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' উপন্যাস শিল্পের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মোটামুটিভাবে অনেকাংশে দুর্বল।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ "এ একখানি সমাজচিত্র। কিন্তু চিত্রকরের ক্ষমতা যে কত, নানা দিক দিয়ে তা' বিচার করে দেখা যেতে পারে।"—সমালোচকের এই উক্তির পটভূমিকায় 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসটি বিশ্লেষণ কর।

অথবা,

কাজী ইমদাদুল হক লিখিত 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসটির রস পরিণতি বিশ্লেষণপূর্বক একটি মনোজ্ঞ সমালোচনা লিখ।

উত্তরঃ 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসটি কাজী ইমদাদুল হকের এক অনবদ্য কীর্তি। মূলত এ উপন্যাসটিই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। মুসলমান সমাজের পটভূমিকায় রচিত আলোচ্য উপন্যাসটি সম্পর্কে প্রখ্যাত সমালোচক কাজী আবদুল ওদুদ যথার্থই মন্তব্য করেছেন—"এ একখানি সমাজ চিত্র। কিন্তু চিত্রকরের ক্ষমতা যে কত নানা দিক দিয়ে তা' বিচার করে দেখা যেতে পারে।"

সালেহার মৃত্যু, সৈয়দ সাহেবের মৃত্যু, আবদুল কাদেরের মৃত্যু ইত্যাদির বিয়োগান্ত ঘটনার পরিণতিতে যতখানি কারুণ্য সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল লেখক কাজী ইমদাদুল হক 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে তা ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। বরং কাহিনী আবদুল্লাহর মহত্ত্ব এবং হরনাথ বাবুর উদারতার মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করেছে।

উপন্যাসকে প্রধানত রস-পরিণতির দিক দিয়ে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (ক) ট্রাজেডি বা বিষাদন্তক (খ) কমেডি বা মিলনান্তক। উপন্যাস ছোট গল্প বা নাটকে চরিত্রের মৃত্যু কল্পনার মধ্যেই ট্রাজেডি নিহিত বলে আগের দিনে মনে করা হতো। কিন্তু আধুনিক সমালোচকদের মতে মৃত্যুই শুধু ট্রাজেডি নয়। যদি উপন্যাসের পাত্র পাত্রীরা মৃত্যু ছাড়াও জীবনের নানাবিধ জটিল সমস্যার পীড়নে দুঃখময় পরিণতির শিকার হয় এবং তাদের জন্যে একটা করুণাবোধ ব সহানুভূতিবোধ সৃষ্টি হয়, সর্বোপরি একটা বিষাদের ছায়া উপন্যাসে বিস্তার লাভ করে তাহলেই উপন্যাসকে Tragedy-র লক্ষণাক্রান্ত বলা চলে।

অন্যদিকে, পাত্র পাত্রী যে উপন্যাসে সমস্ত সমস্যা উত্তীর্ণ হয়ে স্বীয় আকাঙ্ক্ষিত পরিণতি লাভ করে একটা সুখদ অনুভূতির আনন্দ সঞ্চার করতে সক্ষম হয়, তাকেই Comedy বা মিলনান্তক উপন্যাস বলে।

১৯১৮ সালে কঠিন অস্ত্রোপচার ভোগের পর সুদীর্ঘকাল যখন কাজী ইমদাদুল হক হাসপাতালে অবস্থান করেছিলেন তখন তিনি 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসটি রচনা করেন। উপন্যাসটির ৩০ পরিচ্ছেদ 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত হয়। লেখক সম্পূর্ণ উপন্যাসটি শেষ করে যেতে পারেন নি বলে উপন্যাসের প্রায় ১১ পরিচ্ছেদের খসড়া আনোয়ারুল কাদির সাহেব রচনা করেন। 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসটি স্বভাবতই একজন লেখকের নিরবচ্ছিন্ন কল্পনার ফল নয়।

প্রধানত নায়ক প্রধান 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসটি। প্রতাপশালী পিতার বিচার-বিবেকহীন মতবাদের ছায়াচিত্র এবং প্রাণস্পন্দন বর্জিত নায়িকা সালেহা। এ উপন্যাসে লেখক আবদুল্লাহর সংস্কারমুক্ত প্রজ্ঞার সঙ্গে সালেহার বিরোধের আভাস দিয়েছেন মাত্র—উপন্যাসের জটিল আবর্তে বিরোধকে আবর্তিত করবার প্রয়াস পান নি। উপন্যাসের শাখা কাহিনী বলতে যা বোঝায় 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে বর্ণিত হরনাথ বাবু ও কাসেম গোলদারের কাহিনীগুলো তেমন আবহ সৃষ্টি করে না। এ সব বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। এগুলোর মধ্যে এক একটি ছবি যথার্থভাবে ফুটে উঠলেও তা মূল কাহিনীকে গতি বা পরিণতি দান করে না।

পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে আবদুল্লাহর লেখাপড়া ও সংসার পরিচালনার সমস্যা, সৈয়দ সাহেবের ধর্মান্ধতার কারণে সালেহা ও হালিমার মধ্যে যে সমস্ত মানবিক সমস্যার আভাস রয়েছে তার কোন জটিল ব্যাপ্তি এ উপন্যাসে নেই। সংস্কারমুক্ত চেতনার আভাস আবদুল্লাহ ও আবদুল কাদেরের চরিত্রে থাকা সত্ত্বেও তা প্রতিষ্ঠিত করবার কোন ঐকান্তিকতাও কার্যক্ষেত্রে নেই। এ কারণে, তেমন কোন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি উপন্যাসে হয় নি। কাহিনীর ঘটনার ক্রমধারায় অগ্রসর না হয়ে 'আবদুল্লাহ' উপন্যাস বিচ্ছিন্নভাবে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে, ঘটনার ঠাস বুনুনি উপন্যাসে নেই—তাই ঘটনাগুলোকে বিচ্ছিন্ন সমাজ চিত্র বলা যেতে পারে মাত্র। আখ্যানভাগে ক্রমপরিণতির প্রবাহে যাবতীয় ঘটনা অগ্রসর হয়ে পরিণতিতে যে ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে, 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে তা অনুপস্থিত। কেন্দ্রীয় চরিত্র আবদুল্লাহর জীবন কর্মময় হয়ে উঠলেও এ কারণে ঘটনার প্রাচুর্যে বৈচিত্রপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে নি।

নায়ক আবদুল্লাহ ও নায়িকা সালেহার মধ্যে কাহিনীর শিথিল বন্ধনের কারণে এমন কোন নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি যা সালেহার মৃত্যুতে পাঠক-চিত্তকে স্পর্শ করে কিংবা পাঠকের সহানুভূতি জাগাতে পারে। ফলে সালেহার মৃত্যুতে উপন্যাসের কাহিনী শেষ হতে পারলেও হয়নি। সৈয়দ সাহেব ও আবদুল কাদেরের মৃত্যুর প্রেক্ষিতে কাহিনী করুণ পরিণতিতে শেষ হয়নি। বরং আবদুল্লাহর মহত্ত্ব ও হরনাথ বাবুর উদারতা প্রদর্শনের পটভূমিকায় উপন্যাস শেষ হয়েছে। ফলশ্রুতিতে ঘটনা বহুল উপন্যাসের পরিণতিতে বেদনাময় অথবা আনন্দিত মুহূর্তের কোনটির পরিচয় উপন্যাসটিতে পাওয়া যায় না। 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসটি 'শিল্পের বিচারে আদৌ উপন্যাস নামের যোগ্য' কিনা—সাম্প্রতিক কালের কোন কোন সমালোচক এরকম প্রশ্ন তুলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এক সময় যে এটি বাংলায় মুসলিম সাহিত্য পিপাসু জনগণের তৃষ্ণা মিটিয়েছে তা অস্বীকার করার নয়। স্বয়ং বরেণ্য রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটি সম্পর্কে মতপ্রকাশ করেছেন—"আবদুল্লাহ বইখানি পড়ে আমি খুশী হয়েছি—বিশেষ কারণ, এই বই থেকে মুসলমানদের ঘরের কথা জানা গেল।"

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ "আবদুল্লাহ উপন্যাসের সমাজ চিত্র আসলে কতিপয় চরিত্র নির্ভর।"—এ উক্তির আলোকে কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র নির্মাণে ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব কতখানি নিরূপণ কর।

অথবা,

"কাজী ইমদাদুল হক তাঁহার 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে পরিচিত মণ্ডল হইতেই গ্রহণ করিয়া আশ্চর্য রূপ দান করিয়াছেন।"—আলোচনা কর।

উত্তরঃ কাজী ইমদাদুল হকের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'আবদুল্লাহ' লেখক আমাদের পরিচিত পরিমণ্ডল থেকেই তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে গ্রহণ করেছেন।

সমাজচিত্র বিধৃত 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসটির মূল কেন্দ্রীয় চরিত্র আবদুল্লাহ। লেখক আবদুল্লাহ চরিত্রটি অঙ্কনের পটভূমিকায় তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যস্থির করেছেন তৎকালীন সমাজ জীবনের রূপায়ন। সাহিত্য সমালোচক যথার্থই বলেছেন—"ইমদাদুল হকেরই মানসচিত্র এই আবদুল্লাহ, সংযেতবাক অচঞ্চলচিত্ত আদর্শ নিষ্ঠ আবদুল্লাহ। এই চিত্রকে প্রাধান্য দিয়ে ইমদাদুল হক মুসলিম সমাজে আধুনিক জীবনের বিকাশের পথ করেছেন প্রশস্ত। এ জন্যই তিনি বাংলা সাহিত্যে লাভ করবেন সম্মানের আসন।"

উপন্যাস মূলত বর্ণনাত্মক শিল্পকলা। উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনার সংগে সংগে ঔপন্যাসিক সাধারণত কল্পনার ভিতর দিয়ে চরিত্রগুলোকে চিত্রিত করে থাকেন।

'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের প্রধান কয়েকটি চরিত্র যেমন আবদুল্লাহ, সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস, আবদুল কাদের, মীর সাহেব, সালেহা, হালিমা, ডাক্তার দেবনাথ সরকার, হরনাথ বাবু ইত্যাদি সকলেই ঔপন্যাসিকের কল্পনা ঐশ্বর্যের ভিতর দিয়ে স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। লেখকের অন্যান্য অপ্রধান চরিত্রগুলোকে সামাজিক পটভূমিকায় অনুষঙ্গ চরিত্র হিসেবেই মনে হয়—মনে হয় তারা সবাই আমাদের পরিচিত পরিমণ্ডলের মানুষ। এছাড়া, পূর্বাঞ্চল নিবাসী মৌলভী সাহেব ও বরিহাটি স্কুলের হেড মাস্টার, ছুঁৎবাইগ্রস্ত ব্রাহ্মণ, ভক্তি গদ গদ কাশেম গোলদার ইত্যাদি চরিত্রগুলোও আমাদের পরিচিত পরিমণ্ডল থেকে গৃহীত চরিত্র।

উপন্যাস শিল্পের সাধারণ নিয়ম অনুসারে 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসটিতেও মোটামুটিভাবে লেখক এই ধরণের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন।

(১) আবর্তিত চরিত্র—উপন্যাসে প্রধানত যে চরিত্র সাধারণভাবে ঘটনাপ্রবাহে প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে, সে সব চরিত্রকে আবর্তিত চরিত্র বলা হয়। এ ধরণের চরিত্রই সাধারণত উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে থাকে। 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে মূল বা কেন্দ্রীয় চরিত্র বলতে আবদুল্লাহকেই বোঝায়।

(২) সম্প্রসারিত চরিত্র—উপন্যাসে এমন সব চরিত্রের অবতারণা করা হয় যেগুলো সাধারণত উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে আবর্তিত হয় না এবং উপন্যাসের কোন নির্দিষ্ট প্রয়োজনেই এ সব চরিত্রের আগমন ও নিষ্ক্রমণ, সে সব চরিত্রকে 'সম্প্রসারিত চরিত্র' বলা হয়। যেমন ; মীর সাহেব, সৈয়দ সাহেব, হরনাথবাবু ইত্যাদি চরিত্র।

উপন্যাসে চরিত্র সাধারণ অর্থে তার গতি ও স্বরূপ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া, কাহিনীর রস-পরিণতিতেও চরিত্র একান্ত অপরিহার্য উপাদান।

আলোচ্য 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে লেখক তৎকালীন মুসলিম সমাজ জীবনের যে চিত্র অঙ্কন করতে চেয়েছেন চরিত্রগুলো সেই সমাজ জীবনের প্রতিবিম্ব হয়ে ফুটে বের হয়েছে। মুসলিম সমাজ জীবনের পাশাপাশি হিন্দু সমাজের চিত্রকেও লেখক তুলে ধরেছেন হরনাথ বাবু, দেবনাথ সরকারের চরিত্র চিত্রণের ভিতর দিয়ে। এ অর্থেই বলা চলে, "আবদুল্লাহ উপন্যাসের সমাজ চিত্র আসলে কতিপয় চরিত্র নির্ভর" —কারণ চরিত্রকে অবলম্বন করেই সাধারণত উপন্যাসের কাহিনীর বিস্তার ও রস-পরিণতি ঘটে থাকে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বলতে কি বোঝ? কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র কোনটি? উক্ত চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।

অথবা,

'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের নায়ক কে? উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

উত্তরঃ কাজী ইমাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আবদুল্লাহ। এই কেন্দ্রীয় চরিত্র তথা নায়ক আবদুল্লাহর চরিত্র ব্যাখ্যা করতেই যেন উপন্যাসের সমস্ত কাহিনীর অবতারণা।

ঔপন্যাসিক চরিত্রটিকে নানা প্রকার বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে কর্তব্য পথে এগিয়ে দিয়েছেন এবং সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাকে জয়ী করেছেন।

আবদুল্লাহর জন্ম পীরগঞ্জের পীরবংশে। বি, এ পরীক্ষার আগে পিতা ওলিউল্লাহ এন্তেকাল করায় আর্থিক অনটনে আবদুল্লাহর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেল। সংসার চালাবার চিন্তায় আবদুল্লাহ ভাবনায় পড়ল। আবদুল্লাহর শ্বশুর সৈয়দ সাহেব ইংরেজী শিক্ষার ঘোর বিরোধী। তার পড়াশুনায় শ্বশুর সাহায্য করবেন না। তবু, মাতৃভক্ত আবদুল্লাহ মায়ের আদেশে কয়েকটি মাস পড়াশুনার খরচ চালানোর অনুরোধ জানাবার জন্য শ্বশুরালয় একবালপুরে গমন করলো। প্রগতিপন্থী আবদুল্লাহর পৈতৃক খোন্দকারী ব্যবসায়ে ভক্তি ছিল না। তাই জীর্ণ পীর ব্যবসাকে জীবিকা হিসেবে আঁকড়ে থাকতে পারে না। শাহপাড়ার পৈতৃক মুরিদ বৃদ্ধ কাশেম গোলদারের পীর ভক্তি দেখে অসহায় অশিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়ের সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মবোধে আশ্চর্য হয়েছে এবং ব্যথিত হয়েছে। শ্বশুরালয়েও সে এই জীর্ণ ধর্মীয় গোঁড়ামীর পরিচয় পেয়েছে। এই জীর্ণ ও কপট ধার্মিকতার শিকার হওয়ার ফলে স্ত্রী সালেহাও স্বামীর সঙ্গে সহজ হতে পারে নি।

প্রগতিশীল মুক্ত মনের অধিকারী আবদুল্লাহ বৈপ্লবিক প্রকৃতির নয়। সে শুধু উৎসুক দৃষ্টিতে শ্বশুরের এবং সমাজের গোঁড়ামী দেখেছে কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই প্রতিবাদ করে নি। ঘর থেকে সৈয়দ সাহেব পুত্র আবদুল কাদেরকে বহিষ্কার করেছে, এমন কি তালুক বন্ধক রেখে প্রচুর অর্থব্যয়ে মসজিদ নির্মাণ করেছে, আভিজাত্যের গর্বে ইসলাম ধর্মের সামান্যনীতির অবমাননা করেছে, কিন্তু আবদুল্লাহ প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁর কার্যকলাপের নীরব দর্শক সেজেছে। শ্বশুরের প্রতি আবদুল্লাহর ভদ্রতা বিনয়ের অভাব ঘটে নি, মনোবৃত্তির আকাশ পাতাল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও।

উদ্যমশীল, কর্মক্ষম ও স্বাবলম্বী আবদুল্লাহ নিজের চেষ্টায় জীবন পথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুসলমান ছাত্রদের জন্য বরিহাটি স্কুলে সে ছাত্রাবাস নির্মাণ করেছে। আবদুল্লাহ রসুলপুর সরকারী স্কুলে আদর্শ কর্মক্ষম ও সমাজকর্মী হিসেবে প্রধান শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করেছে।

উদারতা এবং অসাম্প্রদায়িকতা আবদুল্লাহ চরিত্রের অন্যতম আকর্ষণীয় দিক। আবদুল্লাহর বিশ্বাস সৎশিক্ষা, সুন্দর ও কল্যাণের পথ প্রশস্ত করে এবং মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেয়। তাই সে পারিপার্শ্বিক হিন্দু সমাজের প্রতিকূল ব্যবহার সত্ত্বেও তাদের প্রতি উগ্র মনোভাবের পরিচয় দেয় নি। সৎশিক্ষা থেকে আবদুল্লাহর মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়েছিল যে অজ্ঞতাবশতই মানুষ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি সম্পন্ন হয়। ছাত্রদের প্রতি তাই আবদুল্লাহর উপদেশ—"প্রকৃত মানুষ হও—যে মানুষ হলে পরস্পর ঘৃণা করতে ভুলে যায়, হিন্দু মুসলমানকে মুসলমান হিন্দুকে আপনার জন বলে মনে করতে পারে।"

মহানুভবতা এবং ক্ষমাশীলতা আবদুল্লাহ চরিত্রের উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য। একের পর একটি করে বিপদ আবদুল্লাহর ওপর আবর্তিত হয়েছে স্ত্রী সালেহার মৃত্যুর পর। সব ঝঞ্ঝা পরম ধৈর্যে ও অসীম কর্তব্য বোধে সে মাথায় পেতে নিয়েছে। মৃত্যুকালে ভগ্নীপতি আবদুল কাদের হালিমা ও তার শিশু সন্তানদের আবদুল্লাহর কাছে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছে। মৃতা কন্যার মোটা অঙ্কের মোহরানা ধর্মান্ধ সৈয়দ সাহেব জামাতা আবদুল্লাহর কাছ থেকে আদায় করেছে। সৈয়দ সাহেবের মৃত্যুর পর ভোলানাথ বাবুর পুত্র হরনাথ বাবু বন্ধকী তালুকের প্রাপ্য টাকার সুদে আসলে বিরাট অঙ্কের ডিক্রী লাভ করলো। আবদুল্লাহ অভিজাত শ্বশুর পরিবারের এই দুর্দিনে নিশ্চুপ রইল না। সৈয়দ পরিবারকে রক্ষা করবার জন্যে হরনাথ বাবুর কাছে গিয়ে অনুরোধ জানালো। হরনাথ বাবু আবদুল্লাহর মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে সমস্ত পাওনা মাফ করে দিলেন।

আবদুল্লাহ চরিত্রটি ঔপন্যাসিক "আপন মনের মাধুরী" মিশিয়ে চিত্রিত করেছেন। দুর্বল যাবতীয় চরিত্রের দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও চরিত্রটি উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয়।

অতএব আবদুল্লাহ চরিত্রের যাবৎ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে দেখা যায় যে এ চরিত্রটি সর্বত্রই উপন্যাসের ঘটনাক্রমকে প্রভাবান্বিত করেছে। এদিক থেকেই চরিত্রটিকে কেন্দ্রীয় চরিত্র বলা যায়।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে আবদুল কাদের চরিত্রটির গুরুত্ব কতখানি বিশ্লেষণ কর।

অথবা,

"আবদুল্লাহ উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্রটির ছায়ারূপে আবদুল কাদের চরিত্রটিকে লেখক উপস্থাপিত করেছেন।"—আবদুল্লাহ উপন্যাসের আবদুল কাদের চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর।

উত্তরঃ কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের কাহিনী অনুসারে আবদুল কাদের কেন্দ্রীয় চরিত্র আবদুল্লাহর ভগ্নিপতি ও সৈয়দ সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র। ঔপন্যাসিক কাজী ইমদাদুল হক সাহেব তাঁর উপন্যাসের নায়ক চরিত্র আবদুল্লাহর ছায়ারূপে চিত্রিত করেছেন আবদুল কাদের চরিত্রটিকে। বস্তুত আবদুল কাদের চরিত্রটি সৈয়দ সাহেবের আভিজাত্য ও প্রতিক্রিয়াশীল রক্ষণশীলতার নীরব প্রতিবাদী কণ্ঠ।

আবদুল কাদের চরিত্রটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তাঁর বাস্তবানুগ চিন্তাধারা ও যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি। উপন্যাসের ঘটনাবলীর মধ্যেই তাঁর চরিত্রের এ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। সৈয়দ বংশে আবদুল কাদেরই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল যে, আমপারা ও পান্দেনামা পাঠ করে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার দিন রুদ্ধ হয়ে আসছে। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সংগে সংগে অলীক আভিজাত্যের বড়াই দেখিয়ে জীবিকার্জনের দিন যে ক্রমশঃই সংকুচিত হয়ে আসছে, আবদুল কাদেরই তা সর্বপ্রথম অনুভব করতে পারেন। এ কারণেই পিতার ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও আবদুল কাদের ইংরেজী শিখেছে, আর পিতার বহিষ্কারাদেশ শিরোধার্য বলে মেনে নিয়েছে, কিন্তু একেবারে ভেঙে পড়ে নি। আবদুল কাদের দৃঢ় মনোবলের অধিকারী বলেই তা সম্ভব হয়েছে। কারণ আবদুল কাদের বেশ ভালো করেই জানে, ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার জন্যেই ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন।

আবদুল কাদের তীক্ষ্ণ বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন। সে বেশ ভালো করেই জানে, পৈতৃক সম্পত্তি ওয়ারিশানসূত্রে যখন ভাগ বাটোয়ারা হবে তখন তার অংশে যা পড়বে তা হবে খুবই নগণ্য এবং তার সাহায্যে পরিবারের ভরণ-পোষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়। সুতরাং, আবদুল কাদের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে সরকারী চাকরী নেয়ার মত বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

আবদুল কাদের ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করে পিতার বিরাগভাজন হলেও এবং পিতার যাবতীয় অন্যায় অত্যাচার সত্ত্বেও পিতার প্রতি রুষ্ট ব্যবহার করে নি, বরং সুপুত্রের মতই ব্যবহার করেছে। ভোলানাথ সরকারের কাছে যখন সৈয়দ সাহেব দুটি তালুক অল্পমূল্যে বিক্রয় করতে চান এবং ঐ টাকার সাহায্যে তার মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করবার বাসনা প্রকাশ করেন, তখন আবদুল কাদেরই পিতাকে রক্ষা করবার জন্যে এগিয়ে আসে। পিতার তালুক বিক্রয় করবার পরিবর্তে বরং তা বন্ধক দেবার ব্যবস্থা করে দেয়, এমন কি কিস্তিবন্দী করে বন্ধকী টাকা পরিশোধ করবার সমস্ত দায়িত্বও নিজের কাঁধে তুলে নেয়।

আবদুল্লাহর মনোবৃত্তিও ছিল অনেকটা আবদুল কাদেরের মতই। আর এ কারণেই আবদুল কাদের ও আবদুল্লাহর মধ্যে পরম বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আবদুল কাদের স্বামী হিসেবেও আদর্শস্থানীয়। রক্ষণশীল ঘরে জন্মগ্রহণ করেও পীড়িতা পত্নীর ভালো চিকিৎসার কারণে ঐতিহ্য ও আভিজাত্য পরিত্যাগ করতেও দ্বিধা করে নি।

'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে আবদুল কাদের চরিত্রটি খুব একটা বিকাশের সুযোগ লাভ করে নি। আবদুল কাদেরের বেদনাদায়ক অকাল মৃত্যুর ভিতর দিয়েই পরিসমাপ্তি ঘটেছে। সম্ভবত লেখক চরিত্রটির পূর্ণতর বিকাশের দিকে তেমন যত্নবান হন নি। এ কারণেই আবদুল কাদেরের সম-মনোবৃত্তি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে আবদুল্লাহ চরিত্রটি বিকশিত হয়ে উঠেছে ঠিক সেভাবে আবদুল কাদের চরিত্রটি সুগঠিত হয়ে ওঠে নি। তার ফলেই আবদুল কাদের চরিত্রটি অনেকটা বৈচিত্র্যহীন ও গুরুত্বহীন হয়ে উঠেছে সমগ্র উপন্যাসে।

এতদ্‌অর্থেই, সমালোচক মন্তব্য করেছেন—"আবদুল্লাহ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রটির ছায়ারূপে আবদুল কাদের চরিত্রটিকে লেখক উপস্থাপিত করিয়াছেন।"

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে আভিজাত্যের অহমিকা ও প্রতিক্রিয়াশীল রক্ষণশীলতার যে পটভূমিকা উন্মোচন করেছেন লেখক, সৈয়দ সাহেবের চরিত্র বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপ উদঘাটন কর।

অথবা,

"আবদুল্লাহ' উপন্যাস তৎকালীন মুসলিম সমাজের একখানি দর্পণ। পীর ব্যবসা, অন্ধ সংস্কার ও সামাজিক আভিজাত্যের অহমিকার যে চিত্র কাজী ইমদাদুল হক সাহেব অঙ্কন করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার উপন্যাসে, উহার মূল উৎস খুঁজিয়া পাওয়া যায় সৈয়দ সাহেবের চরিত্রে।"—'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের সৈয়দ সাহেবের চরিত্রটি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণ কর।

উত্তরঃ সৈয়দ সাহেব চরিত্রটি বিগত শতাব্দীর ম্রিয়মান মুসলমান অভিজাত পরিবারের সার্থক প্রতিনিধি। কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ও সবচেয়ে সার্থক চরিত্র সৈয়দ সাহেব। প্রচুর ধনের অধিকারী না হলেও চারিত্রিক দৃঢ়তা, উৎকট, ধর্মবোধ, পরিবেশের উপর বিপুল প্রতিপত্তি তার ছিল। চরম অহংবোধে অতীতের ঐতিহ্যের গৌরব তিনি রক্ষা করে চলেছেন।

ইংরেজী শিক্ষা করলে মুসলমানত্ব ক্ষুণ্ন হয় বলে গোঁড়া মুসলমান সৈয়দ সাহেবের দৃঢ়বিশ্বাস। ইংরেজী শিক্ষার অপরাধে পুত্র আবদুল কাদেরকে তিনি ঘর থেকে বহিষ্কার ও বিষয় সম্পত্তির অংশ থেকে বিচ্যুত করেছেন এবং জামাতা আবদুল্লাহকে অল্প কয়েক মাসের জন্য হলেও বি-এ পড়ার খরচ দিতে স্বীকৃত হন নি।

সৈয়দ সাহেব চরিত্রটি অন্ধ ধর্মবোধ ও আভিজাত্যের গৌরবে চিহ্নিত। তিনি যে কোন শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ ঘৃণা করেন। হৃদয়ের সাধারণ স্ফূর্তি তার নির্দেশিত পর্দার কঠিন পীড়নে শুকিয়ে গেছে। পরিবারের কাউকেও তিনি আরবী কিতাবাদি এবং শরা-শরিয়ত ব্যতীত অন্য কোন শিক্ষায় শিক্ষিত করতে রাজী নন। বংশ গর্বে গর্বিত সৈয়দ সাহেবের মতে প্রতিবেশীর সন্তান সন্ততিদের রক্তে আভিজাত্য নেই বলে তাদেরকে কম শিক্ষা দিতে মৌলভী সাহেবের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। বরিহাটির সদর মসজিদে নিচু বংশজাত ইমামের পিছনে নামাজ পড়তে রাজী না হয়ে সৈয়দ সাহেব আপন আভিজাত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ইসলামের সাম্য নীতির প্রতি কঠোর আঘাত হেনেছেন। রাবেয়া নীচু বংশজাত বলে বাড়ীর মসজিদের দ্বারোদঘাটনের উৎসবে সৈয়দ পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে একই সারিতে আহারাদি করবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছেন।

সৈয়দ সাহেব কিছুতেই অন্ধ ও জীর্ণ সংস্কারকে বিসর্জন দিতে রাজী নন। কঠিন পীড়াগ্রস্থ পুত্রবধূ হালিমাকে ডাক্তার দেখানোর স্বপক্ষে সৈয়দ সাহেব মতামত দেন নি। কন্যা সালেহাকেও তিনি রসুলপুর পাঠাননি রেল স্টিমারে পর্দা বিঘ্নিত হবে বলে। বংশানুক্রমিক পালিত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস। ধর্ম যে সমাজ ও জীবনের জন্য কল্যাণকর হতে পারে, তা সৈয়দ সাহেবের চিন্তার অগম্য। তহবিল তছরূপ করার অপরাধে হিন্দু কর্মচারীকে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন কিন্তু জামাতার ইংরেজী পড়ার খরচ বাবদ এক কপর্দকও খরচ করতে রাজী হন নি। বংশের অতীত ঐতিহ্য প্রাণপণে আঁকড়ে আভিজাত্যের অহংকার অটুট রাখবার জন্যে মসজিদ

নির্মাণ করতে গিয়ে সৈয়দ সাহেব তালুক পর্যন্ত বন্ধক রেখেছেন। আভিজাত্য ও ঐতিহ্য রক্ষার্থে যারা পুত্র কন্যার গ্রাসাচ্ছাদনের বিনিময়ে প্রাণান্ত প্রয়াস করে থাকেন তাদেরই একজন সৈয়দ সাহেব। বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন অর্থ পিশাচ সৈয়দ সাহেব ধর্মের দোহাই দিয়ে মৃতা কন্যার মোহরানার টাকা আদায় করেছেন। অবশ্য আদর্শ অর্থ-পিশাচের ন্যায় কৃপণতা না করে তিনি মৃতা কন্যার মোহরানার টাকা দিয়ে নাতির খাৎনা উৎসব সমাধা করেন। মোট কথা মানুষের ও সমাজের কল্যাণ কামনার সঙ্গে ধর্মবোধের সমন্বয় না থাকলে ধর্মে অধর্মে যে সমস্ত বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয় তার প্রত্যেকটিই সৈয়দ সাহেবের চরিত্রে ঘটেছে। একগুয়েমিসহ যাবতীয় দোষক্রটি থাকা সত্ত্বেও সৈয়দ সাহেবের ব্যক্তিত্ব অবশ্যই প্রশংসনীয়। পরিবেশের ওপর তাঁর বিপুল প্রভাবের ফলে ভাল, মন্দ, দৃঢ়তা ও কর্তব্যপথ থেকে কেউ তাঁকে বিচ্যুত করতে পারে নি। তিনি সর্বদাই আপন বিশ্বাসে এবং ব্যক্তিত্বে অটল। কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের সৈয়দ সাহেবের চরিত্রটি বাস্তব, আকর্ষণীয় ও শ্রদ্ধার পাত্র।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের অন্তর্গত অপ্রধান চরিত্রগুলির যে কোন একটির স্বরূপ সংক্ষেপে বর্ণনা প্রসঙ্গে উপন্যাসে তার প্রয়োজনীয়তা কতখানি লেখ।

উত্তরঃ কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে বেশ কয়েকটি অপ্রধান চরিত্র স্থান লাভ করেছে। এগুলোর মধ্যে বৈশিষ্ট্যের ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে যে চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য নীচে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হলো।

মীর সাহেবঃ উপন্যাসের মাঝখানে যেন খানিকটা প্রয়োজনে লেখক এ চরিত্রটির অবতারণা করলেও মীর সাহেব চরিত্রটি 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের অন্যতম উজ্বল চরিত্র। সমাজ চিত্র আঁকবার জন্যে মীর সাহেব চরিত্রটির প্রয়োজন ছিল। অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন সৈয়দ সাহেবের মত মানুষের অভাব যেমন সমাজে নেই, শক্তি সম্পন্ন পরোপকারী মীর সাহেবের মত মানুষও সমাজে ঢের রয়েছে। সমাজ হিতৈষী হিসেবে পরিচিত মীর সাহেব ভোলানাথ সরকারের মত জাত সুদখোর নন। মীর সাহেবের চরিত্র মদন গাজীর ঘটনাটির মধ্যে অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। পলাশ ডাঙ্গার মদন গাজী জমিজমা বন্ধক রেখে মহাজন দিগম্বর ঘোষের কাছ থেকে টাকা কর্জ করেছিল। কয়েক বছর অনাবাদের ফলে সঙ্গতি সম্পন্ন গৃহস্থ গাজী মহাজনের টাকা শোধ না করতে পারায় দিগম্বর ঘোষ তার বাড়ীতে বাঁশগাড়ি করতে আসে। বহু অনুনয় বিনয় করাতেও দিগম্বর ঘোষ বাড়ীর ভিটেটুকু পর্যন্ত ছেড়ে দিতে রাজী হলো না। কোন উপায় না দেখে মদনের পুত্র সাদেক নদী সাঁতরিয়ে যাবতীয় ঘটনা দয়াবান মীর সাহেবের কাছে বর্ণনা করে শেষ রক্ষার জন্যে তাঁর সাহায্য পার্থনা করলো। কাল বিলম্ব না করে মীর সাহেব মহাজনের টাকা শোধ করে দিয়ে মদন গাজীর 'ইজ্জত' রক্ষা করলেন। সুদখোর মনে করে মীর সাহেবকে সৈয়দ সাহেব চিরদিন অবজ্ঞামিশ্রিত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেছেন। সাধারণ মনুষ্যত্ববোধের বিচারে মীর সাহেব ধার্মিক সৈয়দ সাহেবের অনেক ওপরে। ধনবান মীর সাহেব আভিজাত্যের গর্বে আত্মহারা নন। উপন্যাসের বহুল প্রশংসিত ব্যক্তি আবদুল্লাহ ও আবদুল কাদের চিরদিন সংস্কারমুক্ত হৃদয়বান মীর সাহেবকে তাদের আন্তরিক ভক্তি নিবেদন করে এসেছে।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, শুধুমাত্র প্রধান চরিত্র অঙ্কনেই নয়—কাজী ইমদাদুল হক সাহেব তাঁর 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্রগুলোও অসীম দরদ ও মমতার সংগে অঙ্কন করেছেন। উপন্যাসটি যে সামাজিক পটভূমিকায় লেখক রচনা করেছেন, আলোচ্য অপ্রধান চরিত্রটি সেই সমাজ-পরিবেশকে সুস্পষ্ট করতে যথেষ্ট উপযোগী হয়েছে বলে মনে হয়।

❑